স্বর্গ খেলনা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

—: প্রাপ্তিস্থান :—
কামিনী প্রকাশালয়
১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

স্বর্গ খেলনা

ঃ আমাদের প্রকাশিত কিছু ত্রয়ী উপন্যাস ঃ

বর্ষা-বসন্ত-শরৎ	—	আশাপূর্ণা দেবী
চতুষ্পর্ণা	—	ঐ
ত্রয়ী	—	তারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ
স্বর্গমর্ত্ত	—	ঐ
দুই পৃথিবী	—	ঐ
অপরূপা	—	বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোঃ
তিন মহল	—	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
রূপরস গন্ধ	—	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
সুখ দুঃখ প্রেম	—	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
দুটি ফুল একটি কুঁড়ি	—	ঐ
সময় অসময়	—	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
তিন চরিত্র	—	ঐ
প্রেম ভালবাসা	—	ঐ
সেতু বন্ধন	—	ঐ
বসন্ত দিনের খেলা	—	ঐ
কানু কহে রাই	—	নীহার রঞ্জন গুপ্ত
মধু মালতী	—	ঐ
ত্রিপর্ণা	—	ঐ
ত্রিভুবন	—	সমরেশ বসু
ত্রিসীমা	—	ঐ
ত্রিযামা	—	শক্তিপদ রাজ গুরু
নিশি হ'ল ভোর	—	প্রেমেন্দ্র মিত্র
মন যৌবন	—	ঐ
মেঘ বৃষ্টি রোদ	—	বুদ্ধদেব বসু
দ্বৈরথ	—	বনফুল
যুগল বন্দী	—	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গ খেলনা

বাসটা ছেলেমেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে বেলা ন'টা নাগাদ এখানে হাজির হয়। আসার কথা আটটায়, আসতে আসতে ওই সময়টুকু যায়। পথ মাইল পাঁচেক অবশ্য, কিন্তু পথের হিসেবে কিছু আসে যায় না। ছেলেমেয়েগুলোকে শুধু কুড়িয়ে আনা ত নয়, গুছিয়ে আনাও। ঘুরে-ফিরে এর-ওর দরজায় দাঁড়াও, প্যাঁক-প্যাঁক হর্ন দাও, সজোরে কড়া নাড়ো, কোনও ছেলের ঘুম ভাঙিয়ে ইজের পরাও, কোনও মেয়ের বাসি-চুলে একটু আলগা চিরুনি বুলিয়ে নাও, তারপর বাচ্চাগুলোকে গাড়িতে তোল। এই রকম করে আসা। রোজ, নিত্য। সময় বয়ে যাবে তাতে আশ্চর্য কি! পাঁচ মাইলের পথ যদি আট-দশ মাইলের পেট্রল খায়, তাতেও অবাক হবার কিছু নেই। তবু ত বাসটা নিয়মিত আসে।

কি করে আসে সেটাই এক আশ্চর্য। আসার কথা কোনদিন যে কোন জায়গায় ওটা দমবন্ধ নিশ্চল-অসাড় থাকতে পারে। বিন্দুমাত্র ভরসা নেই। মাঝে মধ্যেই ' তবু ওই গাড়িকেই ভরসা। মুটু মিস্ত্রি একটা অদ্ভুত তেই একদিন করেছিল, তার হাতে গড়া-পেটা বলেই নয়, তারই হাতে নে এখানে পালিত হচ্ছে বলেই সবাইয়ের যেটুকু ভরসা। কোন

মুটু মিস্ত্রী। এই গাড়ির গায়ে মিস্ত্রী নিজেই সাদা রঙ শায় ব্রাশ দিয়ে নাম লিখেছে ইংরেজীতে। মিস্ত্রীর যে ইংরেজী বর্ণ-জ্ঞান আছে তা মনে করার হেতু নেই। গত বছর 'বাঘা' দাদাকে দিয়ে খড়িতে করে বাসের গায় হরফগুলো লিখেছিল, তারপর নিজে সাদা রঙ দাগে দাগে বুলিয়ে গেছে, ফলে ইংরেজীতে এই বাসের নাম 'মেজর গাড়ি'—অর্থাৎ বাঙলায় যা হবে 'মজার গাড়ি'। নামটা বাচ্চাগুলোই দিয়েছিল, লিখেছিল অবশ্য বাঘা। লেখার দোষ বাঘার নয়। তার বয়স ছিল মাত্র দশ, মিস্ত্রীর কাঁধে বসে ঘাড়ের পাশ দিয়ে পা দুটো গলিয়ে তাকে লিখতে হয়েছিল। একটা করে

অক্ষর শেষ হয় আর মিস্ত্রী এক পা করে সরে যায় পাশে।

বাঘা আর নেই, গত শীতে তার বাবা বদলি হয়ে গেে বাঘা চলে গেছে, তাঁর লেখাটা থেকে গেছে। নুটু মিস্ত্রীর খুব ইচ্ছে ছিল বাসের অন্য পাশে সে বাংলাতেও নামটা লিখে নেবে বাঘাদাদা চলে যাওয়ায় হয় নি, না কি অপেক্ষা করবে—জ্যোতিবাবু কবে নিজে থেকেই গোটা গোটা করে নামটা লিে দেন। জ্যোতিবাবু ছবি আঁকান ছেলেমেয়েদের, পড়ান, তাঁর হাে লেখা হলে খাসা হবে।

নুটুর কথা, নুটুর গাড়ির কথা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে সা কাহন বলবে। কবে কোথায় কোন উইলিসাহেবের সোফার হে দশ বছর কাটিয়েছে, কেমন করে সেই বিশ্বকর্মা সাহেবের হাতে তার গাড়ির কাজের যাবতীয় যা কিছু শিক্ষা, তারপর উইলিসাহে মরে গেলে পাটনায় আগরওয়ালার মোটর কারখানায় টানা ক'বছ -টর গাড়ির মেরামতি করেছে, কোন্ বিশারদ নুটুবে কট দিয়েছে তাই বলে যে, নুটু নেভার সেড নো'—এস -টি যায়গায় সে বলে। বলতে পারলে নুটু খুশী হয় গল্পের পর নুটুর শেষ গল্পটা বড়ো করে। সেটা সে -চায় না।

সেই গল্পেরই পরিণতি এই 'মজার গাড়ি', নুটু যার জন্মদাতা একটা ফোর্ড গাড়ির এঞ্জিনই শুধু সে পেয়েছিল। পুরনো বনেদী বংশ বলে জঞ্জালের মধ্যেও নুটু এঞ্জিনটার চরিত্র বিষয়ে নিঃসন্দেহ হল। লোহার দরেই ওটা সে কেনালো সাহেবদাদুকে দিয়ে। তারপর দিনের পর দিন মাসের পর মাস সে মেতে থাকল। শহরের সারাইখানা, কামারবাড়ি আর কাঠমিস্ত্রীদের সঙ্গে সমানে গতর দিয়ে লড়ে এই গাড়ি সে তৈরি করেছে। নুটুই গাড়ির সব ড্রাইভার ক্লীনার মেকানিক—সব কিছু।

এই গাড়ি না হওয়া পর্যন্ত শহর থেকে বাচ্ছাদের আনা যেত না। মধুবাবুর ঘোড়ার গাড়ি চেপে পাঁচ-সাত জন যা আসত

শেষাবধি এই ভাবে কোণঠাসা হয়ে মরেছে।

ওর নাম ইতি। ওর আট বছরের জীবনে সেদিন ছেদ পড়তে পারত। পড়ে নি। সাহেবদাত্থ ডাক্তার ডাকতে গিছেছিলেন বলেই সঙ্গে তাঁর প্রয়োজনীয় মানুষটি ছিল। ইতি সে-যাত্রা বেঁচে গেল। কিন্তু মেয়েটার মনে সেদিনের আচমকা ভয় কোথায় যেন একটা অসাড়ত্ব এনে দিল। সে একা থাকতে চাইত না, একা শুতে পারত না, ফাঁকায় তার গা ছমছম করত।

সাহেবদাত্থ বুঝেছিলেন, মেয়েটার সঙ্গী দরকার। তাঁর বা বিন্টুর সঙ্গ যথেষ্ট নয়।

'তোর মাসির কাছে যাবি?' সাহেবদাত্থ ইতির মনের ভাব বোঝবার চেষ্টা করলেন।

'না।'

'মাসিকে তোর মনে আছে?'

'নেই।'

'তবে—?'

'কিচ্ছু না।'

ইতির কথা—ইতির সঙ্গীর কথা চিন্তা করতে করতেই একদিন সাহেবদাত্থর খেয়াল হল, কয়েকটা বাচ্চা-কাচ্চা জুটিয়ে এনে এখানে একটা পাঠশালার মতন খুললে কেমন হয়। সাহেবদাত্থর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু মানুষ নতুন কোন খেলা শিখলে যেমন নেশায় জড়িয়ে যায়, উনি অনেকটা সেই ভাবে জড়ালেন।

ছ বছর আগে একটি মাটির ঘরে শিশুতীর্থের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পাঁচ-ছটি ছাত্র। চারিটি ছাত্র তিনি যোগাড় করেছিলেন মাইল দেড়েক দূরের গ্রাম থেকে, তারা আদিবাসী, কৃশ্চান। আর দুটি আসত শহরের কাঠ কারখানার মালিকের বাড়ি থেকে, মটর বাইকের সাইড-কারে। কাঠ কারখানার মালিক সাহেবদাত্থর প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং অনুরক্ত ছিলেন বলেই যেন সাহায্য করেছিলেন নিজের ছেলেমেয়ে দুটিকে শিশুতীর্থে পাঠিয়ে।

এ-কথা বোঝাই যায়, অজায়গায় এমনি একটি কোমল লতা রোপণ করেছিলেন সাহেবদাদু যা রক্ষা করা ও বর্ধিত করা খুবই কষ্টকর। যে কোন সময় শুকিয়ে যেত পারত সে সম্ভাবনা সর্বদাই ছিল। কিন্তু সাহেবদাদুর প্রাণান্ত চেষ্টায় কয়েকজনের সাহায্যে লতাটি শুকোয় নি, বেঁচে গেছে। ছ বছরে তাঃ যেটুকু বৃদ্ধি ও বিস্তার তা নিতান্ত কম নয়।

সামান্য আর কয়েকটি কথাও বলতে হয়। যে-বয়সে সাহেবদাদু তাঁর জীবন এই দুরূহ কর্মে উৎসর্গ করেছিলেন, সে-বয়স উদ্যমের নয়। অবশিষ্ট শক্তিটুকু ছিল আয়ুকে কোন রকমে রক্ষা করার জন্যে। উনি সেই শক্তিকে কর্মের জন্যে ব্যয় করে খুব দ্রুত আয়ুকে ফুরিয়ে আনলেন। এখন এই মানুষটির কাছে সে সব কল্পনা, যে-কল্পনা জাফরি কাটা জানলার রৌদ্র ছায়ার মতন অস্পষ্ট ও মেদুর, তেমন কল্পনা অবলম্বন করে পড়ে আছেন। হয়ত তিনি দেখতে পান, শিশু-তীর্থে খুব বড় একটা মেলা বসেছে, মুখর হয়ে উঠেছে সর্বত্র, কলরবে এ নির্জনতা পূর্ণ, শত শিশুর চরণের ধুলোয় ধুলোয় গাছের পাতা ধূসর হয়ে গেছে, ঘাসের ডগাগুলো দলিত, দূর থেকে একজোড়া ছেলে-মেয়ে ছুটে আসছে, রোদের খর আলোয় মুখগুলো দেখা যাচ্ছে না ঠিকমত, ছুটতে ছুটতে তারা পলাশ গাছটার তলা দিয়ে সামনে চলে এল, সাহেবদাদুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, ওদের হাতে মুঠো ভরা ফুল···

দৃশ্যটা হঠাৎ যেন রোদের ছটায় ফিকে হয়ে মিলিয়ে যায় সাহেবদাদু চোখের পাতা বুজে বসে থাকেন।

বাকিরা এখানে থাকত। বাকি বলতে জনা তিরিশ ছাত্র। এখন আরও বিশ-পঁচিশ বেড়েছে, দু-দশ জন—মাইল দেড়-দুই দূর থেকে হেঁটেও আসে।

মজার গাড়ির সবটাই মজা। তার হাত-পা গুটোনো, কচ্ছপের মতন একটা খোলা আছে পিঠে, ভেতরে তিনটে সরু লং বেঞ্চ, জানলার ফুটোয় ক্যাম্বিসের পরদা গুটানো থাকে। গাড়িটা ফট ফট শব্দ করে, ধোঁয়া ছাড়ে চিমনির মতন, তার সারা গা নড়ে, বিচিত্র স্বর আওড়ায় সর্বদা, চলতে গেলেই বাঁয়ে হেলে পড়ে, ডাইনে দোল খায়—তবু গাড়িটা চলে।

এই গাড়ি নিয়ে নুটু ভোরের কাক ডাকতেই ছেলেমেয়ে আনতে যাত্রা করে দেয়। পনেরো মিনিটের পথ, হাতে আরও বাড়তি একঘণ্টা সময় নিয়ে বেরোয়। বাধা-বিপত্তি ত থাকবেই। যত রকম কল-কব্জা যন্ত্রপাতি যাবতীয় গাড়ির মধ্যে সিটের নিচে মজুত নুটুর।

শহরে ঢুকে—ঢোকার ঠিক মুখেই 'শান্তি-কুটিরে'র সামনে গিয়ে গাড়িটাকে প্রথমে দাঁড় করিয়ে দেয় নুটু।

জানালা দিয়ে গলা বাড়ায় তুষার দিদিমণি। কোনদিন সবে ঘুম ভেঙে উঠেছে, ফোলা-ফোলা চোখ, এলোমেলো চুল। মুখ বাড়িয়ে সকালের প্রথম মিষ্টি হাসিটুকু হেসে হাত নেড়ে বারান্দায় এসে বসতে বলেছে তুষার দিদিমণি' তারপরই জানলা ফাঁকা।

নুটু গাড়ি থেকে নেমে শান্তি-কুটিরের কাঠের ফটক খুলে বাগানে ঢুকেছে। বাগানে কয়েকটি গাছ, কিছু দেশী ফুল, যখন যা ফোটে। নুটু জানে বলেই বেছে বেছে কয়েকটি ফুল তুলে নেয়। তারপর বারান্দার ছোট সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সূর্য-ওঠা-সকাল দেখে। একটু পরেই একগ্লাস চা আসে ভেতর থেকে, কামিনীঝি, দিয়ে যায়। নুটুর এটা বাঁধা।

যেদিন তুষার দিদিমণি তৈরি থাকেন, সেদিনও নুটুকে নিচে নেমে এসে প্রাপ্য চা-টুকু এবং দিদিমণির সকালের প্রথম মিষ্টি হাসিটুকু সূর্য-ওঠা-আলোর মতন সকৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করতে হয়।

তুষার দিদিমণি একটা হালকা বেতের টুকরি নিয়ে গাড়িতে নুটুর পাশে এসে বসলেন। নুটুর গাড়ি ছাড়ল।

'আজ কেমন একটু শীত, নুটু।' তুষারদিদি বললেন হয়ত।

'বাদলার ঠাণ্ডা দিদি?'

'না। এমনি; শিশির বা হিমের হবে।'

বাদলার বড় ভয় নুটুর। বাদলার রাস্তা গাড়িটাকে বড় ভোগায়। শিশির কি হিমের ঠাণ্ডা শুনে নুটু নিশ্চিন্ত হয়। অল্প এগিয়ে বলে, 'বুলুটার গায়ে তবে একটা মোটা কিছু পরিয়ে নেবেন দিদি।'

বুলু পাঁচ বছরের মেয়ে, রোগা-রোগা দেখতে, হয়ত ক'দিন সর্দি-কাশিতে ভুগেছে।

তুষারদিদি এক পাশে ঘাড় হেলিয়ে হাসি-স্বচ্ছ চোখে নুটুকে দেখেন, যেন ঠাট্টা করে বলেন, 'তাই নাকি!'

গাড়িটা শহরের চারপাশে টহল মারে তারপর। তুষারদিদিকে প্রায় সব বাড়িতেই নামতে হয়, ঢুকতে হয়।

কাঞ্চন মুখ বুজে সবে। চটপট তাকে তুষারদিদি নিজেই তৈরি করে নেন। কাঞ্চনের মা রাগ করে বলেন, 'এই ছেলেকে তুই বাপু নিয়ে গিয়ে রাখ তুষার, আমি আর পারি না। কখন থেকে ঠেলছি, বিছানা ছেড়ে কিছুতেই উঠবে না। এইটুকু একফোঁটা ছেলের কী আয়েস।'

'রায়বাহাদুরের নাতি ত।' তুষার হেসে বলে 'একটু হবে।' বলতে বলতে শার্টের সামনেটা কাঞ্চনের প্যান্টে গুঁজে দিয়ে আস্তে করে ঠেলে দেয় তুষার কাঞ্চনকে, 'চল চল···ছুট দে'। কাঞ্চনের বই-খাতার ব্যাগটা নিজেই অনিলার হাত থেকে নিয়ে সদরের দিকে এগোয়।

আর এক বাড়িতে মণ্টুকে হয়ত ঘুম থেকেই টেনে তুলতে হয়। মণ্টুর মার জ্বর। মণ্টুর মাথার পাশে বসে তুষার ডাকে, 'এই মণ্টু, ওঠ। উঠবি না? আজ লেবুপাতার গল্পটা হবে তোদের।'

বিনুর আর সব তৈরি—শুধু চুল আঁচড়ানো হয় নি। রিবনটা বিনুর হাতের মুঠোয় গুঁজে দিয়ে তুষার তাকে টেনে এনে গাড়িতে তোলে।

পুটুর দুধ-দাঁত পড়েছে, পুটু ঘুম থেকে উঠে সেই দাঁত পেয়েছে বিছানায়। ইঁদুরের গর্ত খুঁজছে, গর্তে দাঁত না দিয়ে সে যাবে না স্কুলে। তুষার হয় গর্ত খুঁজতে বসল, না হয় পুটুকে বলল, 'পাগলা ছেলে, এখানে ইঁদুর কই মাঠে কত ইঁদুরের গর্ত, বড় বড় ইঁদুর—চল সেই গর্তে দিয়ে দেব।' পুটু সানন্দে মাথা নাড়ল মাঠের ইঁদুর তার যেন বেশি পছন্দ।

এমনি করেই ছেলেমেয়েগুলোকে টেনে-টুনে তুলে আনতে হয়। পথের মধ্যেও তুষারের শত কাজ। নিজের জায়গা ছেড়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বসে কারও মুখ মুছিয়ে দেয়, কোনও মেয়ের চুল আঁচড়ে বিরন বাঁধে, কারও বা জামায় বোতাম বসায়।

তুষারের বেতের টুকরিতে সব থাকে। নিজের একটা শাড়ি, জামা, চিরুনি, ছোট্ট পাউডারের কৌটো, ছুঁচ-সুতো—টুকটাক আরও অনেক কিছু।

গাড়িটা শহরের এলাকা পেরিয়ে একটা বাঁক নেয় ডান দিকে, থাকে রেল লাইন বাঁ দিকে ক্ষেত আর মাঠ। রেল লাইনের পাশে পাশে খানিকটা ছুটে এসে হঠাৎ পথ গোলমাল হয়ে যায়, টিলার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে লাইন পুবের জঙ্গলে অদৃশ্য, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাথর কাঁকর আর মোরম রঙের মাটি মেশানো সড়ক ধরে স্কুটুর বাস তেঁতুল-ঝোপের মধ্যে এসে দাঁড়ায়, ঝোপ পেরোলেই দূরে চাঁদমাড়ি পাহাড়। রাস্তাটা এখানে ঢালু। দুপাশে ফাঁকা মাঠ, অল্প-স্বল্প গাছ, টেলিগ্রাফের একটা লাইন রাস্তার গায়ে গায়ে চলে গেছে।

রেলগাড়ির সঙ্গে মজার গাড়ির কোন কোনদিন দেখা হয়ে যায়। সাড়ে সাতটার প্যাসেঞ্জার গাড়ি। যতক্ষণ একসঙ্গে ছুটছে ছেলেমেয়েগুলো ভীষণ উত্তেজনা বোধ করে। রেল গাড়িকে

হারাবার জন্যে বাচ্চাগুলো একসঙ্গে চেঁচায়ঃ মুটুদা, হারিয়ে দাও, রেলকে হারিয়ে দাও। মুটুও গিয়ার বদলায়, যেন দেখাতে চায় তার গাড়ির শক্তিও কিছু কম নয়। হ্যাণ্ডিকাপ পেলে মুটু রেলকে হারায়, অবশ্য দেড়শো গজ দৌড়ে মুটু যদি পঞ্চাশ গজ হ্যাণ্ডিকাপ পায়। রেল হারলে ছেলেগুলোর খুব স্ফূর্তি। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একসঙ্গে সব ক'জন কলা দেখাবে আর দুয়ো দেবে রেলকে। রেলের এঞ্জিনের কাটা-দরজায় দাঁড়িয়ে মাথায় পট্টি বাঁধা ফায়ারম্যান দুয়ো পেয়ে হাত তুলে নাড়ে যতক্ষণ দেখা যায় গাড়িটাকে।

পথটা কিন্তু ভাল। ফাঁকা, শান্ত, স্তব্ধ। রোদ উথলে পড়ছে চারপাশে, মাঠগুলো বেশির ভাগই পতিত, কোনো কোনোটায় ডাল বোনা হয়েছে বা সরষে, মাঠের কোথাও কোথাও কুল অর্জুন আর অশ্বত্থ গাছ। পাখি উড়ে যায়, বাতাসে সরু শিসের ডাক ভাসে একটুক্ষণ, কোথাও বা রাখাল গরু-মোষ চরাচ্ছে। পথে বয়েল গাড়ির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে, সকাল বেলা জঙ্গলে চলেছে কাঠ কাটতে, বয়েলের গলায়-বাঁধা ঘণ্টা বাজছে, ফাঁকা জায়গায় ঘণ্টার সেই শব্দ চমৎকার শোনায়।

মাইল আড়াই এই ভাবে এগিয়ে আসার পর চোখে পড়বে ছোট্ট একটি গ্রাম। গাড়িটা এখানে থামে অল্প সময়। কুচকুচে কালো চেহারা, ছোট ছোট চুল, বড় বড় চোখ, নাক একটু খাঁদা একটি ছেলে, তারই হাত ধরে গোলগাল মোটা নাদুস-নুদুস একটি বাচ্চা মেয়ে এসে উঠবে গাড়িতে। ছেলেটার নাম টুসু, মেয়েটির নাম বেলা।

টুসু একটা ফুল পায় তুষারের কাছ থেকে। কোনদিন বা বেলাও। তুষারের নিয়ম, ডাকাডাকি না করতেই যে তৈরি হয়ে থাকবে গাড়ির জন্যে, সে একটা ফুল পাবে। অবশ্য তুষারের এই ফুল শেষাবধি আর থাকে না, কাড়াকাড়ি করে ওরা নিয়ে নেয়।

টুসুদের তুলে নিয়ে মজার গাড়ি যখন নিস্তব্ধ ফাঁকা রোদভেজা

মাঠ-ঘাট দুপাশে রেখে বিচিত্র দেহভঙ্গী ও শব্দ করতে করতে চলেছে, তখন সমস্বরে ছেলেমেয়েগুলো 'মজার গাড়ি'র ছড়া গায়। ছড়াটাও মজার। তুষারকেও মাঝে মাঝে গাইতে হয়। সেই কলকণ্ঠে গীত ছড়ায় অলস মাঠঘাট যেন প্রফুল্ল মুখে হেসে ওঠে।

দুই

পাহাড়ের মাটি আর কাকর ছড়ানো রাস্তা দিয়ে গাড়িটা শেষ পর্যন্ত যেখানে এসে থামে সেখানে ছোট বড় কয়েকটা কটেজ্। দূর থেকে দেখলে মনে হবে আদিঅন্ত ফাঁকা মাঠের মধ্যে পাহাড়তলীতে কয়েকটা ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আসলে এটাই সাহেবদাদুর 'শিশু-তীর্থ'।

অনেকটা দূরে পাহাড়ের তরঙ্গ, আকাশ এবং মেঘের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে কালচে-সবুজ একটি রেখা উত্তর পশ্চিম দিকটা ঢেকে রেখেছে। দিনের আলোয় সবুজ বনানী কার্পেটে তোলা সুতোর কাজের মতন দেখায়, বৃক্ষলতায় ঘন, অস্পষ্ট অবয়ব। বনের গণ্ডি ছাড়িয়ে ঢালু জমি, যেন পাহাড়ের চূড়া থেকে যে ঢেউ ভেঙে পড়েছিল—তার ভাঙন বন এবং বনের পর ঢালু মাটিতে গড়াতে গড়াতে এখানে এসে থেমে গেছে। এখানটা মোটামুটি সমতল। কিছু বৃক্ষ, কিছু পাথর। সাহেবদাদুর 'শিশু-তীর্থ' এই সমতলে পাহাড়তলীর নির্জন লোকালয়ের ছবির মতন দাঁড়িয়ে।

ছ-সাতটি কুটির, কটেজের মতন চেহারা; কোনটা ইটের, পাথর মাটি মিশিয়ে তৈরি; কারও মাথায় খাপরা, কারও মাথায় খড়ের ছাউনি। ঘন মেটুলি রঙের গা। শালের চারা কেটে কেটে এলাকাটার বেড়া দেওয়া হয়েছে। সামনের দিকের বেড়া বোধ হয় সামান্য বেশি মজবুত, কারুকর্ম কিছু কিছু চোখে পড়বে।

'শিশুতীর্থ'র এটা সামনের দিক বলেই হয়ত বেড়ার পাশে পাশে কোথাও জাফরি, কোথাও আকাশ-জালি, ফুল লতা-পাতার বাগান। জাফরি বেয়ে বুনো লতা উঠেছে, আকাশ জালিতে ছিটফুলের চুমকি, চন্দনের কৌটার মতন এক রকমের লতানো ফুল। মাটিতে বিবিধ পাতা গাছ, কোথাও গাঁদা কোথাও কলা ফুল কোথাও বা মোরগঝুঁটি—ঋতুর পথ চেয়ে ফোটে, পালা ফুরালে মরে যায়।

'শিশুতীর্থ'র সদর ফটক আছে একটা। কাঠের ফটক। ফটকের মাথায় মালতী লতার টোপর, দুপাশে ঝাউ—ঝাউয়ের কুঞ্জ। গায়ে গায়ে জবা গাছ, অপরাজিতার ঝোপ। ফটকের মাথায় কাঠের তক্তায় 'শিশুতীর্থ' নামটা ঝুলছে।

কাঁকরে মাটির রাস্তা ফটকের কাছ থেকে আদরে যেন ডেকে নিয়ে এই তীর্থের খানকটা পৌঁছে দেবে, তারপর আর বাঁধাধরা রাস্তা কোথাও চোখে পড়বে না। হয় মাটি, না হয় ঘাসভরা মাঠ, গাছের ছায়া, এদিক ওদিক মুখ করে আলো-ছায়ায় কুটিরগুলো দাঁড়িয়ে আছে তফাত তফাত।

এই রকম চার পাঁচটি কটেজ এ পাশে, সামনের দিকটায়। পিছনে—অনেকটা সবুজ মাঠের ওধারে আরও তিনটি বাড়ি, একই ধরনের অনেকটা, দুটো খুব গায়ে গায়—অন্যটা গজ পঞ্চাশ তফাতে। সাহেবদাদুর বাড়ি ওরই কাছাকাছি। পুবমুখো টালি ছাওয়া বাড়িটাই সাহেবদাদুর। ছোটো খাটো বাসা, সামনে পিছনে বাগান।

ঘরগুলোর পরিচয় দেওয়া দরকার। সামনের দিকের বাড়িগুলো ক্লাসরুম। লম্বা লম্বা চেহারা, উঁচু উঁচু মাথা, দেওয়ালের গায়ে বড় বড় জানলা। জানলায় খড়খড়ি। রোদ বাতাস খেলা করে ঘরে, জানলা দিয়ে গাছের ডাল-পালা দেখা যায়, আকাশ চোখে পড়ে।

এক মাঠ তফাতে পিছন দিকের তিনটে বাড়ির দুটোতে থাকে

কিছু ছেলে, দুজন শিক্ষক। সাহেবদাদুর বাড়ির কাছাকাছি লম্বা বাড়িটায় আশাদি আর রেবা। ঝি-চাকররা এই বাড়িরই একপাশে ঘর পেয়েছে, রান্নাঘরটাও বাড়ির গা লাগানো, ছেলেদের খাবার ঘর ওখানে।

সাহেবদাদুর কথা সামান্য বলতে হয়। গায়ের রঙ এবং মুখের গড়ন অনেকটা সাহেবদের মতন বলে ছেলেমেয়েরা এই ডাক শুরু করে দিয়েছিল কবে, সেই থেকে উনি সাহেবদাদু। সাহেবদাদুর বয়স হয়েছে, এখন বোধ করি প্রায় সত্তর। বার্ধক্য-হেতু চলা-ফেরা করেন খুব কম। চাকা গাড়িতে বসে মাঝেমাঝে তাঁর শিশু তীর্থের চারপাশ দেখে বেড়ান। অসুস্থ থাকলে বাড়ির বারান্দায় শুয়ে থাকেন, শুয়ে শুয়ে শিশুতীর্থের মেলা দেখেন।

সাহেবদাদুর পূর্ব পরিচয় ছিল, সে-পরিচয় তিনি কাউকে জানানো প্রয়োজন মনে করেন না। একদা কেমন করে যেন এসে পড়েছিলেন এদিকে। জায়গাটা ভাল লেগে গিয়েছিল। বছর কয়েক পরে আবার এলেন, সঙ্গে মাত্র একটি ভৃত্য। ছোট খাটো একটি মাথা গোঁজার জায়গা করে ঈশ্বর উপাসনায় মন দিতে চেয়েছিলেন; মন বসে নি। হঠাৎ কিছুদিনের জন্যে কোথায় চলে গেলেন, ফিরে এলেন মাসান্তে। সঙ্গে একটি শিশু। এই শিশুই তাঁর শেষ জীবনের মায়া মোহের শিকড় হয়ে তাঁকে এখানে বেঁধে রাখল, শান্তির স্বাদ জাগাল।

কোনো কোনো মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে শিউলি ফুলের তুলনা করা চলে। এরা অবেলায় ফোটে, যখন আর দিনালোক নেই, সন্ধ্যা নেমেছে তখন ফুটে ওঠে, অন্ধকারে সৌরভ বিলোয়, তারপর সকালে ঝরে যায়। সাহেবদাদুর জীবনের দিকে তাকালে মনে হবে, দিনান্তে তিনি যেন তাঁর হৃদয়ের আকুলতা অনুভব করে এই 'শিশুতীর্থ' গড়তে চেয়েছেন, এখন সেই পুষ্প বিকশিত। উষাকালের মুখ চেয়ে বসে আছেন এবার তিনি। এই তীর্থের মাটিতে ঝরে যাবেন।

'আমি ছিলাম ভবঘুরে—' সাহেবদাদু একদিন আশালতাকে বলেছিলেন মৃদু আচ্ছন্ন গলায় 'কে জানত বল, তোদের এই পাথুরে মাটিতে আ-ার পা এমনি করে গেঁথে যাবে!'

আশালতা পাথুরে মাটি শব্দটার অর্থ বুঝেছিল। তার মনে হয়েছিল, সাহেবদাদু সংসার থেকে পালাতে গিয়েও ফিরে এসেছেন বলে মাঝে মাঝে যেন স্নেহবশে এই সংসারকে তিরস্কার করেন।

আশালতা কোনো জবাব দিতে পারেন না। ইচ্ছেও করে না কিছু বলতে। মন কেমন বিষণ্ণ অথচ গভীর মমতায় সিক্ত হয়ে আসে। নীরবে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

সাহেবদাদু যে শিশুটিকে এনেছিলেন, একদিন সে সাহেবদাদুকে প্রায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল! ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবে:

তখন চৈত্র মাস। চাকরটার তাপ-জ্বর, সে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল। রোদের তাত সামান্য পড়ে আসতেই সাহেবদাদু তাঁর টমটম হাঁকিয়ে শহরে ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিলেন। শেষ বেলায় আচমকা ঝড় উঠল। ভয়ঙ্কর কালবৈশাখী। আকাশ কালো করা সেই দৈত্যকায় ঝড় এত ভীষণ চেহারা নিয়ে দেখা দিল যে, শিশুটি ভয়ে দিশেহারা হয়ে সঙ্গী খুঁজছিল। তার কোনো সঙ্গী ছিল না, বুড়ো চাকরটা জ্বরে বেঘোর। এই জনহীন প্রান্তর ঝড়ের গর্জনে ভরে গেছে, চারপাশ নিকষ কালো, গাছপালা গা মাথা লুটিয়ে মাটিতে আঁচড়াচ্ছিল, বাতাসের বেগ শাখা-প্রশাখা ভাঙছিল। ভীত শিশু তার একমাত্র সঙ্গী চাকরটার কাছে গিয়ে গা আঁকড়ে বসেছিল। কিন্তু জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ মানুষটা কোনো কথা বলতে পারেনি, কোনো সাহস সান্ত্বনা দিতে পারে নি, এমন কি চোখের পাতা খুলে তাকিয়ে থাকাও তার সাধ্যাতীত ছিল।

সাহেবদাদু যখন ফিরে এলেন তখন ঝড় থেমেছে, চাকরের ঘরে শিশুটি মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে বিছানার পাশে। ওকে মৃত দেখাচ্ছিল; মনে হচ্ছিল বীভৎস এবং ভয়ঙ্কর কিছুর সংস্পর্শে এসে সে অসহায়ের মতন কোনো অবলম্বন খুঁজেছিল, পায় নি; না পেয়ে

তিন

আজ সকালেও কালকের রাত্রের প্রকাণ্ড মেঘটার কিছু অবশেষ ছিল। যেমন ঘুম ভাঙার পরও ঘুমের রেশ, তেমনি রেশ ছিল বাদলার। অল্প পরেই টুটে গেল। ঝকঝকে রোদ ছড়ালো মাটিতে। আকাশ ধোয়া মোছা উঠোনের মতন নিকানো।

মাসটা আশ্বিন। এই সবে আশ্বিন পড়েছে। বৃষ্টি-বাদলের পালা ফুরোচ্ছে। একটু-আধটু শরতের বর্ষণ থাকবে কিছুদিন। নুটুর মনে তেমন আর উদ্বিগ্নতা নেই। এইমাত্র তার গাড়ি এসে থামল শিশুতীর্থর ফটকে।

তুষার নীচে নেমে দাঁড়াল। ছেলেমেয়েগুলো নামছিল হুড়োহুড়ি করে, কাউকে কাউকে হাত ধরে নামিয়ে দিচ্ছিল তুষার। কলকণ্ঠে ভরে উঠল জায়গাটা। যেন এক ঝাঁক পাখি হঠাৎ উড়ে এসে এখানের মাঠে নেমেছে।

ওরা নেমে গেলে বাস ফাঁকা। এই ফাঁকার দিকে তাকালে তুষারের একটা কথা প্রায়ই মনে পড়ে। ছেলেবেলায় সে দেখত, একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ির কামরা তাদের স্টেশনে কেটে রেখে বাকি গাড়িটা চলে যেত। বাবার অফিসে গিয়ে তুষার কিছুক্ষণ জ্বালাতন করত বাবাকে, তারপর প্লাটফর্ম ধরে হেঁটে হেঁটে অনেকটা চলে আসত শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। কামরাটা দাঁড়িয়ে আছে লাইনে, কোন কোন দরজা খোলা, ভেতরটা একেবারে ফাঁকা, কেউ নেই, কিছু নেই। মাঝে মাঝে এই ফাঁকা কামরার মধ্যে উঠে পড়ত তুষার। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত। কেমন যেন লাগত তার। ভাল লাগত না।

ফাঁকা বাসটার মধ্যে তাকিয়ে কয়েক পলক যেন তুষার ছেলেবেলার সেই দৃশ্য মনে করে নেয়। তারপর মাথা নীচু করে কোমর নুইয়ে তাকে আবার উঠতে হয় বাসে। তিনটে সরু সরু লম্বা বেঞ্চির

কোথাও না কোথাও, বেঞ্চির নীচে কিছু কিছু জিনিস রোজই পড়ে থাকে, ওরা ফেলে যায়।

তুষার চারপাশে একবার তাকিয়ে নিল। কে তার বই ফেলে গেছে একটা, এক কোণে ধ্রুবর নতুন লাট্টু পড়ে আছে, তপুর পিসি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব দেখে ভাইপোর গায়ে কোট পরিয়ে দিয়েছিল—তপু সেটা খুলে ফেলে কুঁকড়েমুকড়ে একপাশে ফেলে রেখেছে, বিনুর বা চন্দ্রার কানের দুল, বেঞ্চির তলায় এক পাটি জুতো। জুতোটা অশোকের। এক পাটি এখানে ফেলেছে, আর-একপাটি এতক্ষণে মাঠের কোথাও ফেলে রেখে পালিয়েছে।

একে একে তুষার সব কুড়িয়ে নিল। কুড়িয়ে বুকের কাছে জড়ো করে নীচে নামল। নুটু ততক্ষণে নীচে নেমে তার গাড়ির মুখের ঢাকা খুলে দিয়ে হাওয়া খাওয়াচ্ছে। তুষারকে নামাতে দেখে নুটু নিজের জায়গায় ফিরে এসে তুষারের বেতের টুকরিটা তুলে নিয়ে এগিয়ে দিল তুষারকে। এক হাত বুকের কাছে আড় করে বাচ্চাগুলোর ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র আগলে, অন্য হাতে নিজের বেতের টুকরিটা ঝুলিয়ে তুষার ফটকের দিকে এগিয়ে চলল।

ছেলেমেয়েগুলো কেউ আর এখানে নেই। নামা মাত্রই সব কটা দৌড় দেয়।

তুষার ফটক পেরিয়ে রাস্তা ধরল।

আশাদির ঘরে গান হচ্ছে। একেবারে কচিগুলো গান গাইছে। আশাদি নিজেও ভাল গাইতে পারে। সামান্য দূরে ডান দিকের ঘর থেকে আধো আধো কচি কচি গলার গান ভেসে আসছিল। তুষার হাঁটতে হাঁটতে সামনের দিকে তাকাল একবার। চমৎকার রোদ হয়েছে আজ, সোনার মত চকচক করছে। তুষার একটু মুখ উঁচু করে আকাশ দেখে নিল, নীলের রঙ লেগেছে, আশে পাশে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ।

গাছে গাছে পাখি ডাকছিল। কোথায় যেন অনেকগুলো চড়াই ঝগড়া বাধিয়েছে। একটা কাককে তাড়া করে লোমের ঝালর

ঝোলানো ক্ষুদে কুকুরটা ছুটতে ছুটতে তুষারের পায়ের কাছে পড়ল।

অভ্যর্থনা। ওর নাম তুলো। সাদা লোমের পুঁটলি বলে কুকুরটার ওই নাম হয়েছে। তুলো তুষারের পায়ের ওপর লাফিয়ে, শাড়ির প্রান্ত কয়েকবার দাঁত দিয়ে টেনে, লাফাতে লাফাতে আবার ছুটল।

তুষারের ঘর ও-দিকটায়; ওই যে কাঁঠাল গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে! তুষার তার ঘর দেখতে পেল। খোলা জানালা; পশ্চিম দিকের দেওয়াল ঘেঁষে ছায়ার চওড়া পাড় বসানো যেন। দোপাটির বাগান শুকিয়ে গেছে, কয়েকটা কলাফুলের গাছ ঘরের সিঁড়ির পাশে রোদে স্নান করছে। করবীর ঝোপ একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে।

সামান্য এগিয়ে আসতেই আড়াল পড়া দূরের ঘরটাও চোখে পড়ল। ওটা জ্যোতিবাবুর ঘর। জ্যোতিবাবুর ঘরের সামনে আমতলায় তাঁর ছেলেমেয়েরা শুয়ে-বসে কি যেন শুনছে, আর জ্যোতিবাবু একটা বেতের মোড়ায় বসে কি বলছেন।

মাঠের ঘাস মাড়িয়ে নিজের ঘরের দিকে আরও অল্প এগিয়ে আসতেই তুষারের চোখে পড়ল শিরিষ গাছের ডালে বাঁধা দোলনার ওপর আদিত্যবাবু বসে আছেন। তুষার যেতে যেতে মুহূর্তের জন্যে থামল, দেখল। কেমন অস্বস্তি বোধ করল।

আশাদির ঘর থেকে গানের সুর ভেসে ভেসে আসছে, জ্যোতি বাবুর ছেলেমেয়েরা একসাথে কি যেন একটা বলছে, সেই সমবেত স্বর কানে বাতাসের স্রোতের মতন এসে লাগল, তুষার সামান্য দ্রুত পায়ে তার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

শিরিষ গাছের কাছে আসতেই আদিত্য দোলনার পিঁড়ি একটু দুলিয়ে সামান্য যেন ঝুঁকে এল।

মুখ তুলল তুষার। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হলে যেমন মিষ্টি হাসি আসে মুখে তেমন হাসিমুখ করল।

আদিত্য শিষ্টাচার প্রকাশ করল না, যেন ও-সবের কোন

প্রয়োজন নেই। চোখের তারা স্থির, কয়েক মুহূর্ত দেখল তুষারকে. তারপর ঘরের দিকটায় প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করে দেখাল।

তুষার বুঝল। কিছু বলল না। ও চলে যাচ্ছিল, আদিত্য কথা বলল। 'আপনার ভেড়ার পালকে কি রকম ঠাণ্ডা করে রেখেছি দেখেছেন।' গলার স্বরে, বলার ভঙ্গীতে ব্যঙ্গ ছিল স্পষ্ট। আদিত্যর ঠোঁটের কোণায়, গালে বিদ্রূপের হাসিও দেখতে পেল তুষার।

পা বড়াতে গিয়েও তুষার একটু দাঁড়াল। তাকাল, তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। 'আসার পথেই বুঝতে পেরেছিলাম।'

আদিত্য দোলনা থেকে উঠে দাঁড়াল। 'আমায় দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন?

'বোঝা যায়।'

'কি বোঝা যায়, আমি রয়েছি।'

'হ্যাঁ।' তুষার মাথা নাড়ল। 'নয়ত আমার ঘরে এত শান্তশিষ্ট হয়ে সব থাকবে কেন।'

আদিত্যর হাতে একটা ঢিল ছিল, ঢিলটা সে দূরে একটা ময়নার দিকে ছুঁড়ে মারল। তুষার দেখল।

'আপনাদের এই—কি যেন শিশুতীর্থ না বোগাস কি যেন এই আখড়া—এই আখড়ার নিয়ম-কানুন কে তৈরি করেছে?' আদিত্য বিরক্ত মুখে বলল।

তুষার চোখে চোখে তাকাল আদিত্যর। 'কেন?'

'অল স্টুপিড।'

তুষার বিরক্ত বোধ করল, প্রকাশ করল না। 'এখানের কোন নিয়ম নেই।'

'তা ত দেখতেই পাচ্ছি, যার যা মর্জি চালিয়ে যাচ্ছে।'

'দায়িত্ব আছে।'

'কি?...কি বললেন কথাটা?' আদিত্য সমস্ত মুখ বিরূপ করে যেন ধমকে উঠল।

'বললাম দায়িত্ব আছে।' তুষার শান্ত গলায় জবাব দিল।

'খবরদার'—আদিত্য মাথা নেড়ে নেড়ে ব্যঙ্গ এবং রঙ্গের ভঙ্গিতে বলল, 'কাউকে যেন ভুল করেও কথাটা বলবেন না।' বলে আদিত্য হেসে উঠল, 'নিয়ম নেই, দায়িত্ব আছে। হাউ স্টুপিড।'

তুষার ভেবেছিল জবাব দেবে না। সে শান্ত থাকতে চেয়েছিল পারল না। বলল, 'নিয়ম মানুষ তৈরি করে, দায়িত্ব অনুভব করতে হয়।'

আদিত্য কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশের মতন চোখ বড় এবং স্থির করল। 'মানে কি কথাটার?'

তুষার মানে বলল না। ঠোঁটের আগায় হাসল একটু। বলল, 'আপনার জন্যে এখানকার নিয়ম দায়িত্ব কোনটাই নেই, ও-কথা তুলে কি লাভ।'

'লাভ।' আদিত্য অপ্রসন্ন উত্তেজিত স্বরে বলল, 'মুখে তো বললেন দিব্যি আমার জন্যে কিছু নেই, কিন্তু কাল কি হয়েছিল জানেন?

তুষার তাকাল।

'কাল সন্ধ্যেবেলায় আমি ওই কুয়াতলার দিকে—' আদিত্য হাত বাড়িয়ে দূরে একটা জায়গা দেখাল, 'একটা বুনো বক মারার চেষ্টা করছিলাম।'

'বুনো বক?'

'খোঁড়া বক। কি ভাবে চলে এসেছিল যেন। ভাল মাংস হত। ওই মেয়েটা—কি যেন নাম ইতি না কি, আপনাদের খোদ কর্তার বাড়ির মেয়েটা, সে এসে আমাকে ধমকে দিল।'

তুষার ভেতরে ভেতরে অশান্তি বোধ করছিল, ওপরে কিছু প্রকাশ করল না, বরং কত যেন অন্যায় কাজ করা হয়ে গেছে এমন গলা করে বলল, 'না কি? আমাদের ইতি—'

'আকাশ থেকে পড়বেন না। আপনাদের ইতি-ফিতি আমি বুঝি না, বুঝতে চাই না। গাছের পাখি, বনের বক মারব তার আবার এখান-ওখান কি আছে! মেয়েটা এসে আমার

মুখের ওপর শাসিয়ে বলে গেল, মারবেন না, দাত্বর বারণ, রাগ করবেন !,

আদিত্য যেন কালকের অপমান এবং আক্রোশ নতুন করে অনুভব করছিল, 'আমি একটা বক মারব তাতে তার দাত্ন রাগ করবে কেন ? কি আমার এল গেল তার দাত্বর রাগে। আরও একদিন ও আমার দাত্বর কথা বলে শাসিয়েছিল, আমি এখানে বেড়াতে বেড়াতে সিগারেট খাচ্ছিলাম।'

তুষার বিব্রত বোধ করছিল। চলে যেতে পারলে সে বাঁচে। বলল, 'এখানে এই চৌহদ্দির মধ্যে কতক জিনিস আছে যা করা অনুচিত।'

'যেমন—?'

'নিষ্ঠুর কিছু কাজ, অভব্য কোন আচরণ—।'

'মাংস খাওয়াটা নিষ্ঠুরতা, সিগারেট খাওয়া অভব্যতা—এসব আমায় শিখতে হবে ?'

'সব জায়গায় সবকিছু করা যায় না।'

'না করার জন্যে আপনাদের নিয়ম আছে দেখছি।' আদিত্য উপহাস করে বলল, 'ফন্দি-ফিকিরগুলো ভাল। সোজাসুজি বললেই পারেন, পয়সা নেই মাছ-মাংস খাওয়াবার তাই কাঁচকলার ঝাল খাওয়াই, ওসব বাজে কথা বলার কি দরকার ?'

তুষার কোন জবাব দিল না। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। আদিত্য পিছন থেকে জোরে জোরে বলল, 'মানুষ ছাগল নয়। আপনারা একটা খোঁয়াড় তৈরি করে রেখেছেন। অল স্টুপিড।

তুষার পিছন ফিরে তাকাল না, সিঁড়ির অল্প কয়েকটি ধাপ ভেঙে বারান্দায় উঠল।

আদিত্য তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। তুষারেরব হাঁটা দেখতে তার ভাল লাগে। স্কুল, মাংস, সিগারেট—কোন কিছু আর মনে পড়ছিল না আদিত্যর। তুষারের শরীর তার ইন্দ্রিয়কে কেমন কাতর করছে। তুষার সুন্দর। তুষার···

তুষারের নীরব ঘর থেকে আচমকা একটা কলরব ভেসে এল, যেন জানলা খোলা পেয়ে একঝাঁক পায়রা বন্ধ ঘর থেকে একসঙ্গে ডানা ঝাপটে বাইরে বেরিয়ে এল। আদিত্যের অন্যমনস্কতা নষ্ট হল শব্দে, ঘরটার দিকে ঘৃণা এবং বিরক্তির চোখে তাকিয়ে আদিত্য দাঁতে দাঁত ঘষে অস্পষ্ট গলায় কি যেন বলল একটা। তারপর মাঠ দিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

নিজের ঘরে ঢুকে তুষার একটা হাস্যকর অবস্থা দেখল। তার ঘরের ছেলেমেয়েরা আসন হয়ে বসে, মুখের কাছে খোলা বই নিয়ে চুপ করে বসে আছে। বীরুর চোখ বন্ধ, সে সমানে বই হাতে করে দুলছে, কানু দু হাতে দু-কান ধরে বসে আছে। মালা বইয়ের আড়াল দিয়ে আমসত্ত্বের টুকরো চুষছে।

তুষার নিজের জায়গায় গিয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে রাখল। রোদের তাতে তার কপালে গলায় সামান্য ঘাম হয়েছে। শাড়ির আঁচলে মুখ মুছে তুষার আবার একবার ওদের দেখল।

ততক্ষণে ছেলেমেয়েরা সব যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। পিছু ফিরে একবার দেখে নিল নতুন লোকটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কি না। নেই, কেউ নেই। সঙ্গে সঙ্গে বীরুর দুলুনি থেমে গেল, চোখের পাতা স্প্রিঙের মতন খুলে গেল, এক লাফে বীরু দাঁড়িয়ে উঠল। কানু কান ছেড়ে মালার হাত থেকে আমসত্ত্ব কেড়ে মুখে পুরে দিল টপ করে। মালা কানুর জামা খামচে ধরল।

'তোরা সকলে এত লক্ষ্মী হয়ে বসে!' তুষার বলল, বলে এক পা এগিয়ে এল।

লক্ষ্মীরা নিমেষে যে কত বড় লক্ষ্মীছাড়া হতে পারে তার প্রমাণ দিতেই একজন কোথা থেকে একটা এয়ারগান বের করে ফট করে শব্দ করল, একটা ছেলে প্যান্টের পকেট থেকে বেলুন বাঁশি বের করে ফুঁ দিয়ে ছেড়ে দিল, বাঁশি বাজতে লাগল, অন্যগুলো কোলাহল করে উঠল, কেউ তুষারের কাছে ছুটে গেল, কেউ বা বসে বসেই অন্যের সঙ্গে খুনসুটি শুরু করল।

যে-ঘর এতক্ষণ ফাঁকা নির্জীব নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছিল—তুষার আসার পর সেই ঘর যেন জীবন্ত মুখর হয়ে উঠল। এই ঘরের এটাই রীতি, এ-রকমই স্বাভাবিক।

তুষারের ঘরের একটু বর্ণনা দিতে হয়। ঘরটা খুব বড় নয়, লম্বা ছাঁদের দেখতে। মাথার ওপর খাপরার ছাউনি, চটের সিলিং দেওয়া। সিলিঙের ওপর ঘন চুনকাম্। দেওয়ালগুলোতে প্লাস্টার নেই, ইঁটের গাঁথনির গায়েই চুনকাম পডে পড়ে সাদা হয়ে আছে। দুপাশের বড় বড় জানলা গোটা চারেক।

ঘরের মেঝে সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো। প্রায় সমস্ত ঘর জুড়ে পাতলা চট ছড়ানো, তার ওপর বড় বড় সতরঞ্জি পাতা। বাচ্চাগুলো মাটিতে বসে, ছোট ছোট ডেস্ক পড়ে আছে—একটা বেঞ্চিও। ঘরের দেওয়ালে কাগজের ফুল সাজানো, দু'চারখানা ছবিও। তুষারের বসবার দিকটা বারো রকম জিনিসে ভরা, কিন্তু ছবির বই-পত্র, গ্লোব, ব্ল্যাকবোর্ড, ন্যাকড়ার খেলনা, মাটির মূর্তি, আরও কিছু কিছু জিনিস এই রকমের।

তুষারের বসবার একটা চেয়ার আছে অবশ্য কিন্তু সেটা এক-পাশে সরিয়ে রাখা, টেবিলটাও। বেতের মোড়াটা টেনে নিয়েই বেশির ভাগ সময় বসে তুষার, কখনও কখনও সরাসরি সতরঞ্জির ওপর আসন হয়ে, কিংবা হাঁটু ভেঙে।

তুষারের বসবার দিকটার এক কোণে ছোট একটা দরজা খুললে কুঠরি মতন এক ফালি ঘর চোখে পড়বে। ঘরটা নানা কাজ অকাজের খুচরো জিনিসে ভরা, তবু, ওই ঘরেই নিচু ছোট জানলার পাশে একটা ক্যাম্বিসের হেলানো চেয়ার দেখলেই বোঝা যায় এটা তার বিশ্রামের নিভৃত স্থান।

তুষারের ঘরে এই রকম একটা কুঠরি থাকলেও সকলের ঘরে নেই। আশাদির ঘরে নেই, মলিনার ঘরেও নয়। জ্যোতিবাবুর ঘরে আছে, যদিও জ্যোতিবাবু সেটা ব্যবহার করেন বলে মনে হয় না।

তুষারকে যারা ঘিরে ধরেছিল তাদের একজনের গালে কালির

দাগ। তুষার বুঝতে পারল না, এতখানি কালি কি করে ও মুখে মাখল।

'ইস্!' তুষার ছেলেমানুষের মতন গলা করে বলল, বলে জিভ বের করল, যেন কত বড় একটা অঘটন ঘটিয়েছে ছেলেটা। 'মুখে কালি মাখালি কি করে রে, শানু?'

কালি মেখে শানুর কোনো অনুশোচনা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। বরং সে গাল দুটো আরও ফোলাল, ফুলিয়ে চোখ বড় বড় করল।

'ও বহুরূপী সাজছিল দিদি...' অশোক বলল।

'বহুরূপী?' তুষার অবাক!

'আমি কাল একটা বহুরূপী দেখেছি।' শানু চোখ ঘুরিয়ে বলল। শানুর ওপর পাটির তিনটে দাঁতই পড়ে গেছে, নতুন দাঁত এখনও ওঠে নি। মাথার চুল খোঁচা খোঁচা।

ততক্ষণে যমুনা তুষারের বই খাতা কাগজপত্র এটা সেটা রাখা টেবিল থেকে কালির শিশিটা এনে দিয়েছে তুষারের হাতে। তুষার শিশি দেখেই বুঝতে পারল। কাল একটা লেখার কাজ করছিল তুষার, কালির শিশি বাইরে বের করেছিল, তুলে রাখতে ভুলে গেছে।

শানুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তুষার কোলের কাছে টেনে নিল; হাসল. 'কেমন বহুরূপী দেখেছিস রে, শানু?'

শানু সঙ্গে সঙ্গে তুষারের কোলের কাছ থেকে ছিটকে দুহাত সরে এল। সরে এসেই দু হাত তুলে চোখ জ্বলজ্বলে করে বহুরূপীর বিবরণ দিতে লাগল। 'এত্ত বড়!...রাজা হয়েছিল। লাল জামা গায়ে, হাতে ধনুক ছিল। সেই বহুরূপীটাকে ছোট মামা একটা টাকা দিল!'

'রাজা বহুরূপী?' তুষার ছেলেমানুষ হয়ে শানুর গল্প শুনতে লাগল।

'হ্যাঁ'—শানু মাথা নাড়ল। তারপরেই হেসে ফেলল কেমন,

বলল, 'রাজাটার না দিদি, রাজাটার তরোয়ালই নেই—।' শান্নুর হাসি এবং কথা থেকে মনে হবে যে-রাজার তরোয়াল নেই সে আবার কেমন রাজা!

তুষার তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। ঘরের অন্যদিকে কুণু আর নন্তুতে ডিগবাজি খাওয়া খেলা খেলছে; হাবুল মাটিতে মাথা আর দেওয়ালে পা তুলে দিয়ে ক্রমশ ঠেলে ওঠার চেষ্টা করছে—কতদূর পা তুলতে পারে তারই পরীক্ষা, পড়ে যাচ্ছে পা, আবার চেষ্টা করছে। ঘরের মধ্যে অনর্গল কথা, চিৎকার, হাসি।

তুষার মাটিতে হাঁটু ভেঙে বসে বলল, 'রাজাটা বোধ হয় ভুল করে তরোয়াল বাড়িতে রেখে গিয়েছিল, শান্নু।'

শান্নু তাকাল। কথাটা তার মনে লাগল। হতেও পারে এটি হয়ত সত্যি সত্যি তরোয়াল তার ছিল, বাড়িতে ফেলে গিয়েছিলে। শান্নুর চোখ-মুখ দেখে মনে হল, সে ভাবছে। তার দুঃখই হচ্ছিল। আহা তরোয়ালটা থাকলে কেমন ভাল দেখাত রাজাকে।

যমুনা হাঁটু ভেঙে তুষারের পিঠের কাছে বসে। তুষারের খোঁপার ওপর একটা কুটো পড়েছিল কিসের। যমুনা কুটোটা তুলে নিয়ে ফেলে দিল। বলল, 'বহুরূপীরা আগের জন্মে গিরগিটি ছিল।'

তুষার হাসল না। তাকে নিত্য এ-রকম অদ্ভুত মজার মজার কথা শুনতে হয়। যমুনার দিকে মুখ ফিরিয়ে তুষার বলল, 'কে বলল রে?'

'পিসিমা।'

'ও!·· তুই বহুরূপী দেখেছিস?'

'হুঁ' ক—ত দেখেছি।'

'কি কি সাজতে দেখেছিস?'

'অ—নেক, হনুমান, রাক্ষস···' যমুনা ভেবে ভেবে বলল, 'ধোপা, শিব, দুর্গা, অর্জুন···,

'অর্জুন সাজতেও দেখেছিস ?'

যমুনা মাথা কাত করে হেলাল।

তুষার একটু কি যেন ভেবে নিল। 'অর্জুনের গল্প জানিস তোরা ?'

একটু আধটু জানত সবাই; কিন্তু কেউ আর কিছু বলল না। ওরা জানে, তুষারদিদি অর্জুনের গল্পটা নিজেই বলবে। সবাই একটু ঘেঁষে গুছিয়ে বসল।

তুষার হাতে তালি দিয়ে সকলকে চুপ করতে বলল। এত সহজে সবাই শান্ত হবে এমন কথা ভাবা ভুল। রুণু, নন্তু কিংবা হাবুলের কানে তুষারের তালির শব্দ পৌঁছেছে বলেও মনে হল না। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুটি মেয়ে হাতে তালি দিয়ে 'বি-কুইক' খেলছে।

তুষার এবার নাম ধরে ধরে ডাকল প্রত্যেককে। যমুনা ঘোষণা করে দিল, দিদি অর্জুনের গল্প বলবেন। দেখা গেল, গল্পের নামে সবাই কাছে ঘেঁষল পলকে। তুষারকে ঘিরে বসল ওরা।

গল্প শুরু করার আগে তুষার তার বেতের টুকরিটা আনিয়ে নিল। তারপর গল্প শুরু করল।

গল্পের মধ্যে তুষার কোন ছেলের জামায় সেফটিপিন আটকে দিল, কারও চুল আঁচড়ে দিল, মেয়েদের বিনুনি বেঁধে দিল। পরিবেশটা স্কুলের নয়, ঘরের; মনে হবে বাড়িতে দালানে বসে যেন কোন দিদি মাসি পিসি তার স্নেহের পাত্রদের সাজিয়ে-গুছিয়ে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

অর্জুনের গল্প শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে কেউ জানে না। কিন্তু আর একটু বেলায় এদের সকলের খাওয়ার ছুটি। তুষার ওদের নিয়ে খাওয়ার ঘরে চলে যাবে। হাত-মুখ ধুইয়ে খাওয়াবে সকলকে। তারপর বিশ্রাম। ওরা এই ঘরে এসে শুয়ে পড়বে। অবশ্য কেউ বড় একটা শোয় না। খেলা করে, দুরন্তপনা করে।

তুষার গল্প বলতে বলতে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। রোদ গাঢ় হয়ে উঠেছে। পাখিদের কিচ-কিচ শব্দ ভেসে আসছে।

হাত-ঘড়ি দেখল তুষার, দশটা বেজে গেছে।

গল্পটা মাঝপথে, শিশু-তীর্থের পেটা ঘড়িতে ঘণ্টা বাজল। দূর থেকে শব্দটা কেঁপে-কেঁপে ভেসে এল। খাওয়ার ছুটি।

গল্পের আকর্ষণে কেউ উঠল না। তুষার হাসল। বলল, 'চল। বাকিটা পরে হবে।'

'দুপুরে?' শানু শুধলো।

'কাল।'

'না, না, আজ ' তুষারকে কয়েকজনে মিলে জাপটে ধরল।

'আজ দুপুরে ওই গানটা হবে যে, পুশি ক্যাট পুশি ক্যাট হোয়ার হ্যাড ইউ বিন...'

ওটা গান নয়, ইংরেজী ছড়া। সবাই জানত কথাটা। এ-ঘরেও গান হয়, তুষারদির সঙ্গে তারা সবাই গায়। সেগুলো বাংলা গান। ইংরেজী ছড়ায় গানের মজা নেই, কিন্তু তুষারদি ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলা খেলান। খেলাটা খুব মজার।

'আমি আজ ক্যাট হব।' টুটুল বলল।

শানু টুটুলকে কাঁচকলা দেখাল। ফলে টুটুল শানুর ওপর লাফিয়ে পড়বে এটা স্বাভাবিক। শানু দু-হাত মুঠো করে পাকিয়ে শূন্যে ঘোরাতে ঘোরাতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলছিল, 'আমি টাইগার। ক্যাটকে খেয়ে ফেলব।'

তুষার উঠল। বেতের টুকরি হাতে করেই উঠে দাঁড়াল। ছেলেমেয়েরাও তৈরি। বলল, 'চল তোরা।'

হুড়মুড় করে ছেলেমেয়েগুলো ঘর থেকে দৌড় দিল।

তুষার চলে যাচ্ছিল। যেতে গিয়ে তার জুতোর কথা মনে পড়ল, অন্যান্য জিনিসগুলোও নিল তুষার। জামাটা নিল না। জামাটা যার তাকে নিজের ঘরেই পাওয়া যাবে। অন্য বাচ্চাদের জিনিস এবার দিয়ে দেবে তুষার।

বাইরে এসে তুষার দেখল, তার ঘরের ছেলেমেয়েরা ছুটে অনেকটা দূরে চলে গেছে!

চার

শিশু-তীর্থর সব ব্যবস্থাই একটু অন্য রকম। এখানে স্কুলের মতন করে ক্লাস হয় না, পড়া-শোনা করানোর রীতি নেই। সাহেব দাদু যখন শিক্ষা নিয়ে রীতিমত মাথা ঘামাতে বসলেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল, কচি বয়সের এই ছেলেমেয়েগুলোকে ক্লাস-রুমে পুরে খোঁয়াড়ের মতন আটকে রেখে কোন লাভ নেই। পড়া-শোনাকে জীবনের আর সমস্ত থেকে আলাদা করে দেখা আমাদের স্বভাব। এটা ভাল না।

সাহেবদাদু এমন একটা ব্যবস্থা খুঁজছিলেন যাতে এই কচি বয়সের ছেলেমেয়েগুলোর জীবন-যাপন এবং শিক্ষাকে অঙ্গীভূত করা যায়, যেন, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই এরা যেটুকু শেখবার শেখে, বাকিটুকু ফেলে দেয়।

কিছু কিছু বিদেশী বই আনিয়ে বিভিন্ন শিক্ষার ধারা বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি, কোন কোনটা মনঃপুত হলেও তাঁর সামর্থ্য যা তাতে বড় কিছু একটা করার উপায় ছিল না। ফলে ইচ্ছে থাকলেও সে-সব বৃহত্তর ব্যাপারে তিনি যান নি। এমন সময় হল্যাণ্ড না কোন্ দেশের গ্রাম্য বিদ্যালয়ের একটা পদ্ধতির বিবরণ তাঁর চোখে পড়ে। ব্যবস্থাটা তাঁর ভাল লাগে, ভরসা হয় এখানে এই রীতি তিনি চালু করতে পারবেন।

অন্যের পরিকল্পনা নিজের মনের মতন করে, সম্ভব-অসম্ভব খতিয়ে দেখে তাঁকে সেই ব্যবস্থাটা এখানের মতন করে গড়ে নিতে হয়েছে। সেই নিয়মেই শিশু-তীর্থ চালানো হয়।

এখানে গোটা পাঁচেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী। ছাত্র সংখ্যা ষাট-পঁয়ষট্টি। ছাত্রদের ভাগ করা হয়েছে বয়স দেখে, কখনও কখনও তাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি বৃত্তি দেখে। এদের এক একটি দলকে এক একজন শিক্ষকের হাতে সম্পূর্ণ ভাবে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন

তুষারের হাতে যারা আছে তারা একান্ত ভাবেই তুষারের হাতে মানুষ হচ্ছে। 'তুষারের ঘর' কথাটার অর্থ তুষারের ক্লাস। তুষারের ছাত্রদের যাবতীয় যা কিছু তুষারই শেখাবে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় মাষ্টার বদলাবে, একজন এসে ইংরেজী শেখাবে, অন্যজনে অঙ্ক—এসব ব্যবস্থা এখানে নেই। সাহেবদাদুর ধারনা ভাগের মা গঙ্গা পায় না যেমন, তেমনি পাঁচ হাতে শিক্ষা হয় না। শিক্ষা এক হাতে একের অধীনে হওয়া দরকার। তাতে মানুষের মনে যে পারিবারিক বোধ আছে তার বিকাশ হয়, যারা শেখে তারা শিক্ষকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, আত্মীয়তা বোধ করে। আর যে শেখায় তার সুখ এই, সে নিজের মনের মতন করে, নিজের কল্পনা মতন ছাত্রদের শেখাতে পারে। এই স্বাধীনতা না থাকলে, সাহেবদাদু বলেন, টীচার আর কি শেখাতে পারে! আমরা মাস্টার ভাড়া করি, তাঁদের হাতে ভার তুলে দিই না। পিতা-মাতার যেমন সন্তান—ছাত্র এবং শিক্ষকের সম্পর্কটা সেই রকম পারিবারিক ও অন্তরঙ্গ করতে হবে, দায়-দায়িত্ব সব থাকবে তাঁরই ওপর, যেমন ছেলেমেয়ের দায় শিক্ষা সবই তার বাবা-মার।

সাহেবদাদুর এই নীতি যে কার্যক্ষেত্রে সফল হয়েছে, শিশুতীর্থ দেখলে সেটা বোঝা যায়। বোঝা যায়—তুষার, আশাদি জ্যোতি-বাবুকে দেখলে। আর দুজন আছে এখানে, প্রফুল্লবাবু আর মলিনা, এরা দুজনেই নতুন। প্রফুল্ল কেন যেন এখনও ঠিক তৈরী হয়ে উঠতে পারে নি। মলিনা তৈরি হয়ে উঠতে পারবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

খাবার ঘরে ছেলেমেয়েগুলোর খাওয়া-দাওয়া শেষ হল। তুষারের ঘর আর মলিনার ঘরের বাচ্চাগুলোর পর বাকি তিন ঘরের ছেলে-মেয়েরা এসে খাবে। জ্যোতিবাবু আর খাবার ঘরে আসেন না, প্রফুল্লবাবুও নন। আশাদি একাই সব ক'জনকে সামলে খাইয়ে দেয়। ঠাকুর আছে, ঝি আছে। অসুবিধে বড় একটা হয় না।

খাওয়ার ব্যাপারটা ঐখানে খুবই সাধারণ। ভাত, ডাল, তরি-তরকারি, মাছের টুকরো, পাতে থাকে কোনদিন, কোনদিন থাকে না। বাচ্চাদের দুধ দেবার খুবই সাধ ছিল সাহেবদাদুর।—সংগ্রহ করা মুশকিল বলে পেরে ওঠেন না বেলা দুটো নাগাদ এদের জলখাবার দেওয়া হয়। কোনদিন রুটি-তরকারি, কোনদিন ফল-মূল, কোনদিন বা আর কিছু।

তিনটেয় ছুটি। নুটুর বাস শহরের ছেলেমেয়ে নিয়ে ফিরে যায়। এখানে যারা থাকে তারা ছোটে সাহেবদাদুর বাড়িতে।

বাচ্চাদের খাওয়া শেষ হলে তুষার কারও কারও হাত-মুখ ধুয়ে দিল, মুছিয়ে দিল। ছেলেমেয়েগুলো ছুটতে ছুটতে খেলতে খেলতে চলে গেল মাঠের দিকে।

মলিনা বাইরে জলের ড্রামটার কাছে দাঁড়িয়েছিল। পাশে দুটো কলাগাছ, একটা পেঁপে গাছ; হাত পনেরো ঘুরে রান্নাঘর। এঁটো পাতার ডাঁই এনে মতি-ঝি আঁস্তাকুড় রাখা চৌবাচ্চাটায় ফেলল।

এখানে শরৎ আর হেমন্তর তফাতটা যেন ভাল করে বোঝা যায় না। আজ বোঝা যাচ্ছিল আকাশের দিকে তাকিয়ে রোদ লক্ষ্য করে। সারা আকাশ খুব হালকা নীল, যেন সেই নীল থেকে কুলোয় করে কেউ ঝকঝকে রোদ ঝেড়ে ঝেড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফড়িংয়ের মতন কয়েকটা সবুজ পোকা উড়ছিল। পেপে গাছের চিকরিকাটা পাতার ডগা দুলছে থেকে থেকে, কলাগাছের তলায় দুটো বেড়াল বাচ্চা খেলা করছে।

মলিনা রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলল, 'তুমি আমাদের পাড়ায় গিয়েছিলে তুষারদি?

তুষার হাত ধুয়ে ড্রামের কাছ থেকে সরে এল। 'না, যাই নি।'

'তুমি ওদিকে যাও না?'

'খুব কম। আমি বাড়ি থেকে বড় একটা বেরোতে পারি না।'

মলিনা শাড়ির আঁচলের পাক গলায় জড়াল একবার, আবার খুলল। মুখচোখ খুব বিরস। তুষারের দিকে তাকাল না, অনেকটা আপন মনে কথা বলার মতন করে বলল, 'বাড়িতে থেকেও তুমি বেরুতে পার না, আর আমরা—' কথাটা মলিনা শেষ করল না।

তুষার লক্ষ্য করল মলিনাকে। মলিনা এই রকম। তার কথা কখনও পুরোপুরি বোঝা যায় না।

'তোমাদের কি হয়েছে- ?' তুষার শুধালো।

মলিনা জবাব দিল না। তার মুখের হতাশ বিরক্ত অসুখী ভাব থেকে যা বোঝার বুঝতে হবে। মলিনার মুখে কখনও হাসি থাকে না। ও কখনও খুশী নয়। মলিনার মনে যে সুখ নেই, সর্বক্ষণ যেন সে সেটা প্রকাশ করতে চায়।

তুষারের হাতে বেশী সময় নেই। আশাদির কোয়াটারে গিয়ে তাকে স্নান করে নিতে হবে। সকালে তুষার স্নান করে আসতে পারে না। এখানে এসে এই খাওয়ার ছুটিতে যে স্নান করে নেয়। স্নান করে, খাওয়া-দাওয়া সারে। ঘণ্টাখানেকের বেশী সময় সে নেয় না। কেই বা নেয় এখানে। আশাদি অবশ্য মাঝে মাঝে বলে, 'দেখ তুষার, আমার বড় আলসামি বাড়ছে, খাওয়ার পর একটু শুয়ে আসতে ইচ্ছে করে। কেন বল ত?

'সকাল থেকেই যে তোমার খাটুনি।'

'সে ত তোরও।

'তোমার মতন নয়।'

কথাটা অবশ্য ঠিক। এই এতগুলো ছেলেমেয়ে তারা পাঁচ সাত জন--সকলের রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়ার ভার আশাদির ঘাড়ে। জ্যোতিবাবু বাজার আর ভাঁড়ারের দায় মাথায় নিয়েছেন, বাকি সব দায় আশাদির। খুব সকালে উঠে আশাদি ঠাকুর-চাকরদের এদিকের ব্যবস্থা বুঝিয়ে এবং গুছিয়ে দিয়ে তবে অন্য কাজে হাত দিতে পারে।

তুষার সময় নষ্ট করতে পারছিল না। খাবার ঘর পরিষ্কার করে অন্য দলের পাতা পাড়ছে। মলিনার কোন তাড়া নেই। তুষার বলল, 'তোমার কোন দরকার আছে? কাজ থাকে তো বল, আমি বরং সময় করে একবার তোমাদের ওদিকে যাব।'

'দরকার।...'মলিনা তুষারকে অন্যমনস্ক চোখে দেখল। 'না, দরকার নেই কিছু।' দু' মুহূর্ত থেমে চাপা গলায়, যেন অনুচিত কোন অনুরোধ করেছে এমন সুরে বলল, 'আমি পাঁচটা টাকা দেব তোমার হাতে। বাড়িতে যদি পৌঁছে দাও। বাবা একটা ধুতি কিনতে টাকা চেয়েছিল।' মলিনার মুখ অপ্রসন্ন, তিক্ত।

তুষারের ভাল লাগছিল না। মলিনার বাড়ির কথা উঠলে তার অস্বস্তি হয়, ভাল লাগে না। তুষার বলল, বেশ তো দিয়ো। আমি পাঠিয়ে দেব।'

তুষার আর অপেক্ষা করল না! আশাদির ছেলেমেয়েগুলো আসছে, তাদের গলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তুষার বারান্দার মতন ঢাকা জায়গায় উঠে দেওয়ালের পেরেকে ঝুলোনো বেতের টকরিটা নিয়ে চলে গেল।

সামনেই আশাদির কোয়ার্টার, গা লাগানো। এই কোয়ার্টারে আশাদি আর মলিনা থাকে। দুজনের দুটো ছোট ছোট ঘর, এক ফালি বারান্দা। কাঠের জাফরি দিয়ে বারান্দাটাও অনেকখানি ঘেরা। কোয়ার্টারের পেছন দিকে উঠোন, কলঘর।

আশাদির ঘর খোলাই থাকে। তুষার ঘরে এসে বেতের টুকরিটা রাখল।

ঘরের জানালাগুলো খোলা। রোদ এসে বিছানায় পড়েছে আশাদির। ঘরটা ছোট, খুব সাধারণ ভাবে সাজানো, বিছানার তক্তপোষ ছাড়া আসবাবের মধ্যে একটা ছোট টেবিল—খান দুয়েক বেতের মোড়া; এক কোণে আশাদির সেলাই কল, বাক্স, সুটকেশ। জানলার পরদা নেই। দেওয়ালে আশাদির মা-র ফটো। একটি ক্যালেণ্ডার ঝুলছে পশ্চিমের দেওয়ালে।

ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

একটা মোড়া টেনে তুষার একটু বসল। এলো খোঁপাটা খুলে নিল। কাল মাথায় জল দিতে পারে নি; আজ জল না দিলে বিকেলে আর মাথা তোলা যাবে না। বেতের টুকরি থেকে শাড়ি জামা বের করে পাশে রাখল তুষার—বিছানার ওপর, চিরুনি বের কবে চুলের গোড়ার জট ছাড়িয়ে নিল। তুষার তেল আনতে ভুলে গেছে আজ। তাতে কোন ক্ষতি নেই। কলঘরে আশাদির মাথায় মাখা তেল আছে—নারকেল তেল। তুষার কোনদিনই মাথায় একরাশ তেল মাখতে পারে না, অথচ একটু তেল জল না পড়লে তার বড় মাথা ধরে।

রান্নাঘর থেকে বাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়ার শব্দ প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভেসে আসছে। ওরা এই রকম, খেতে বসেও শান্ত নয়। জ্যোতিবাবু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তদারক করেন, আশাদি ভেতরে পাতের কাছে ঘুরে ঘুরে দেখছেন, তবু যেন মনে হবে একটা ছোট হাট বসে গেছে।

চুল ছাড়িয়ে শাড়ি জামা হাতে নিয়ে তুষার উঠে পড়ল। পিছনের দরজার ছিটকিনি খুললেই উঠোন, উঠোনের একপাশে কলঘর। উঠোনের দুধারে দুই খুঁটি, তার বাঁধা। আশাদি আর মলিনার সকালের শাড়ি জামা শুকোচ্ছে। রোদ উঠোন মাড়িয়ে ডালিম গাছটার দিকে সরে গেছে অল্প। কয়েকটা চড়ুই ফর ফর করে উড়ছিল।

তুষার তাড়াতাড়ি স্নান করতে কলঘরে ঢুকে গেল। ড্রামে আজ জল কম। আশাদি বোধহয় সকালে স্নান সেরে রেখেছে। জল সাবান গোলা। তুষার তার গা-মোছা গামছাটা খুঁজে পেল না। কলঘরের একপাশে দড়িতে তার গামছা থাকে। কোথায় গেল গামছাটা? আবার কলঘর থেকে বাইরে আসতে হল তুষারকে। বাইরে কোথাও তার গামছা নেই। তুষার মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হল।

সাবান গোলা জলে স্নান করতে করতে তুষার মলিনার কথা ভাবল। মলিনা এই রকম। তার সব কাজই অপরিষ্কার। এই জল সে সাবান দিয়ে ঘোলা করেছে, ওই যে কয়েকটা নোঙরা পড়ে আছে এক পাশে—ভেতর-জামা, সায়া, ওগুলোও মলিনার। নিজের হাতে তোলার অবসর পায় নি, ফেলে রেখেছে, ঝিকে দিয়ে কাচিয়ে নেবে। তুষারের মনে হল, গামছাটাও বোধহয় মলিনা ব্যবহার করে ঘরে নিয়ে গিয়ে কোথাও ফেলে রেখেছে।

স্নান সেরে ধোওয়া কাপড় জামা গায়ে জড়িয়ে তুষার বেরিয়ে এল। তার ধোওয়া শাড়ি জামা নিঙড়ে রোদে মেলে দিতে দিতে আকাশের তলায় দুটো চিলকে সাঁতার কাটতে দেখে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল তুষার। তার ভাল লাগছিল।

রোদে মেলা ভিজে শাড়িতে একবার করে মাথা মোছে তুষার আবার একবার করে চুল ঝাড়ে। খাবার ঘর শান্ত। কতক কাক কা-কা করছে।

আশাদির পায়ের শব্দ শুনতে পেল তুষার। আশাদি ঘরে এসেছে।

অগোছালো শাড়ি পরে তুষার ঘরে এল।

আশাদি বিছানায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে।

'চান হল?'

'হল।...আমার গামছাটা পেলাম না।' তুষার তার চিরুনি তুলে আগে চুল আঁচড়ে নিতে লাগল।

'পেলি না?'

'না।'

'সে কি? আশাদি অবাক। 'কোথায় গেল?'

'আমি কি করে জানব।' তুষার বলল, বলেই ছেলেমানুষের মতন গলা করে বলল, 'মাথা মুছতে পেলাম না ভাল করে. দেখেন তো কি জল থেকে গেল। সারাদিন ভিজে থাকলে এমন গন্ধ হয় মাথায়।'

'আমার গামছাটা নিলে পারতিস।'

'না, তুমি যা ফিটফাট, তোমার গামছায় মাথা মুছে রাখলে গালাগাল খাবে কে!'

আশাদি নিজেই উঠল। বাইরে রোদ থেকে গামছা এনে তুষারের মাথা মুছিয়ে দিল। বলল, 'তোর চুল যেন আরও বাড়ছে তুষার।'

'আরও খুকি হচ্ছি যে!' তুষার শব্দ করে হেসে উঠল। হেসে মুখ ফিরিয়ে আশাদিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল।

'ছাড়।' আশাদি নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। 'নিজের তো সব হয়ে গেল, আমার আজ চান হয় নি।'

তুষার আশাদির মাথার দিকে লক্ষ্য করল। 'তুমি চান করো নি।

'না। সময় করে উঠতে পারলাম না।'

'কিন্তু জল কই, যেটুকু ছিল আমি শেষ করে এলাম। তাও আবার সাবান গোলা জল।'

আশাদি গায়ের আঁচল আলগা করল। মুখে কপালে ঘাম গালে কিসের একটা আঁচড় লেগে লাল হয়ে আছ। তুষার দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গায়ে জড়ানো শাড়িটা ভাল করে পরতে লাগল।

আশাদি বলল, 'সকালে ওঁর কাছে গিয়েছিলাম। শরীর খারাপ। দেরী হয়ে গেল।'

'কি হয়েছে ওঁর?' তুষার বাড়তি আঁচল হাতে গুটিয়ে নিয়ে আশাদির দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তার মুখে উৎকণ্ঠা।

'একটু জ্বর জ্বর মতন হয়েছে।'

সাহেবদাদুর শরীর ইদানীং আর ভাল যাচ্ছে না। প্রায়ই কোন না কোন উপসর্গ লেগে থাকে। ওঁর জ্বর হয়েছে শুনে তুষার উদ্বিগ্ন হল।

বলল, 'ঠাণ্ডা—?'

'হতে পারে। জানি না ঠিক।'

ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েছে ?'

'উনি দিতে বারণ করলেন। গাড়িটাও তখন তোদের আনতে বেরিয়ে গেছে।

তুষার আঁচল গায়ে তুলল। 'জ্যোতিবাবুকে বললে না কেন, সাইকেল নিয়ে চলে যেতেন ?'

আশাদি কোন জবাব দিল না। মনে হল ভাবছে যেন কিছু। তুষার বলল, 'আমি বিকেলে দেখা করে যাব।'

আশাদি স্নানের জন্যে ঘর ছেড়ে চলে যেতে যেতে বলল, 'যাস।

শোন্, দরজার কাছেই আশাদি ঘুরে দাঁড়াল, 'আমায় উনি আদিত্যবাবুর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি কিছু বলতে পারলাম না। ওই ভদ্রলোকও কেমন। আমার ভাল লাগে না।

আশাদি চলে গেল, তুষার দাঁড়িয়ে থাকল।

পাঁচ

এখন দুপুর। বাইরে রোদ প্রখর। ভাদ্রের শেষ বলে হলকা আছে। গাছ এবং গাছের পাতায় অনেকটা তাপ যাচ্ছিল বলে গরমের আঁচ গায়ে জ্বালা ধরাচ্ছিল না। তা বর্ষা হয়ে গেছে, কালও দু-চার পশলা ছিল, কাজেই বাতাস গরম নয়। তবু ঘাম হচ্ছিল। তুষার তার বেতের মোড়ায় বসে। তার ঘরের ছেলেমেয়েগুলো এখন খুব শান্ত। হাতের লেখা করছে। হাতের লেখা শেষ হলে, তুষার ভেবে রেখেছে আজ স্বাস্থ্য পড়াবে। স্বাস্থ্য পড়ানোর একটা মোটামুটি ছক ঠিক করে রেখেছে।

হাতের লেখা লেখবার সময় বাচ্চারা যেমন এক শব্দ বা উচ্চারণ করে টেনে টেনে—সেই রকম শব্দ হচ্ছিল। বিভিন্ন মেয়ের গলায় বিভিন্ন শব্দে সেই ধ্বনি অদ্ভুত শোনাচ্ছিল।

বাইরে ঘুঘু ডাকছে। গাছের ছায়ায় বসে রোজ দুপুরে এমনি

করে ঘুঘু ডাকে এখানে। মাঝে মাঝে কোকিলও। কোকিলটা আশে পাশে কোথাও নেই, কোন ঘরের সামনে বসেছে কে জানে।

তুষার কপাল মুছে নিল। একটা হাতপাখা অবশ্য ওদিকে। কোন দরকার নেই পাখার। এখুনি জানলা দিয়ে হাওয়া বয়ে গেলে ঘর আবার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগবে। আজ বাতাস তেমন গরম নয়। বরং দূরে কোথাও বৃষ্টির জলে ঠাণ্ডা হয়ে মাঝে মাঝে এপাশে এসে লুটিয়ে পড়ছে।

বসে থাকতে থাকতে তুষার সাহেবদাদুর কথা ভাবছিল। যাবার আগে নিশ্চয় একবার দেখা করে যেতে হবে। গতবার তুষার তাঁর কাছে যেতে পারে নি। সাহেবদাদুর শরীরটা দু'বছরে যেন বড় তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ল। সেই যে টমটম করে কোথায় যেতে গিয়ে গাড়ি উলটে পড়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটালেন, তারপর থেকেই ওঁর শরীর ভাঙার দিকে। অবশ্য বয়স হয়েছে, শরীর ভাঙবে, অথর্ব হয়ে পড়বেন ক্রমশই—এটা কিছু আশ্চর্যের নয়। কিন্তু বছরখানেক আগেকার সাহেবদাদুর সঙ্গে আজকের সাহেবদাদুর তুলনা করলে মনে হবে, এক বছরে এত স্বাভাবিক নয়।

উনি নানা দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় আছেন। একটা দু'টো দুর্ভাবনার ব্যথা তুষার জানে, আশাদিও জানে। জ্যোতিবাবুও যে না জানেন মনে হয় না।

সেই সব দুর্ভাবনার একটা হল, অর্থচিন্তা। এই শিশু-তীর্থের জন্যে উনি ওঁর যথাসর্বস্ব দিয়েছেন। মোটামুটি ধনী লোক না হলে অর্থের ব্যবস্থা না থাকলে এই প্রতিষ্ঠান এতকাল কষ্টে-সৃষ্টে বসানোও সম্ভব ছিল না। এত কিছু—ঘর-বাড়ি জিনিস-পত্র—যত হীন ভাবেই হোক—উনি একার সামর্থ্যেই করেছেন। এখন ভাণ্ডার বোধহয় প্রায় শূন্য। সর্বক্ষণই দুশ্চিন্তা, কেমন করে শিশু-তীর্থ চলবে।

সাহেবদাদুর এক বন্ধু কোন মিশনারি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের হর্তাকর্তা ব্যক্তি। তুষার আশাদির কাছে শুনেছিল, সাহেবদাদু

সেই বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করে বাৎসরিক কিছু সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। তুষার ঠিক জানে না সাহায্যটা এত দিনে পাওয়া গেছে কি না। এ-ছাড়া সামান্য আর যা সাহায্য অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে আসে—সাহেবদাদুর অবর্তমানে তা পাওয়া যাবে কি-না কে জানে!

সাহেবদাদুর অন্য দুর্ভাবনা ইতি। দেখতে রোগা মতন মেয়েটা তার অবোধ মুখ নিয়ে কেমন বড় হয়ে উঠল। তুষার নিজের চোখেই গত দু'বছর ধরে ওকে দেখছে। কেমন শীর্ণ শ্যামলা ছিল, সেই মেয়ে যেন বাড়ন্ত হবার সময়ে এসে হু হু করে বেড়ে উঠছে। মেয়েদের এক আশ্চর্য ব্যাপার। ঝড় এলে যেন বানের মত আসে। পনের বছরের ইতিকে চট্ করে দেখলে কে আজ বলবে যে বছরখানেক আগেও অমন রোগা ছিপছিপে চঞ্চল মেয়ে ছিল। আজ ইতি রীতিমত তুষারের মাথায় মাথায় হয়ে উঠেছে। শ্রী বড় সুন্দর হয়ে বেড়েছে, নতুন ফোটা ফুলের মতন দেখায়। গায়ে সেই শ্যামলা রঙ যে কী উজ্জ্বল মিষ্টি হয়ে উঠেছে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ইতির সবই ভাল। মন্দ এই যে, মেয়েটা কেমন করে এই বয়সেই অনেকখানি গম্ভীর, চুপচাপ। এত শান্তশিষ্ট হওয়া ওকে – ওই বয়সের মেয়ের পক্ষে—মানায় না। মাঝে মাঝে মেয়েটাকে তুষার লক্ষ্য করে দেখেছে, বড় একা নিঃসম্পর্ক নিস্তব্দ দেখায়। যেন একটা বৈরাগ্যের ছবি।

সাহেবদাদু ইতির সম্পর্কে সব সময় দুশ্চিন্তা করেন। তিনি অবর্তমানে মেয়েটার কি হবে, এই শিশু-তীর্থ সম্বল করে সে জীবন কাটাতে পারবে? কিন্তু-তীর্থের ভবিষ্যতই যেখানে ভাল করে দেখা যায় না, সেখানে ইতিকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে করে নিশ্চিন্ত হওয়া কিংবা ভরসা পাওয়া অসম্ভব। তাছাড়া ইতির কাছে কে বলতে পারে, এই শিশু-তীর্থের মূল্য সত্যি সত্যি কতটা!

ঘুঘুর ডাকে তুষারের মনোযোগ ছিল না। জানলার বাইরে থেকে একটা হলুদ ছিটঅলা পাখি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, ফর

ফর করে উড়ে আবার অন্য জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তুষারের অন্যমনস্কতা ফিকে হয়ে এল, ঘুঘুর ডাক আবার শুনতে পেল তুষার। দু-এক দমক হাওয়া এসেছে। বাইরের ঘন রোদ যেন আলোর সব পড়ে জমে আছে।

ছেলে-মেয়েদের দিকে চোখ বুলিয়ে তুষার জানলার বাইরে তাকাল। মনে পড়ল, সাহেবদাদুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে উনি আদিত্যবাবুর কথা জিজ্ঞেস করবেন। আশাদি বলেছে। সাহেবদাদু জিজ্ঞেস করলে তুষার যে কি জবাব দেবে বুঝতে পারল না।

এত লোক থাকতে তুষারকেই বা কেন যে আদিত্যবাবুর সম্পর্কে প্রশ্ন করার যোগ্য পাত্র মনে হল এও এক অদ্ভুত ব্যাপার। খুব সম্ভব আশাদি বিদ্‌ঘুটে ব্যাপারটা তার ঘাড়ে চাপিয়ে নিস্তার পেয়েছে।

তুষার কিছু জানে না। সামন্য অসহিষ্ণু হয়ে বিরক্ত হয়েই তুষার মনে মনে বলল, আমি কিছু জানি না। আদিত্যবাবু এখানে কি করছেন, কেমন দেখছেন শিশু-তীর্থ, কি বলছেন—আমি জানতে চাই না, জানি না।

ব্যাপারটা অস্বস্তিকর বলেই তুষার তার দায় এড়াতে আদিত্য সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকতে চাইল। কিন্তু পারল না। কারণ এখানে —এই শিশু-তীর্থে তুষার ছাড়া অন্য কেউ আদিত্যর ওপর প্রসন্ন নয়। আশাদি খুবই বিরক্ত, মুখে কিছু বলে না। জ্যোতিবাবু হয়তো বিরক্ত নন, কিন্তু আদিত্য তাঁকে এড়িয়ে চলে। মলিনা আর প্রফুল্লবাবুকে আদিত্য গ্রাহ্য করে না।

ভদ্রলোক এখানে কেন এসেছে তুষার বুঝতে পারে না। অযথা সময় নষ্ট করছেন এখানে বসে। শিশু-তীর্থ তাঁকে কিছু শেখাচ্ছে না বা তিনি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর খোরাক কিছুই জোগাড় করতে পারছেন না। তবু বসে আছেন। বসে বসে নিজের এবং অন্যদের সহিষ্ণুতার মাত্রা নষ্ট করছেন।

সংসারে কত রকমের অদ্ভুত মানুষই না থাকে, আদিত্য সেই

রকম। সত্যিই মানুষটা বিচিত্র, তুষার এই রকম লোক দেখে নি। যার উচিত ছিল পুলিসের কোন চাকরি নেওয়া সে এসেছে শিশু-শিক্ষার তদারকি করতে। স্বভাবে চরিত্রে মনে এই মানুষ শিশু-রাজ্যে, শিক্ষার-রাজ্যে একেবারে বেমানান। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ বলে কথা আছে একটা—যদি প্রহ্লাদকুলে দৈত্য বা কিছু থাকত তবে আদিত্যকে সেখানে বসানো চলত। ফুলের মধ্যে মত্তহস্তী। ও কেন এল? সংসারে ওর কি অন্য জায়গা ছিল না।

আদিত্য নিজেই বলে, 'আমি মিসফিট। এসব শিশুশিক্ষা-টিক্ষায় আমার কোন ইণ্টারেস্ট নেই।'

'নেই?

'একেবারেই না।' আদিত্য বিতৃষ্ণার সঙ্গে মাথা নেড়েছিল।

'আশ্চর্য!' তুষার বলেছিল।

'আশ্চর্যের কিছু না। এইরকমই হয়ে থাকে।'

'যে যা পছন্দ করে না তাকে তাই হতে হয়?'

'হ্যাঁ। আজকাল জগৎ অন্য রকম হয়ে গেছে। যার চোর হওয়া উচিত সে সাধু হয়।

কথা শুনে তুষার হেসে ফেলেছিল। এই রকমই কথা বলে লোকটা। কি বলছে ভেবে দেখে না।

'আপনি তো শিশু-শিক্ষার বিষয় নিয়ে চর্চা করছেন শুনেছি। তুষার বোঝাবার মতন গলা করে বলেছিল একদিন।

'না, মোটেই না'

'সে কি! আমরা শুনেছিলাম—,

'শোনানোর মতন পরিচয় আমার ছিল বলে শুনেছেন। তবে সেটা মিথ্যে পরিচয়। পেটের জন্যে রাখতে হয়েছে।'

'মানে?'

'জীবিকা। আমার মাস গেলে চাইল্ড এডুকেশন সোসাইটি অ্যাণ্ড রিসার্চ সেণ্টার থেকে তিনশো টাকা মাইনে দেয়।'

তুষার বিন্দুমাত্র খুশি হয় নি কথা শুনে। একটু রূঢ় ভাবে

বলেছিল, 'তাহলে আপনি ওদের ঠকাচ্ছেন?'

'একরকম তাই। ঠকানো ছাড়া উপায় কি। আমরা সব সময় হয় নিজেকে না হয় অন্যকে ঠকাই।'

'হ্যাঁ, যদি ঠগ হই।' তুষার ক্ষুব্ধস্বরে বলেছিল।

আদিত্য গ্রাহ্য করে নি; হেসেছিল।

এই পরিচয় ওর। শিশুশিক্ষা, শিশুর মন, শিক্ষার তত্ত্ব কোন কিছুর প্রতিই আদিত্যর আকর্ষণ নেই, অথচ এই লোক, তুষার জেনেছে, এই লোকই মনস্তত্ত্বের ডিগ্রী নিয়েছে, শিশু-শিক্ষার ডিপ্লোমা পেয়েছে, সরকারী পয়সায় দেড় দু-বছর বিদেশ ঘুরে এসেছে শিশু-শিক্ষা পদ্ধতির নতুন রীতি-নীতিতে শিক্ষিত হয়ে। এখানে এসে বাঁধা চাকরি পেয়েছে, চাকরির শর্ত অনুযায়ী নানা শিশু-শিক্ষা কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে অভিজ্ঞতা ও গবেষণা করছে।

তুষারের ঘৃণা হয়েছিল। আদিত্যকে সে ঘৃণাই করেছিল তখন। লোকটা শুধু অযোগ্য নয়, প্রবঞ্চকও।

তবু এই মানুষই তুষারকে কেমন একটা সৌজন্যমূলক দুর্বলতার মধ্যে ফেলেছে। যদি সাহেবদাদু ওর কথা জিজ্ঞেস করেন তুষার কি বলতে পারবে, এখানে ওঁকে থাকতে দেওয়া নিরর্থক। শিশু-তীর্থের আদর্শ ও শান্তির পক্ষে ভদ্রলোক বিঘ্ন।

তুষার ভেবে দেখল, সে কিছু বলবে না। আদিত্যবাবুর বিপক্ষে নয় স্বপক্ষেও নয়। বিপক্ষে বলা ভাল দেখায় না, কারণ মানুষটা এখানের অতিথি, মাসখানেকের বেশি হল এসেছে, আরও হয়তো মাসখানেক থেকে চলে যাবে। ওর সঙ্গে শিশু-তীর্থের যখন কোন যোগাযোগ নেই, তখন কেন অনর্থক একজনের অপযশ গাওয়া।

আদিত্যর প্রতি তুষার করুণাই অনুভব করল। নিতান্ত চাকরির জন্যে যে লোক শিশু-কল্যাণের ব্রত নিয়েছে তার সম্পর্কে তুষারের কিছু বলার নেই। আদিত্যকে অত্যন্ত দীন এবং হীন বলে মনে হচ্ছিল তুষারের।

শানুর অঙ্ক হয়ে গেছে। শানু তুষারকে ডাকল 'দিদি—'

তুষারের চমক ভাঙল। চমক ভাঙার পরই তুষার অনুভব করতে পারল তার কপাল গলা ঘাড় ঘামে ভিজে উঠেছে।

ছয়

সেদিন বিকেলের শেষ মলিন-আলোয় তুষার অবাক হয়ে দেখল আদিত্য তার বাড়ির গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আপনি?' তুষার বাগানে জল দিয়ে ঝারি হাতে দাঁড়িয়েছিল। শুকনো মাটিতে সদ্য জল পড়ে সোঁদা গন্ধ উঠছে। পাশে কয়েকটা কলকে ফুল বাতাসে দুলছিল।

গেটের মধ্যে সাইকেল ঢুকিয়ে আদিত্য বাগানের সদরে পা দিল। 'খোঁজ নিতে এলাম' আদিত্য বলল অক্লেশে। গেটটা বন্ধ করল না।

তুষার মাটিতে ঝারি নামিয়ে রাখল। তার পরনে সাদামাটা শাড়ি, গায়ের জামাটা বাসন্তী রঙের। এখনও চুল বাঁধে নি তুষার। পিঠময় চুল ছড়িয়ে আছে।

'আসুন।' তুষার নিজেকে সামলে নিয়ে বলল। সে বুঝতে পারছিল না, 'খোঁজ নিতে এলাম' কথাটার অর্থ কি।

আদিত্য সাইকেল ঠেলে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেল। তার ভঙ্গিতে কোন আড়ষ্টতা নেই। যেন এইভাবে সে রোজই এখানে আসে।

গেটটা তুষার বন্ধ করে দিল। বিকেলের আলো আর নেই। শূন্যের রঙ ময়লা। গাছের মাথায় পাখিরা কলরব করছে। গেট বন্ধ করে ফেরার সময় শিউলি ফুলের ঈষৎ গন্ধ পেল তুষার।

সাইকেলটা একপাশে ফেলে রেখে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আদিত্য সিগারেট খাচ্ছে। এই মাত্র ধরিয়েছে। তুষার

লক্ষ্য করল, আদিত্য আজ প্যান্ট আর হাতকাটা সার্ট পরে এসেছে। এই পোশাকটা সেদিনও পরে এসেছিল আদিত্য যেদিন শহরে আচমকা দেখা হয়ে গেল তুষারের সঙ্গে। তুষার বাজারের দিকে মণিদির বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিল—ফেরার পথে আদিত্যকে 'বান্ধব চা কেবিনে'র পাশে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। তুষার একটু অবাক হয়েছিল। পরিচিত লোককে পথে দেখলে মানুষ হন হন করে চলে যেতে পারে না। তুষারও পারে নি। আদিত্য সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল।

আদিত্য তার শহরে আসার কৈফিয়ত দিতে চায় নি। কিন্তু কথায় কথায় বলেছিল, কিছু জিনিসপত্র কিনতে সে শহরে এসেছে। তুষার পথে-ঘাটে বাজারে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, আর এই সদর বাজারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা তার স্বভাবের বাইরে। তুষার হাঁটতে আদিত্যও পাশে পাশে আসতে লাগল। কথা বলছিল অনর্গল। তুষার একান্ত সৌজন্যবশেই সেদিন ওকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসেছিল। আমন্ত্রণ না জানালে ব্যাপারটা খুবই দৃষ্টিকটু হত।

আজ আবার আদিত্য এসেছে। নিজেই।

তুষার সিঁড়ির কাছে আসতে আসতে গায়ের আঁচল আরও সামন্য ঘন করে জড়িয়ে নিল।

'বাজারে এসেছিলেন?' তুষার মুখ তুলে ভদ্র আলাপে বলল।

'না।' আদিত্য মাথা নাড়ল। আঙুল দিয়ে সিগারেটের মুখের ছাই পরিষ্কার করল। এক বিন্দু রক্তের মতন আগুনের টিপ জ্বলতে লাগল।

সিঁড়িতে পা দিল তুষার। দু'ধাপ উঠে কি ভেবে একটু দাঁড়াল, সাইকেলটা দেখল। 'জ্যোতিবাবুর সাইকেল?' কথাটা এমন স্বরে বলল তুষার যেন মনে হয়, পরের সাইকেল আরও একটু যত্ন করে রাখতে হয়।

আদিত্য বোধহয় কথাটা শুনল না। শুনলেও কিছু বুঝল না।

বলল, আপনি গাছে জল দেন ?'

প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে না পেরে তুষার তাকাল চোখ তুলে।

আদিত্যর মুখে হাসি, হাসিটা পরিহাসের না উপহাসের বোঝা মুশকিল।

তুষার ভাবল এক মুহূর্ত। বলল, ছুটির দিন ছাড়া বড় একটা সময় হয় না। এই ছুদিন সামান্য যত্ন করি।'

'এবার একটা তপোবন করে ফেলুন।' আদিত্য উপহাসের হাসি হাসল।

তুষার কিছু বুঝল না, অথচ আড়ষ্ট বোধ করল হাসির শব্দে।

'বৃক্ষলতা, হরিণ শাবক···, আপনি তো প্রায় শকুন্তলা হয়ে উঠেছেন।' আদিত্য হাসছিল, হাসতে হাসতে সিগারেটটা ছুড়ে দিল বাগানে।

তুষার বুঝল। বুঝে কেমন লজ্জা পেল। বলল, 'হরিণ কোথায় দেখলেন ?'

'দেখি নি। কিন্তু চতুষ্পদ জন্তু ছাড়াও ত জন্তু আছে, তাদেরও শাবক থাকে। আপনার দ্বিপদ শাবক ত কয়েক গণ্ডা।'

তুষার রাগ করল না। আদিত্য কথা বলার ধরন সে জানে। এমন নয়, সব কথা আদিত্য বুঝে বলে, বিবেচনা করে বলে। ঠোঁটের গোড়ায় কথাকে ও-মানুষটা লাগাম পরাতে পারে না।

'আপনি গাছপালাও পছন্দ করেন না ?' তুষার স্নিগ্ধ স্বরে বলল।

'না।'

'ওরা ত জন্তু নয়।' তুষার জন্তু শব্দটার ওপর জোর দিল। আদিত্য শিশু-তীর্থের ছেলেমেয়েদের জন্তু বলে গণ্য করে।

'জন্তুর সমান।' আদিত্য জবাব দিল।

তুষার বারান্দায় উঠে এসেছিল। এক পাশে বেতের একটা চেয়ার সব সময় পড়ে থাকে বারান্দায়। আজ চেয়ারটা ছিল না। মেরামত করার জন্যে শিশির পাঠিয়ে দিয়েছে। ইতস্তত করে তুষার

বলল, 'বসার কিছু এনে দিই, আপনি বসুন।'

আদিত্য বাধা দিল সঙ্গে সঙ্গে। 'বসার কিছু দরকার নেই আমার। আমি বেশ দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়াতে আমার কষ্ট হয় না।'

তুষার কান দিল না কথায়। ভেতরে চলে গেল চেয়ার আনতে।

সামান্য পরেই ফিরে এল তুষার। কাঠের চেয়ার বয়ে এনে রাখল। আদিত্য পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাড় মুখ মুছছিল।

'আমি সিঁড়ির ওপর বসতে পারতাম।' আদিত্য বলল।

'সিঁড়ির ওপর বসবেন কেন ময়লায়।' চেয়ার দেখাল ইঙ্গিতে তুষার, 'বসুন।'

'আপনি ?

'আমি দাঁড়িয়ে আছি। আপনি বসুন।'

'উহুঁ—আপনিই বসুন, আমি এই সিঁড়িতে বসছি।'

'না, না—সে কি ! ছি !' তুষার বিব্রত কণ্ঠে বলল।

আদিত্য হাসল। 'পদপ্রান্তে বসাই কি ভাল না ?'

তুষার কথাটা শুনতে না শুনতেই ফুরিয়ে গেল। যেন লহমার জন্যে একটি শিখা তাকে স্পর্শ করে অদৃশ্য হল। বিমূঢ় বোধ করল তুষার। অর্থটা বুঝল কি বুঝল না স্পষ্ট করে, কেমন শিহরিত ও সঙ্কুচিত হল। নতচোখে বারান্দার অন্ধকার দেখছিল।

আদিত্য কথা বলল। 'আমায় বসতে দিয়ে আপনি দাঁড়িয়ে থাকলে আতিথ্য পালন করা হয় বটে, কিন্তু উদ্দেশ্যটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।'

'উদ্দেশ্য ?'

'হ্যাঁ। অর্থাৎ অতিথিকে বিদায় করতে চান বলেই একতরফা ব্যবস্থা।

'কই না, আমি তেমন কিছু ভাবিনি।' তুষার সবিস্ময় কুণ্ঠায় বলল।

'সব কিছু বলতে হয় না। ব্যবহার অনেক কিছু প্রকাশ করে।'

'আপনি বসুন, আমি একটু কাজ সেরে আসছি।'

'অপেক্ষা করব—?'

তুষার জবাব দিল না। পাশের দরজা দিয়ে ঘরে চলে গেল।

ঘরে এসে তুষার হাঁপ ছাড়তে পারল। এ-রকম মানুষ সে আর দেখেনি। সন্দেহ হয়, লোকটা সভ্য সমাজে মিশেছে কি না। অভদ্র···, তুষার কথাটা বলতে গিয়েও পারল না, আটকাল। কেন আটকাল? সৌজন্য জ্ঞানহীন এই অদ্ভুত মানুষটাকে আর কি বলা যায়? অসভ্য, ইতর···?

না। তুষার বিরক্ত হয়েছে বলেই একজনকে অত সহজে অভদ্র বা ইতর বলতে পারে না। তুষারের স্বভাব সে-রকম নয়। সে কখনও জোরে, রাগ করে কিংবা জ্ঞান হারিয়ে কিছু করে না, করতে পারে না। আদিত্যর কথাবার্তা আচরণে অস্বস্তি এবং সঙ্কোচ বোধ করেছিল তুষার, কিন্তু রাগ করে নি।

নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে তুষার টেবিলের বাতিটা দেশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে দিল। ঘরগুলো অন্ধকার হয়ে গেছে। বাইরে উঠোন ও দালানে সন্ধ্যা নেমে গেছে। গঙ্গাকে দেখতে পাচ্ছে না তুষার। গঙ্গা কি এখনও কুয়াতলায়?

শিশিরের ঘরে কোন সাড়া শব্দ নেই। তুষার বাইরে বারান্দায় এসে নীচু গলায় গঙ্গাকে ডাকল—'গঙ্গা—, এই গঙ্গা' দালানের ওদিকে—পিছন কুয়াতলার গঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে।

ডাক শুনে গঙ্গা তাকাল, হন হন করে এগিয়ে এল।

'বাতি জ্বালবি না?' তুষার বলল।

'জ্বালব।' গঙ্গা মাথা নাড়ল।

'আর কখন জ্বালবি? রাত হয়ে গেলে?'

গঙ্গা উঠোন বারান্দা ঘরের দিকে তাকিয়ে যেন অন্ধকার পরীক্ষা করে নিল। যেন দেখে নিল, এই অন্ধকার বাতি জ্বালার উপযুক্ত

অন্ধকার কি না। তারপর বাতি জ্বালতে চলে গেল।

শিশির অন্ধকারে শুয়ে ছিল। সে এইভাবে শুয়ে থাকে। সে বিকলাঙ্গ। পায়ের দিকটা আজও চেয়ারের পায়ার মতন সরু, বেকানো বেতের মতন বেঁকা। ছেলেবেলায় পলিও হয়েছিল। চিকিৎসা করেছিলেন বাবা সাধ্যমতন, তুবার অপারেশন করা হয়েছিল, দেড় বছর ছিল হাসপাতালে—কিছু হয় নি। ডাক্তারে বলেছিল আরও সাতবার অপারেশন করতে হবে। বাবা রাজী হন নি। প্রাণটা তবুতো আছে ছেলেটার, সেটুকুই থাক।

এই বাড়ি, সামান্য কিছু জমিজমা—সবই বাবা ছেলের মুখ চেয়ে করেছিলেন। তুষারের জন্যে তাঁর ভাবনা ছিল না। তিনি জানতেন, মেয়ে তাঁর জীবনের ঢেউয়ের তলায় ডুবে যাবে না, প্রয়োজন হলে একটা ব্যবস্থা সে করে নিতে পারবে। কিন্তু শিশির…?

শিশিরের কথা ভেবেই যা কিছু ব্যবস্থা, কিন্তু তুষার সেই ব্যবস্থার শরিক ত নিশ্চয়, এমন কি এর দায়-দাযিত্বও তুষারের ঘাড়ে চাপানো। তুষার না থাকলে বাবা বোধহয় পাগল হয়ে যেতেন।

ভাইয়ের ঘরে ঢুকে তুষার অন্ধকারে বিছানার দিকে তাকাল। জানালার কাছে বিছানা। বালিশ সাজিয়ে শিশির নিত্য দিনের মতন বসে আছে।

'শিশির—'

'উঁ—'

'সন্ধ্যে হয়ে গেল রে। দাঁড়া বাতি জ্বালি।' তুষার অন্ধকারে ঘরের মধ্যে দেশলাই খুঁজতে লাগল।

'কে এল রে দিদি, তখন ?

'সেই ভদ্রলোক।' তুষার কেন যেন বিব্রত বোধ করল সামান্য।

শিশির সাইকেলের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। এখান থেকে তাকালে বাইরের বাগান রাস্তা দেখা যায় বটে, কিন্তু গেটের দিকটা ঠিক মতন চোখে পড়ে না। সাইকেলের শব্দে শিশির গেটের

দিকে তাকিয়ে আগন্তুককে দেখতে পায় নি। গঙ্গা বাতি ঝুলিয়ে আসতেই তুষারের খেয়াল হল, সে বোকার মতন দেশলাই খুঁজছিল। এ-ঘরের বাতিটা পরিষ্কার করার জন্যে গঙ্গা বিকেলেই বাইরে নিয়ে গিয়েছিল।

তুষার বাতি নিল গঙ্গার হাত থেকে। 'সব ঘরে বাতি দিয়েছিস ?'

মাথা নাড়ল গঙ্গা, দিয়েছে।

'একটু জল ছিটিয়ে দে লক্ষ্মী, চৌকাটে। তুষার বলল, বলেই আবার যোগ করল, 'তোর উনুন ধরিয়েছিস ?'

'চূলায় অনেক আগ।' গঙ্গা জবাব দিল। গঙ্গা হিন্দুস্থানী কি —এদেশের লোক, অনেক কাল এ-বাড়িতে কাজ করছে, বাঙলা বলে হিন্দী মিশিয়ে মিশিয়ে।

মুহূর্তের জন্যে ভাবল তুষার। আদিত্যকে চা দিতে হয় আতিথ্য। চায়ের সঙ্গে আর কি দেবে ? কুচো নিমকি না পাঁপর-ভাজা ? ডিম ভেজে দিলে কেমন হয় ? ঘরে অন্য কিছু আছে বলে মনে হল না।

'ডিম আছে রে ?' তুষার শুধলো গঙ্গাকে।

আছে। গঙ্গা মাথা দুলিয়ে জানাল, আছে। তুষার চায়ের জল চড়াতে বলল। 'তুই বাইরে একটা বাতি দিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দে, আমি আসছি।'

গঙ্গা চলে গেল। তুষার ভাইয়ের দিকে তাকাল।

সদ্য আলো পেয়ে অন্ধকার ঝাপসা ঘরটা অনেকখানি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। শিশিরের বিছানার পায়ের দিকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শিশিরকেও দেখা যাচ্ছিল। তুষার ভাইয়ের বিছানায় কাছে সরে এল। শিশিরের মুখ চোখ—বিশেষ করে চোখ দুটি বড় সুন্দর দেখতে। ভাই-বোনের মুখের আদলে মিল আছে। তবে তুষার আরও ফরসা, আরও লাবণ্যময়। শিশিরের চোখ তুষারের চেয়ে সুন্দর। কেন সুন্দর বলা মুশকিল। হয়ত ঘন কালির মতন

কালো পুরু জোড়া ভুরুর জন্যে চোখ দুটি অমন সুন্দর দেখায়। হয়ত শিশিরের চোখের দৃষ্টিতে যে অসহায় বেদনা মেঘলার মতন মাখানো—তার জন্যেই করুনাবশত ওর চোখ অনেক সুন্দর মনে হয়।

'আজ একটুও বাইরে বসলি না রে? তুষার ভাইয়ের বিছানার পাশ ঘেঁষে এসে বসল।

শিশির কোন জবাব দিল না কথার। বালিশের পাশে একটা বই উপুড় করা ছিল। শিশির বইটা মুড়ে রাখল। 'আমাকেও আর এক পেয়ালা চা দিস, দিদি।'

'দেব। আর কি খাবি?

'কিছু করবি তুই?'

'যা খেতে চাস বল, করব।'

'কর যা হয় একটা। শিশির হাই তুলল। 'ভদ্রলোককে বাইরে বসিয়ে রেখে তুই দিব্যি ঘরে ঢুকে পড়লি।' শিশির কৌতুকের মুখে হাসল।

তুষার গলার হারের আংটাটা নখ দিয়ে টিপছিল। চোখ খুলে তাকাল। বলল, 'কি বিপদে পড়লাম দেখ ত। এখনও আমার চুলটা পর্যন্ত বাঁধা হয় নি, সন্ধ্যে উতরে গেল। বাইরে লোক এসে বসে!'

'তুই রাত বারোটায় যদি চুল বাঁধিস, লোকের কি দোষ!'

তুষার পিঠের পাশ থেকে এলো চুল মুঠো করে সামনে টেনে নিল। 'আজ একটা নাগাদ মাথা ঘষেছি, চুলই শুকোয় না।'

'নিয়ে আয় তোর ফিতে চিরুনি—আমি বেঁধে দিচ্ছে।' শিশির হাসিমুখে বলল।

'থাক।' তুষার ডান হাত তুলে ক্ষান্ত করার ভঙ্গি করল।

'থাক্ কেন, দে, আমি বেঁধে দি।'

মাথা নাড়ল তুষার। না। 'তুই এখনও গোড়া বাঁধতে পারিস না। এমন শক্ত করে দিস যে মাথা ধরে যায়।'

তুষার কথা বলতে বলতে ঘরের ডান দিকের পরদা সরিয়ে নিজের

ঘরের চলে গেল। পাশের ঘরে পায়ের শব্দ শোনা যেতে লাগল।

শিশির দিদির চলা-ফেরার শব্দ শুনছিল। যে মাঝে মাঝে দিদির চুল বেঁধে দেয়। এই তাদের ভাইবোনের এক অদ্ভুত প্রীতি সান্নিধ্য। কেমন করে যেন ছেলেবেলা থেকেই শিশিরের দিদির চুলের ওপর ঝোঁক। ছেলেবেলায় এই চুল সে দু হাতে মুঠো করে ধরে ছিঁড়ত, বয়স বাড়লে পছন্দটা কেমন পালটে গেল। এ সময় যা রাগ করে ছিঁড়ত, পরে তা ভালোবেসে বেঁধে দেয়। তুষারের কাছ থেকে কত কষ্ট করে তবে এই চুল বাঁধা শিখতে হয়েছে।

তুষার নিজের ঘর থেকে চিরুনি আর কাঁটা নিয়ে এসেছে। ভাইয়ের বিছানায় বসল বলল, 'আজ আর চুল বাঁধব না, এলো খোঁপা করে জড়িয়ে নি।' বলে দ্রুত হাতে চুল আঁচড়াতে লাগল।

শিশির দিদিকে দেখছিল। কেরোসিনের আলোয় দিদির কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। কি ভাবছে দিদি? বাইরে লোক বসিয়ে রেখে এসেছে বলে অস্বস্তি বোধ করছে?

'দিদি, ভদ্রলোককে তুই ঘরে এনে বসাতে পারতিস।'

'ঘরে এনে—?'

'বাইরে একা বসে থেকে চলে না যায়।'

'তাই বলে ঘরে এনে বসাব। যাঃ।'

শিশির বুঝল না 'যাঃ' কেন। তার বন্ধুরা সকাল বিকেল কি তার ঘরে এসে বসে না? অন্য লোকজন এলেও তো কত সময় ঘরে এসে বসে। বাইরে চুপচাপ একটা লোককে বসিয়ে রাখার চেয়ে ঘরে এনে বসালে ভাল দেখায় বইকি।

'তোর যে কি জ্ঞানবুদ্ধি বাড়ছে, দিদি—কে জানে।' শিশির অভিভাবকের গলায় বলল।

'থাম।' তুষার হাসিমুখে ভাইকে ধমকে দিল, 'আমার বুদ্ধি বাড়ছে না, বাড়ছে তোর। তাও যদি না চার বছরের ছোট হতিস।'

শিশির হাত তুলে হতাশার ভঙ্গি করল। এবং খুব গম্ভীর গলায় বলল, 'দিন দিন তোর হিসেব বেড়েই যাচ্ছে। আগে বলতিস

আড়াই তিন বছরের বড়, তারপর সাড়ে তিন বলতে লাগলি, এখন চারে দাঁড়িয়েছে।...যেন তোর বয়সটা এগিয়ে যাচ্ছে, আমারটা পিছিয়ে যাচ্ছে।'

তুষার প্রায় চঞ্চল হাঁসের মতন হঠাৎ হাসির দমকে ভাইয়ের কোলের কাছে বালিশে ঝাঁপিয়ে এসে লুটিয়ে পড়ল। খিল খিল হাসি তুষারের নরম চিকণ গলায় তরঙ্গ তুলে ঘরের আবহাওয়াকে কেমন অবিচ্ছিন্ন গাঢ় সুখী ও তৃপ্ত করে তুলল।

শিশিরও হাসছিল।

আদিত্য বাইরে ছটফট করছিল। ধৈর্য ধরে জগন্নাথের মতন এক জায়গায় বসে থাকা তার স্বভাবে নেই। গোটাকয়েক সিগারেট টানল, বাগানে পায়চারি করল খানিক, কয়েকবার সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে যেন ভেতরে তার অধৈর্যের সংবাদ পাঠাল, শেষে প্রায় চিৎকার করে ডাকতেই যাচ্ছিল তুষারকে—এমন সময় ফিরে এল।

শাড়ি পালটায়নি তুষার, তেমনি ভাবেই ঘরোয়া করে পরা, জামাও বদলায়নি; চুলই যা এলো খোপা করে বেঁধে নিয়েছে। তুষারের হাতে ডিম ভাজা আর চা।

আদিত্য খুব রেগেছিল। বলল, 'চমৎকার ব্যবহার আপনার।

তুষার ডিমের প্লেট এগিয়ে দিল। 'ধরুন।'

'ফেলে দিন।' আদিত্য বুকের কাছে দুহাত গুটিয়ে নিল।

'ফেলে দেব—'তুষার চোখের পাতা কৌতুকে বড় করল আদিত্যের ছেলেমানুষি রাগ দেখে তার মজা লাগছিল। 'নিন।'

'আমি খেতে আসিনি।' আদিত্যের আত্মসম্মান আহত হয়েছে যেন সে তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে এমন এক গলা করে জবাব দিল।

তুষার অনুভব করতে পারছিল, ভদ্রতা এবং সৌজন্যের দিক থেকে তার ব্যবহার কিছুটা দৃষ্টিকটু হয়েছে। এতটা দেরী তুষার না করলেও পারত। রান্নাঘরে বসে চা খাবার করার সময় তুষারের মনে হয়েছে সে যেন একটু বাড়াবাড়ি করছে। আদিত্যরে এ-ভাবে অপেক্ষা করানো অনুচিত, ভদ্রতা বিরুদ্ধ। আদিত্য আহত হতে

পারে। অথচ তুষার কেমন জোর করে এই অনুচিত বোধকে তরল করে দেখছিল।···আদিত্যর আহত স্বরে তুষার সামান্য অনুশোচনা বোধ করল। মানুষ যেমন সাধারণ ছোটখাটো কোন অন্যায় করে ফেললে ব্যাপারটা মুছে ফেলতে চায়, তুষার সেইভাবে মালিন্য মুছে ফেলার চেষ্টা করল। সলজ্জ সঙ্কুচিত হাসিল এবং ত্রুটি স্বীকারের মুখ করে বলল, 'বা, আমি রান্নাঘরে বসে বসে করে আনলাম···। চা না দিলে আপনিই কি খুব খুশী হতেন-।'

আদিত্য তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। হাত বাড়াল- বলত 'আমি বোধহয় টাটকা তোলা পাতার চা খাচ্ছি।'

খোচাটা তুষার হাসিমুখেই সহ্য করল।

আদিত্য যে রাগ করেছিল বা অপমানিত বোধ করছিল কয়েক মুহূর্ত পরে আর তা বোঝার উপায় থাকল না। ও এমন করে খেতে লাগল যেন কত ক্ষুধার্ত, মুখের এমন ভঙ্গি করে খাচ্ছিল যে কী উপাদেয় বস্তু খাচ্ছে। তুষার আড়চোখে লক্ষ্য করছিল। হাসি পাচ্ছিল, আবার ভালোও লাগছিল।

'আপনার চা ?'

'আনি।'

'হ্যা, আনুন।' আদিত্য বলল, 'আসবার সময় এক গ্লাস জল নিয়ে আসবেন।'

তুষার চলে যাচ্ছিল। আদিত্য মনে করিয়ে দিল, 'দেখবেন আবার যেন বাতাস হয়ে যাবেন না। আমি তা হলে ঘন্টি বাজাতে শুরু করব।'

হেসে ফেলেছিল তুষার। চলে গেল।

ক্রমে রাত হয়েছে। বাইরের ঘেরা ছোট বারান্দায় একপাশে টিমটিমে লণ্ঠনটা জ্বলছে। এ আলোয় অন্ধকারকে চেনানো যায়। বাগানো শিউলি ফুলের গন্ধ এসেছে, বাতাসে আচমকা একবার সেই গন্ধ ভেসে আসছে। আদিত্য চেয়ারে বসে। তুষার বেতের মোড়ায়। চায়ের কাপ ডিমের প্লেট অন্ধকারে একপাশে পড়ে আছে

কখন থেকে। ওরা কথা বলতে বলতে এক সময় হঠাৎ দুজনেই চুপ করে গেছে কখন। অনেকক্ষণ নীরবে কেটে যাবার পর আদিত্য পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল।

'এই ভেড়ার পাল চরিয়ে আপনি কি সুখ পান আমি জানি না।' তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে আদিত্য বলল।

'সকলের সুখ এক রকম নয়।' তুষার জবাব দিল।

'হ্যাঁ—' আদিত্য সামনের দিকে তাকিয়ে যেন স্বগতোক্তির মতন বলল, 'তা ঠিক। তবে অনেকে নিজের সুখ কিসে তাও জানে না।'

ওদের কথাবার্তার ধরন থেকে বোঝা যাচ্ছিল—অনেকটা সময় কথা বলতে বলতে ওরা দুজনেই এক ধরনের আলাপী অন্তরঙ্গতা বোধ করছিল। তুষার এখন আড়ষ্ট বা সঙ্কুচিত নয়; স্বল্প পরিচয়ের বা তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার যে অস্বাচ্ছন্দ্য, আপাতত তুষারের মধ্যে সেই অস্বাচ্ছন্দ্য এত কমে গেছে যে ওকে সহজ বলেই মনে হয়। আদিত্য যেন সহজ ভাসা ভাসা কথা জগৎ থেকে ক্রমশঃ কোন আন্তরিক জগতে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে, পারছে না।

'আমি অত বুঝি না।' তুষার মন দিয়ে আদিত্যের কথা শুনছিল. মৃদু গলায় জবাব দিল, 'এই বাচ্চা-কাচ্চা আর শিশু-তীর্থ নিয়ে আমি ত বেশ সুখেই আছি।'

'দেখছি তা। আপনার সুখ অন্যের ফরমাসে গড়া।'

'মানে—!' তুষার বিস্মিত হল।

'অন্যে বলে এতে সুখ আছে, আপনিও সে-কথা বিশ্বাস করেন।

'না, আমায় কেউ বলে নি। আমি নিজেই বেছে নিয়েছি।'

'আদর্শ?'

'জানি না।'

'ডেডিকেশান।... য়ুরোপে অনেক কৃশ্চান মেয়ে এইভাবে নিজেদের সমর্পণ করে ধর্মের কাছে। যান্। আপনি জানেন?'

'শুনেছি।'

'আমাদের দেশে রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাধুরা আছে সন্ন্যাসিনীরাও।'

'ভালোই ত।'

'কে বললে ভাল?' অন্ধকারেও আদিত্যকে অসহিষ্ণু দেখাল। 'এরা নিজেদের ঠকায়। বঞ্চনা করে।'

'তা কেন। আপনি আপনার দিক থেকে ভাবছেন বলে ও রকম মনে হচ্ছে।' তুষার আস্তে আস্তে নরম গলায় বলল 'ভালো না লাগলে, সুখ-শান্তি না পেলে মানুষ কেন নিজেকে সেখানে জড়িয়ে রাখবে।'

আদিত্য সিগারেটের ফুলকি জোর করল, ধোঁয়া ছাড়ল বলল, 'মানুষের স্বভাব নিজেকে ঠকানো।'

'কেন? লাভ কি ঠকিয়ে?'

'বড় রকম লোকসানের দুঃখ থেকে সান্ত্বনা পাওয়া।' আদিত্য যেন অন্তর থেকে নিজের বিশ্বাসের কথা বলছিল। 'আপনি বাচ্চাদের মন হাতড়াতে মশগুল, যাদের বাচ্চা সেই মা-বাপের মানে মানুষের মন নিয়ে ভেবেছেন কখনো জানা উচিত, এলিমেন্টারি স্কুলের আগে এলিমেণ্টাল ম্যানের কথা জানা দরকার।'

'পরে জানাব।' তুষার অন্যমনস্ক গলায় বলল।

'কেন, পরে কেন? এখন জানতে দোষ কি?' আদিত্য যেন তুষারকে তার তর্কের বা যুক্তির নাগালে পেয়ে গেছে এমন নিঃসন্দেহ গলায় বলল, 'খুব সোজা একটা কথা ভেবে দেখুন না, যারা কোন না কোন কারণে দুঃখী, অসুখী, অতৃপ্ত, তারাই আশ্রমে থাকে, মন্ত্র নেয়, বৈরাগ্য ধরে।

তুষার কথা বলল না। তার হঠাৎ প্রতিভাদির কথা মনে হল। প্রতিভাদি বিয়ের বছরখানেকের মধ্যে বিধবা হয়েছিল। পরে কোথায় যেন দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়। তুষার ছেলেবেলায় প্রতিভাদিকে দেখেছিল, তার কথা শুনেছিল। আজ আর তার মুখ মনে পড়ে না।

'আমি যা বলছি এর মধ্যে কোনো ভেজাল নেই। আদিত্য বলল, 'বিছানা যাদের জোটে না, তারা মাতুরের ওপর শুয়ে ভাবে সাত্ত্বিক ধর্ম পালন করলাম।'

ভাল লাগছিল না তুষারের। আদিত্যর কথায় সে চঞ্চলতা বা দুর্বলতা অনুভব করছিল এমন নয়, কিন্তু এই আলোচনা তার খুব পছন্দ হচ্ছিল না। আদিত্য কেন যে ভাবছে, তুষার সুখী নয়-- তাও তুষার বুঝতে পারছিল না। আর সে সুখী কিনা সেটা তার নিজের ব্যাপার, অন্য লোক এসে এটা বুঝিয়ে দেবে কেন! না, আদিত্যর এই মাথা গলানো কি জবরদস্তির জন্যে সে ঠিক রাগ করতেও পারে না। রাগের মতন কথা তো হচ্ছে না।

'যার যা ভাল লাগে তাই করাই ভাল।' তুষার ছোট করে তার সাধারণ মতামত বলল। যেন এ-সব কথা এখানেই শেষ করে দিতে চাইল।

আদিত্য থামল না। তাকে কথায় পেয়েছে, সে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত। বলল, 'যার যা ভাল লাগে সে যদি তাই করতে পারবে তবে জগৎটা স্বর্গ হয়ে যেত। আমার রাস্তা পূর্ব দিকে, সংসার আমাকে পশ্চিমের পথে ঠেলে দিল। এই সংসারের এটাই মজা।'

'আপনার পক্ষে অবশ্য তাই। তুষার আলগা ভাবে বলল বলার সময় তার ওই কথাটা মনে হচ্ছিল, এর পথ ছিল অন্য কোথাও, জোর করে শিশু-শিক্ষার রাজ্যে ঢুকে পড়েছে।

'আমার বেলায় কেন, সকলের বেলাতেই। আদিত্য বলল 'আমি প্রকাশ করি—ঠকতে চাই না, সান্ত্বনাও পেতে চাই না। তবে সব লোক আমার মতন নয়। আমার বাবার মতন লোক আছে।'

বাবার কথায় তুষার তাকাল আদিত্যর দিকে। আদিত্যর রং ঠিক ময়লা নয়, আধ-ফরসা। বেশ লম্বা শক্ত চেহারা। মুখ পুরু চোখ নাক শক্ত। মাথার চুল কোঁকড়ানো। সুপুরুষ চেহারা

হলেও আদিত্যর চোখের দৃষ্টিতে গালের ভাঁজে কেমন একটা চাঞ্চল্য এবং অস্থিরতার ভাব আছে যাতে ওকে এখনও নাবালক মনে হয়। তুষার মৃদু আলো এবং অধিক অন্ধকারে আদিত্যের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর অসহিষ্ণুতা অনুভব করতে পারল। 'আপনার বাবা—'

'জোচ্চোর ছিল।' আদিত্য অক্লেশে বলল। শুধু বলল না, মনে হল যেন রাগে ক্ষোভে ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার করে উঠল!

চমকে উঠে তুষার অপলক চেয়ে থাকল।

'আমার বাবা বড় রকমের জালিয়াৎ ছিল। ব্যাঙ্কে চাকরি করত। নানা জোচ্চুরি জালিয়াতি করে জেলে গেল হাজত খাটতে। মা আমায় নিয়ে মামার বাড়িতে এসে উঠল। একটা লোক--বাবার কোন বন্ধু—এ লোফার—আমাদের টাকাপয়সা দিতে আসত মাঝে মাঝে, বলত বাবা গচ্ছিত রেখে গেছে। একদিন সেই লোফারকে মামা গালাগাল দিল, মাকে ধমকাল। কিছুদিন পরে মা আফিং খেয়ে মারা গেল। আমি তখন তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলে। আন্দাজ করতে পেরেছিলাম কিছুটা। মা অযথা অকারণে আত্মহত্যা করেছিল। সত্যি সত্যিই বাবা চোরাই টাকা কিছু তার বন্ধুর কাছে গচ্ছিত রেখেছিল, লোকটা আমাদের সেই টাকা দিতে আসত, কিন্তু চেহারাটা ছিল লোফারদের মতন। আমার হাতে টাকা দিলে গণ্ডগোলটা হত না।' আদিত্য যেন এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে হাঁফ ছাড়ল। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার বলল, 'জেল থেকে ফিরে এসে আমার বাবা মা-র দুঃখে হাউ-মাউ করে কাঁদল। তারপর দেড় বিঘে বেনামী কলকাতার জমি বেচে টাকাটা আশ্রমে দিয়ে সাধু হয়ে গেল। সাধুরাও মরে, আমার বাবা বছর খানেকের মধ্যে পরপারে চলে গেল। আমি যেমন ভিখিরী তেমনি ভিখিরী থেকে গেলাম! আমার বাবা স্বভাবে ছিল জোচ্চোর, হঠাৎ যে কেন সাধু হতে গেল বুঝলাম না। আমার মা ছিল অভিমানী অহংকারী, মা অভিমান করে মরল।'

তুষার আড়ষ্ট। নিশ্বাসের শব্দ করতেও তার কুণ্ঠা হচ্ছিল। আদিত্যের বাবার চেহারা অন্ধকারে পশুর মত ছায়া নিয়ে কল্পনায় দেখা দিল. মা-র মূর্তি পাথরের মতন শক্ত হয়ে বাবার পাশে দুলছিল। তুষার ঠোঁট খুলে মুখে নিশ্বাস নিচ্ছিল, বুক ধক ধক করছিল।

নীরব। সমস্ত নীরব। ঘরে শব্দ নেই, বাইরেও না। তুষার ঘামছে। আদিত্য হঠাৎ চেয়ারের হাতলে ঘুঁসি মেরে বিড় বিড় করে কি বলল, বলে উঠে দাঁড়াল।

তুষার সচেতন হল। আদিত্য সিঁড়ি দিয়ে দুধাপ নেমেছে। সাইকেলটা উঠিয়ে নেবে। তুষার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'আপনার আলো আছে ত?' তুষার শুধলো।

'না।' আদিত্য তাচ্ছিল্যের গলায় বলল।

'সে কি! এতটা রাস্তা অন্ধকারে যাবেন কি করে?' তুষার উদ্বিগ্ন। 'দাঁড়ান, আমাদের টর্চটা এনে দি।'

তুষার টর্চ আনতে ঘরে গেল তাড়াতাড়ি।

টর্চ খুঁজে ফিরে আসার সময়ই তুষার আদিত্যের গলা পেল। বেল বাজিয়ে গেট খুলে রাস্তায় সাইকেলে উঠতে উঠতে আদিত্য তার মোটা গলায় কি বলল। তুষার বারান্দায়। প্রায় পলকেই অন্ধকারে আদিত্য উধাও। খানিক দূরে থেকে তার ভারী গলার ক্ষিপ্ত গান শোনা গেল।

তুষার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

সেদিন আরও ঘণ্টাখানেক পরে পাতলা একটু চাঁদ উঠেছিল।

সাত

আদিত্যের চরিত্র তুষার ক্রমে ক্রমে বুঝে ফেলেছিল। যাদের একগুঁয়েমি, জেদ, নির্লজ্জতা দেখলে ভাবনা হবার কথা, আদিত্য তেমন নয়। তুষার যত তার সংস্পর্শে আসতে লাগল, ততই বুঝতে পারল আদিত্যের চরিত্রে দুটি জিনিস প্রবল, উচ্ছ্বাস আর উষ্মা। নিজেকে সংযত শালীন করতে আদিত্য শেখে নি; আদিত্যের উচ্ছ্বাস বালকের মতন, সহজে সে উত্তেজিত হয়,—অকারণে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বুদ্ধি আছে আদিত্যের, কিন্তু সেই বুদ্ধি নিজের জন্যে খরচা করা তার স্বভাব নয়। ভীষণ আবেগ তার, আবেগই তাকে যেন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

শিশু-তীর্থের কয়েকটা ঘটনা পর পর এমন ঘটতে লাগল যার ফলে আদিত্যের চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বাড়িতেও মাঝে মাঝে হানা দিচ্ছিল আদিত্য। এর মধ্যে শিশু-তীর্থের গুটি দুয়েক এবং বাড়ির একটা ঘটনা তুষার কিছুতেই ভুলতে পারবে না।

শিশু-তীর্থে একদিন ছুটির বেলায় এক কাণ্ড হয়ে গেল। বাবলু আর কমল কাঠ চাঁপার গাছ বেয়ে উঠে নীচের ডালে বসে বসে পা দোলাচ্ছিল। কমল একটু দুষ্টু গোছের ছেলে, নানান ফন্দি তার মাথায়। বাবলুর সঙ্গে খুনসুটি করে ঝগড়া বাঁধিয়ে তাকে ঠেলে ফেলে দিল ডাল থেকে। বাবলু পড়ে গেল নীচে—মুখ থুবড়ে, কমল নির্বিকার বসে থাকল।··তখন ছুটির বেলা, ছেলেমেয়েরা চারপাশে ছুটোছুটি করছে, তুষাররা যে যার নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। হঠাৎ দেখা গেল কোন আড়াল থেকে আদিত্য বেরিয়ে এসে দ্রুত পায়ে বাবলুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাবলু উঠে বসেছে ততক্ষণে কিন্তু কাঁদছে। তুষার আর আশাদি এগিয়ে যাচ্ছিল, জ্যোতিবাবুও আসছিলেন—তার আগেই আদিত্য পকেট থেকে রুমাল বের করে

বাবলুর ডান হাতের কব্জির ওপরটা জোর করে বেঁধে ফেলেছে।

জ্যোতিবাবু পাশে, তুষারের কয়েক পা দূরে। আদিত্য জ্যোতিবাবুকে বলল, 'একে আস্তে করে তুলে নিয়ে যান, হাতটা সামলে ধরবেন। হাত ভেঙেছে।'

হাত ভেঙেছে! জ্যোতিবাবু তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বসে বাবলুকে ধরলেন।

আদিত্য চোখ তুলে গাছের ডালের দিকে তাকাল। কমল বসে আছে। ছেলেটা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কি যেন হল আদিত্যের— কাঠ চাঁপার একটা পলকা ডালে পট করে ভেঙে ফেলল, তারপর প্রায় এক হেঁচকা টানে কমলকে নীচের ডাল থেকে মাটিতে টেনে নামিয়ে পাগলের মতন কয়েক ঘা পিটিয়ে দিল। আরও মারত তুষাররা হতচকিত হয়ে গিয়েছিল, জ্যোতিবাবুই চিৎকার করে কি যেন বললেন। ততক্ষণে আশাদির সম্বিৎ ফিরেছে। তুষারও যেন বোধ ফিরে পেয়েছে। ওরা বাধা দিলে ছুটে এসে আদিত্যের হাতের পলকা ডাল ভেঙে গিয়েছিল। তার চোখ নিষ্ঠুর পশুর মতন, মুখ কেমন রাগে নীলচে হয়ে গেছে, যেন শরীরের সমস্ত রক্ত মুখে এসে জমে গেছে।

তখনকার মতন সব শান্ত হয়ে গেলেও ব্যাপারটা পরের দিন অন্য দিকে গড়াল। বিকেলে ছুটির পর সাহেবদাদুর কাছে তুষারের ডাক পড়ল। সাহেবদাদুর ঘরে তখন আশাদি, আদিত্য জানলার দিকে বিরক্তিকর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, জ্যোতিবাবু বসে ছিলেন এক-পাশে, হাতে একটা চিঠি।

তুষার ঘরে ঢুকে দাঁড়াল। সাহেবদাদু শান্ত ভাবে তাঁর ইজি-চেয়ারের গা হেলিয়ে বসে।

গতকালের কথাটা উঠল। কমলের বাবা চিঠি দিয়েছে সাহেবদাদুকে। জ্যোতিবাবুর হাতে সেই চিঠি।

সাহেবদাদু বললেন, 'কাজটা কি অন্যায় হয় নি?'

'না।' আদিত্য মাথা নাড়ল।

আশাদি জ্যোতিবাবু এবং তুষার তিনজনেই আদিত্যের দিকে তাকাল।

সাহেবদাতু বললেন শান্ত গলায়, 'এখানে কারও গায়ে হাত তোলা হয় না। মার-ধোর খেয়ে যদি ছোট ছেলেরা ভালমন্দ শিখতে পারত তবে আমরা এখানে হাজত তৈরি করতাম, মাস্টারের বদলে কনেস্টবল রাখতাম।'

আদিত্য শুনল কথাগুলো। সকলকে এক পলক দেখে নিল তাকিয়ে। বলল, 'উত্তর চান, না কৈফিয়ত শুনতে চান?' আদিত্য ইংরেজীতেই বলেছিল কথাটা।

'না, উত্তর।' সাহেবদাতু সৌজন্য এবং ভদ্রতা রেখে বললেন, বাংলাতেই।

আদিত্য সাহেবদাতুর দিকে চেয়ে থাকল সামান্য, তারপর জবাব দিল। কিছু কিছু ছেলেমেয়ে আছে তারা অন্যদের—নিরীহদের ওপর অত্যাচার করে আনন্দ পায়। যে ছেলেটা কাল গাছ থেকে আর একটাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল সে ওই রকম। আমি নিজে দেখেছি, সে ধাক্কা মেরে বাচ্চাটাকে ফেলে দিচ্ছে।'

'কমল একটু দুষ্টু স্বভাবের।' আশাদি বললেন।

'দুষ্টু নয়, বদমাস স্বভাবের।' আদিত্য কঠিন গলায় বলল। 'আমি লক্ষ্য করে দেখেছি ও রোজ একে মারে, ওর চোখ খামচায়, অন্যের বইয়ের পাতা ছিঁড়ে দেয়—এমন কি আরও দু একটা কাজ যা করে তা শুনলে আপনাদের গা কাঁটা দেবে।'

সকলে চুপ। আবহাওয়া কেমন থমথমে।···সাহেবদাতুই কথা বললেন মৃদু গলায়, 'আপনি কি ভাবেন রাগ করে মেরে ধরে ওকে শোধরানো যাবে?

আদিত্য অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসল। হঠাৎ সে জানালা থেকে সরে এসে সাহেবদাতুর পায়ের তলায় বসে পড়ল। বলব শিশু-তীর্থের যে সব পদ্ধতি তাতেও ওই ছেলে বিন্দুমাত্র শোধরায় নি। শোধরেছে কি? এমন কি ছেলেটা দুষ্টু এই বাজে কথা বলে

আপনার এখানে ওকে আরও বদমাইশি করার প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।' বলেই আদিত্য হাত বাড়িয়ে সাহেবদাদুর হাঁটু স্পর্শ করল। 'একটা কথা আমায় আপনি বলুন, আপনি নিশ্চয় সত্যি কথাই বলবেন। ছেলেবেলায় আপনি কি বাবা মা কারও শাসন পান নি, কেউ কি আপনার গায়ে হাত তোলে নি কখনো?'

সাহেবদাদু ভীষণ অবাক হয়েছিলেন। কেমন হতভম্ব হয়ে সোজা হয়ে বসতে গেলেন। খানিক পরে বললেন, 'তা দু-চার দিন কি আর মার খাই নি। খেয়েছি।'

'বোধহয় সেই মার খেয়ে আপনি অমানুষ হয়ে যান নি। যদি দুচার ঘা মার দিলে মনে হয় শিশুহহত্যা করা হচ্ছে তবে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু, এ-সব জিনিসকে কায়দা করে শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নতি বলা বাজে কথা। শাসনের হাত তো একটা নয় অনেক। যে ছেলেমেয়েকে আপনারা মারেন না—সে যে বাড়ি গিয়ে বা-খেলা করতে গিয়ে অন্য কোথাও মারধোর খায় না—সে বলল।…তা ছাড়া—'

'কি'

'জীবনভোর অনেক বড় মার খেতে হবে এদের। এই হাতের দুচার ঘা কিছু নয়। নাথিং।'

আবার নীরবতা। কেউ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। সাহেবদাদু অবশেষে বললেন. 'আপনি যা বলছেন তার হয়ত অনেক কিছুই সত্য। কিন্তু আমাদের এখানে শাস্তি দেওয়া বারণ।'

'আমি শাস্তি দিই নি।'

'শাস্তি দেন নি?' আশাদ অস্ফুট গলায় বলল।

'না। আমি আমার শাস্তি পাবার চেষ্টা করছিলাম। আর হেট্। একটা শয়তান বদমাস স্বাস্থ্যঅলা ছেলে নিরীহ গোবেচারী একটা ছেলেকে ঠেলে ফেলে দেবে গাছের ডাল থেকে, আই হেট্ হেট্। কোন বড় মানুষ একজন কোন কাজ করলে আমি তাকে মারতাম। আই অ্যাম নট গোয়িং টু টলারেট এনি ব্রুটালিটি।

সাহেবদাদু নির্বাক। তুষাররাও। তুষারের হঠাৎ চোখ পড়ে গেল, দেখল আদিত্যর চোখে যেন জলের ঝাপসা আড়াল।

আদিত্য উঠে পড়ল আপনাদের অপছন্দ হয়ে থাকলে আমার করার কিছু নেই। আমি চলে যেতে পারি। কাল কি পরশু চলে যাব।'

আদিত্য চলে গেল ঘর ছেড়ে।

তুষাররা নীরবে বসে থাকল। ঘরের আবহাওয়া কেমন ভারী এবং বিষাদে ভরে উঠেছিল। সাহেবদাদু অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'ছেলেটি অদ্ভুত।'

আর একদিনের ঘটনা তুষার ভুলবে না। এই ঘটনা ঘটেছিল বাড়িতে।

সেদিন সন্ধ্যের মুখে আদিত্য হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির। তুষার শিশিরের সঙ্গে বসে বসে তাস খেলছিল। সময় কাটানো আর কি। তাস খেলতে খেলতে গল্প হচ্ছিল দুই ভাই বোনে।

আদিত্য এসে ডাকল। ডাকার ভঙ্গিটা বড় অদ্ভুত। মানুষ মানুষকে নাম ধরে ডাকে, কিংবা দরজায় ধাক্কা দেয়, কড়া নাড়ে— আদিত্য ও-সবের ধার দিয়ে গেল না।

বারান্দায় উঠতে উঠতে তার সেই মোটা গলায় গান ধরল: পথভোলা এক পথিক এসেছি।

হাতের তাস নিয়ে তুষার প্রায় চমকে উঠল। বুঝতে পারে নি প্রথমে, চেনা গলার স্বর কানে একটু থিতিয়ে আসতেই জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। শিশিরও অবাক। হঠাৎ কেমন আড়ষ্ট সঙ্কুচিত হয়ে হাতের তাস ফেলে দিয়ে তুষার ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল।

'কি রে দিদি?'

'সেই ভদ্রলোক। আদিত্যবাবু। কী যে বিরক্ত করে…বলতে বলতে তুষার উঠে দাঁড়াল, ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারছিল

না, বলল, 'দাঁড়া, বিদায় করে দিয়ে আসি। নয়ত ও লোক চেঁচিয়েই যাবে।'

শিশির ঠোঁট উঁচু করে ঠাট্টার হাসি হাসল। 'বেশ তো গাইছে গাইতে দে। তুই বোস।'

'বেশ গাইছে!' তুষার চোখ বড় করল।

'পুরুষমানুষের মতন! কেমন গম্ভীর গলা।'

'বাজে বকিস না।' তুষার ছটফট করে উঠল, 'গানের তুই কি বুঝিস?

'বুঝি। স-ব তুই একা বুঝবি বুঝি।...জানিস, আমি কবিতা লিখি।'

'রাখ তোর বোঝা। লোকটাকে আমি থামাব।'

'অযথা গানটা বন্ধ করে দিবি? গাক না ও, তুই বোস।'

তুষার বসবে না। শিশির বুঝবে কোথা থেকে এ-ভাবে আদিত্য এসে ওকে কি বিশ্রী লজ্জার এবং অস্বাস্তির মধ্যে ফেলেছে।

কিন্তু শিশির বোধহয় বুঝেছিল। তুষার চলে যাচ্ছে দেখে হেসে বলল, 'তাস গুটিয়ে রাখছি রে, দিদি।

তুষার বাইরে এল। আদিত্য বেপরোয়া গলায় গান গাইছে। যেন ও জানে এই পরিহাস আনন্দেরই, এতে কোন গ্লানি নেই লজ্জা নেই। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দরজার দিকে তাকিয়েই আদিত্য গান গাইছিল। তুষারকে দেখে থামল।

তুষার এক পলক দেখে নিল আদিত্যকে। 'হঠাৎ এদিকে?

'এলাম। আজ খুব ভাল লাগছিল।'

,দেখছি তাই, নয়ত আর গান হবে কেন।'

'আমি রাস্তায় আসতে আসতে ভাবলাম কোন গানটা উপযুক্ত হবে, মানে স্যুটেবল্। এইটেই মনে এল।'

'মনের খুব বাহাদুরী রয়েছে।' তুষার গম্ভীর হয়ে বলতে চাইল।

'গানটা কিন্তু খুব স্যুটেবল্ হয়েছে, বলুন ঠিক কি না।' আদিত্য আসল জোরে জোরে, 'রবীন্দ্রনাথ এই একটা কাজ করে গেছেন,

অনেক সময় মানুষ যা বলতে চায় একটু হাতড়ালেই দেখতে পাবে বুড়ো একটা গান বেঁধে গেছেন।'

তুষার কৌতুক বোধ করল। 'উনি কি জানতেন আপনার মতন লোক তাঁর গান গেয়ে গলা সাধবে।'

'মানে। হোয়াট ডু ইউ মিন? আমি বাজে গাই?'

'কে বলছে! চমৎকার গান।'

আদিত্য আবার হাসল। সিগারেট বের করতে করতে বলল, আমি গোটা পঁচিশেক গান সত্যি সত্যি জানি। এ ভেরী পুয়োর চিক ইন্‌ডিড। কিন্তু বেশ লাগে।'

তুষার কিছু বলল না। কথাটা কিন্তু খুব মিথ্যে নয়। সব বাঙ্গালী ছেলের মতন আদিত্যও কয়েকটা গান জানে। হয়ত সুর কোথাও ভুল হয়ে যায়, শব্দ শুদ্ধ হয় না, কিন্তু এখানে সেটা বড় কথা নয়। তুষারও কিছু গান জানে। হয়ত তার সুরও কোন জায়গায় ভুল, শব্দ অশুদ্ধ। আদিত্যর গলা সত্যিই গম্ভীর ভারী। মন্দ শোনায় না, তুষার যতই ঠাট্টা করুক শিশিরের কাছে।

সিগারেট ধরিয়ে আদিত্য বলল, 'কি করছিলেন?'

'ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করছিলাম।'

'ও!' আদিত্য ধোঁয়া ছেড়ে কি যেন ভাবল সামান্য। বলল, আমি আপনার ভাইয়ের কথা শুনেছি।'

তুষার তাকাল। আদিত্য অন্য দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। গানের দিকে। চাঁদের আলো বাগানে।

'তা হলে থাক। আমি চলি।' আদিত্য চাপা গলায় বলল।

তুষার বুঝতে পারল। যে দুঃখ নিশ্বাসের মতন স্বাভাবিক ভয়ে। বলে তুষার সচেতন থাকে না, সেই দুঃখকে আদিত্য চেতনা আনল। মানুষ যদি প্রতিটি নিশ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কে হঠাৎ সচেতন হতে চায়, দুমুহূর্ত পরেই কেমন অস্বস্তি বোধ করবে। তুষার যে রকম অস্বস্তি বোধ করছিল। শিশিরের কথা সে কাউকে বলছিল চায় না। পছন্দ করে না। শিশিরও নয়। ওরা ভাইবোন তাদের

দুঃখ হাটে টেনে এনে না অনুকম্পা না করুণা চায়।

নিজেকে সামলে নিতে নিতে তুষার বলল, 'যাবেন কেন, বসুন কথাটা বলে তুষার সিঁড়ির দিকে তাকাল। খেয়াল হল, আদিত্য সাইকেল আনে নি, মনে পড়ল, ও হেঁটে আসার কথা বলছিল। আলোচনা অন্য দিকে নিয়ে যাবার মতন সুযোগ পেল তুষারে 'সাইকেল কোথায়?'

'সাইকেল নিই নি, হেঁটে বেরিয়েছি।'

'হেঁটে —।' তুষার অস্ফুট বিস্ময় জানাল।

ভালো লাগছিল হাঁটতে। আজ আমার খুব ভাল লাগছে এক একটা দিন মাঝে মানুষের অসম্ভব ভালো লেগে যায় আপনার লাগে না?'

তুষার সামান্য অন্যমনস্কার চোখে আদিত্যর দিকে তাকাল। মা নাড়ল, অথচ এই জবাব—এই হ্যাঁ জানানো সে বাস্তবিক তোমার বলল না।

'রাস্তায় আসতে আসতে আমি ভাবছিলাম আজ এখানে এই আপনাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাব।' আদিত্য অকৃতি আবেগে বলল।

'বেড়াতে!' তুষার যেন খুব অবাক।

'চলুন। আমার যে কী ভালো লাগছে আজ!' আদিত্য ছেলেমানুষের মতন তার বিহ্বলতা জানাল। তুষার অনুভব করতে পারছিল, ভদ্রলোক আজ খুশীতে টলমল করছে। ওর খুশীর তাপ গলার স্বরে উপচে উঠছিল।

এখন কি আমার বেড়ানোর সময়!' তুষার নরম করে হেসে বলতে গেল।

এখন নয়ত কখন! সবে সন্ধ্যে। মস্ত বড় একটা চাঁদ রয়েছে আকাশে, পুরো শরতের বাতাস। চলুন।'

তুষার কি করে বলবে, শিশির একা বসে রয়েছে; কি করে বোঝাবে, এ-ভাবে বেড়াতে বেরুলে শিশির কি মনে করবে! তা

'না, আমি পারি না।' বাসনা হঠাৎ অন্য রকম এক সুরে বলল। অত্যন্ত ক্ষিপ্র, চিকন স্বর এবং দৃঢ়।

'কেন?' অমলেন্দু বাসনার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হচ্ছিল। ওর গলায় ফুলে-ওঠা একটি নীল শিরা এই চাঁদের আলোতেও স্পষ্ট। কাঁপছে শিরাটা। সূক্ষ্ম ক'টি রেখা কুঁচকে উঠেছে কপালে গালে।

'তুমি পার না কেন?' বাসনা অমলেন্দুর চোখে তাকিয়েছিল, পাতা পড়ছিল না। বলছিল মনে মনেঃ কেন পারি না তুমি কি জান না! না, কথাটা আমার মুখ থেকেই শুনতে চাও, অযথাই। তবে শোনো।

'বীথিকে আমি ভাল করেই চিনি।' বাসনা বলল চাপা, মৃদু গলায়; বীথির সম্পর্কে ঘৃণা ফুটে উঠছিল কথার সুরে।

'না চেনার কি আছে।' অমলেন্দু জবাব দিচ্ছিল, 'এক বাড়িতে রয়েছ দু'জনে এতদিন -!'

'তাই বলছিলাম।' অমলেন্দুর কথায় বাধা দিয়ে বাসনা খুব স্পষ্ট, ধীর গলায় বলল, গলার হারটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে, 'বীথি তোমায় অত সহজে তাকে ডিঙিয়ে যেতে দেবে না।'

'ডিঙিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।' অমলেন্দু বলল, 'আমিই বা তাকে ডিঙিয়ে যাব কেন। সে আমার পথ আটকাচ্ছে না।'

'আটকাচ্ছে না—?' বাসনা তাকিয়েছিল তেমনভাবেই।

'না। আমি কখনোই এসব ভাবি নি।' অমলেন্দু খোলাখুলি জবাব দিচ্ছিল।

বাসনা একটু চুপ। আস্তে আস্তে সামান্য দূরে সরে গেল, তাকালো আকাশের দিকে। সাদাটে নীল আকাশ। অজস্র তারা। চাঁদের গা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে একটা ছোট্ট, পাতলা, আলুথালু সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে; শিরশির করছে গা।

'এ-কথা এখন শুনলে?' বাসনা বলছিল, 'বীথির মন ভেঙে যাবে। কমলারাও কষ্ট পাবে।...তোমার উচিত ছিল মতামতটা আগেই জানিয়ে দেওয়া।'

'গায়ে পড়ে—' অমলেন্দু জবাব দিল, 'মনে মনে কমলাবউদিরা কি ভাবছে না ভাবছে তা আমায় জেনে নিয়ে গলা বাড়িয়ে বলতে হবে বীথিকে আমি বিয়ে করব না।'

এও সত্যি, বাসনা ভাবল, কমলারা মনে মনে এতদিন ধরে যা ভাবছে সেটা অদ্ভুত একবার অমলেন্দুকে সরাসরি বলা উচিত [illegible]ল।

অমলেন্দু আবার একটা সিগারেট ধরালো। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এই বাজে ব্যাপারটা আর না গড়াতে দেওয়াই ভাল! তুমি কমলা-বউদিকে আমার হয়ে, মানে আমার মনোভাবটা জানিয়ে দিয়ো।'

'বৈ কি?' বাসনা বলল, 'তারপর কমলা ভাবুক, আমাদের মধ্যে এইসব কথা হয়, এত ভাব আমাদের! আর বীথি, তোমাদের বীথি আমায় ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাক।' হাসবার চেষ্টা করছিল বাসনা।

বাসনার কথাগুলো শুনতে শুনতে অমলেন্দু আজ, এখন, এই অবস্থায় অন্য এক কথা ভাবছিল এবং মনে মনে কিছু একটা স্থির করে ফেলছিল। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে, একটু ঝুঁকে, বাসনার মুখে চোখ রেখে স্পষ্ট সহজ গলায় বলল, 'তোমার ইচ্ছেটা কি?'

'ইচ্ছে—কিসের?'

'এই তোমার-আমার সম্পর্কের, তুমি কি কমলাবউদিদের কাছ থেকে আমাদের মেলামেশা লুকিয়ে রাখতে চাও?'

বাসনা মুখ তুলে স্তব্ধ চোখে দেখছিল। অমলেন্দুর মুখ যেন বোঝা-পোড়ার জন্যে তৈরি হয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

'কি যে বলো!' বাসনা বোকার মতন কথাটা হালকা করে হাসবার চেষ্টা করল।

'তোমাকে আমি বুঝতে পারছি না।' অমলেন্দু বুঝি একটু অধৈর্য হল।

'পারছ না!' বাসনা ভাসা-ভাসা গলায় বলল। মুখ তুলে, এক পলক চেয়ে আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল। গাঢ় কালো ছায়ার মতন মাথাটা স্থির হয়ে আছে। ঘাড়ের ওপর ভেঙে-পড়া খোঁপা; মুখের এক পাশটায় আলো পড়েছে। কেমন একটু ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে

বাসনাকে। মিহি ক'টি চুল গালে নেমে এসেছে, চোখের পাতা একটু কাঁপল যেন। সেই ফিকে গন্ধটা নাকে লাগছে। নিশ্বাস যেন বুকের মধ্যে চেপে চেপে রাখছিল বাসনা। হ্যাঁ চাপছিল ; নিশ্বাস শুধু নয়, কেমন এক ভয় এবং বিহ্বলতা।

'কেন?' খানিক অপেক্ষা করে বলল আবার অমলেন্দু, 'কিছু মনে করো না, আমি সব ব্যাপারেই স্পষ্ট হতে পছন্দ করি।'

বাসনা মুখ ফেরালো। চকচক করছিল চোখ দু'টো এবং সামান্য ফ্যাকাশে মুখে একটা কাঠিন্য নামছিল এবার। ঠোঁটের আগা অল্প অল্প কাঁপছে। 'আমায় তুমি বুঝতে পারছ না। কিন্তু পারা উচিত তোমার।' কথাটা বলে একটু থামল বাসনা, যেন বুঝতে সময় দিলে অমলেন্দুকে, বলল আবার, 'তোমার, শুধু তোমার পক্ষেই সব বোঝা সম্ভব। আমি অন্তত তাই আশা করব।'

আশ্চর্য, বাসনা আর দাঁড়ালো না। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। একটু তাড়াতাড়িই যেন। আর ওর পা এত কাঁপছিল, গা টলছিল যে অমলেন্দু ভাবছিল, বাসনার বোধহয় মাথা ঘুরে গেছে, টলে পড়বে এখুনি।

সত্যিই বাসনা যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো। দুলে পড়ছিল পাশ ঝুঁকে। হাত বাড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছিল কিছু।

অমলেন্দু এসে ধরে ফেলল। বাসনার ফিট হয়েছে আবার। চোখের পাতা তখনো আধবোজা, ঘোলাটে চোখ, ছলছল করছিল। জ্বরো রুগীর মতন ঠোঁট নড়ছিল। শক্ত মুঠোয় অমলেন্দুর বুকের কাছটায় খানিকটা ধরে ফেলেছিল বাসনা। আর বিড়বিড় করে বলছিল। কী যে বলছিল, অমলেন্দু বুঝতে পারছিল না। কিন্তু মনে হচ্ছিল অমলেন্দুর, বাসনা তাকে এখন সব কথাই বুঝিয়ে দিচ্ছে।

ছাদের ওপর আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল বাসনাকে। শরীরটা আরও সাদা দেখাচ্ছিল। বাসনার চোখ বুজে গিয়েছে ততক্ষণে এবং ঠোঁট জুড়ে গেছে।

।। আট ।।

কমলাদের শেষ চিঠি এল অগ্রহায়ণের গোড়ায়। আর ক'দিন পরেই ওরা ফিরছে।

অফিসের পোশাক গায়ে চড়িয়ে সুধাময় বলছিল বাসনাকে, 'শীতের শুরুতেই চলে আসছে। আরও ক'টা দিন থেকে এলে পারত। এই সময়টাই ঠিক চেঞ্জের সময়।'

চিঠিখানা হাতে করে নীচু মুখে দাঁড়িয়েছিল বাসনা। সুধাময় বলল আবার, 'আপনি কি বলেন ছোড়দি, লিখে দেব নাকি ক'টা দিন আরও থেকে আসতে ?'

'তাই কি ওরা থাকবে ?' বাসনা বলল।

'কাকাবাবুরা তো থাকছেন আরও মাসখানেক। অসুবিধে কি !' সুধাময় পোর্টফোলিওটা হাতে তুলে নিল।

'কমলার বোধহয় ফেরার ইচ্ছে।' বাসনা চিঠিখানার দিকে চোখ রেখে বলল, 'তবু একবার লিখে দেখুন।'

বাসনা মুখে বলল কিন্তু মনে মনে চাইছিল ফিরে আসুক কমলারা। ফিরে আসুক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং বীথিও। আর দেরি সইতে পারছে না বাসনা। ধৈর্য থাকছে না আর।

তখন চাইছিলুম ওরা যাক আর এখন চাইছি ওরা আসুক—বাসনা সুধাময়ের ঘর গুছতে গুছতে ভাবছিল এবং নিজেকেই একটু যেন বিদ্রূপ করে ম্লান হাসছিল।

বিছানা ঝেড়ে-ঝুড়ে বেড্‌কভারটা নিভাঁজ করে পেতে একটু বসল বাসনা। সমস্ত বাড়িটা কী নিস্তব্ধ। কাক-চড়ুইয়ের ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। কমলার ঘরের দেওয়াল-ঘড়ির একটা শব্দ অবশ্য আছে, মৃদু একটানা মোলায়েম শব্দ। জানলা দিয়ে রোদ আসছে। কী স্বচ্ছ, উজ্জ্বল রোদ। এক মুঠো রোদ ড্রেসিং টেবিলের

কাঠের ওপর যেন টপকে গিয়ে উঠে বসেছে। বাসনা সেই রোদের দিকে চেয়ে থাকল। এবং অল্পক্ষণ পরে যখন চোখ তুলল, নিজেকে, হ্যাঁ নিজের গোটা শরীরটাকেই দেখল বাসনা আয়নার গায়ে একটা ছবির মতন নিশ্চল ফুটে রয়েছে।

নিজের চোখ, কী চুল, কী মুখ—এমন কি বুক এবং গা দেখার আর তেমন কোনো আগ্রহ নেই। তবু একটুক্ষণ দেখল বাসনা। মনে হচ্ছিল, হ্যাঁ, এবার শরীরটা বেশ শুকিয়ে আসতে শুরু করেছে। কমলা থাকলে—এই পরিবর্তনটা তার চোখে পড়ত। সুধাময় পুরুষ মানুষ। সারাদিনে কতটুকুই বা দেখে বাসনাকে। তার পক্ষে এসব বোঝা সম্ভব নয়।

ফিরে এসে কমলা প্রথমেই হয়তো জানতে চাইবে, তুমি তো ভীষণ শুকিয়ে গিয়েছ ছোড়দি, কি হয়েছে তোমার?

কি হয়েছে! বাসনা উঠে পড়ল। মনে মনে সেই দৃশ্যটা কল্পনা করল, দুই বোন যখন মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে প্রায় দেড়টা মাস পরে, আর পাশেই বীথি; হয়তো বা ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসছে।

কি হয়েছে কমলাকে বোঝাবার কি বলবার দরকার হবে না বাসনার। কেননা, সত্যিই তো বাসনাকে বোনের কিংবা বীথির মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে না, কোনোদিনই। এ বাড়িতেই বাসনা তখন আর নেই। তার আগেই চলে গেছে। ওর ঘর শূন্য, বিছানা শূন্য।

কমলা বিশ্বাস করতে চাইবে না, বিশ্বাস করতে পারবে না, ভীষণ আঘাত পাবে, হয়তো রাগে ঘৃণায় লজ্জায় মুখটা পাথরের মতন কঠিন করে ঘরে গিয়ে বসবে। বীথি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বিছানায় লুটিয়ে কাঁদবে, কুটি-কুটি করে ছিঁড়বে বাসনাকে মনে মনে।...হ্যাঁ—বাসনা মোটামুটি ভবিষ্যৎ দৃশ্য তো দেখতেই পারছে। কিন্তু কোনো উপায় নেই। একটা চিঠি অবশ্য কমলার নামে রেখে যাবে বাসনা। ইচ্ছে হলে সে-চিঠি পড়তে পারে কমলা। যদি পড়ে, তবে সমস্ত জানতে আর বুঝতে পারবে।

আমি ভালবেসে বা এই শরীরটার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বাড়ি

ছেড়ে চলে যাচ্ছি অমলেন্দুর সঙ্গে, এ-কথা সত্যি নয় কমলা। এমনও নয় যে, আমি ঘর-সংসার স্বামীর জন্যে তিলে তিলে মরছিলাম। আমার ভাগ্য, আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একটি মুহূর্ত আমি অসতর্ক হয়েছিলাম, ভুল করেছিলাম, বিশ্বাস করেছিলাম অমলেন্দুকে। সে আমার শনি। এক মুহূর্তের অসাবধানে সেই শনি আমায় গ্রাস করে ফেলেছে। এই কলঙ্ক পেটে নিয়ে আমি যদি মরতে চাইতাম হয়তো মরতে পারতাম। কিন্তু তা আমি চাই নি।

যে আমার সর্বস্ব নষ্ট করল তার সর্বনাশ আমিই বা না করব কেন। লোকটাকে আমি কী ভীষণ ঘৃণা করি, আমিই শুধু তা জানি। তবু যাচ্ছি। যেতে হচ্ছে।

বাসনা মনে মনে চিঠির খসড়াটা যেন এখুনি করে ফেলল এবং ভাবল, মোটামুটি এসব কথা লিখলেই কমলা জিনিসটা বুঝতে পারবে।

সুধাময়ের ঘর গুছিয়ে বাইরে এল বাসনা। দরজাটা বাইরে থেকে টেনে ভেজিয়ে দিল।

এরপর একবার রান্নাঘরে যাওয়া দরকার। বাসনা ভাবছিল নীচে যাবে, কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছিল না।

নিজের ঘরেই এসে বসল বাসনা। খানিকটা চুপচাপ বসে জানলা দিয়ে আকাশ, রোদ, কাক আর চড়ুই দেখল। আর যে-সব কথা মনে আসছিল, হঠাৎ যেন সব হুস করে উড়িয়ে দিয়ে আপন মনেই হাসল।

অমলেন্দুকে যা ভাবাতে চেয়েছিল ও—বোকা লোকটা তাই ভেবে নিয়েছে, বাসনা নোখ খুঁটতে খুঁটতে ভাবছিল আবার। অমলেন্দু ভেবেছে, বাসনা তাকে ভালবেসেই ঘর ছাড়ছে।

ঘর অবশ্য ছাড়ছেই বাসনা, ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু তোমায় ভালবেসে নয় বা তোমার ভালবাসা আমায় ভরে রাখবে এ আশা নিয়েও নয়। বাসনা বলছিল, অমলেন্দুকে উদ্দেশ্য করে যেন, আমি তো জানি, যদিও মুখে তুমি বললে না, ভাবখানাও দেখালে যেন বাসনাকে কতই ভালবেসে ফেলেছ, কিন্তু আসলে যা তুমি করেছ এবং

যার চারা নষ্ট করবার কোনো উপায়ই নেই, শুধু তার ভয়েই এই সাধুতা তোমার। তা ভালই করেছ। নয়তো আমাকেই মুখ ফুটে বলতে হত। সে কষ্টটুকুর হাত থেকে আমায় বাঁচালে, এই যা। ভবিষ্যতে তুমিও আকাশ থেকে পড়বে না, আমিও না। কেউ কাউকে কিছু বলব না, অথচ বুঝব। আর তখনও যদি ন্যাকামি করে কিছু বলতে আস অমলেন্দু, বাসনা পরম নিশ্চিন্তে তা উপেক্ষা করতে পারবে।

সেদিন অমলেন্দু এলে কমলাদের ফিরে আসার খবরটা দিলে বাসনা।

'তাই নাকি, কবে?' শুধলো অমলেন্দু চা খেতে খেতে।

'দিন আট-দশের মধ্যে।'

'তা ভালই হল।' অমলেন্দু বাসনার দিকে চেয়ে বেশ সহজভাবেই হেসে বলল, 'কমলাবউদিরা ফিরে না-আসা পর্যন্ত তো কাজটা হচ্ছে না আমাদের।'

'কাজ, কি কাজ?' বাসনা অবাক হচ্ছিল।

'শুভকাজ!' অমলেন্দু বোকার মতন জবাব দিয়ে হাসল।

অত্যন্ত কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছিল অমলেন্দুর সেই কালো গোল মুখের গাল-গলা ফোলানো, মুখ হাঁ-করা হাসি। বাসনার সারা গা ঘিনঘিন করে উঠল।

'মানে?' রুক্ষ স্বরে, চোখ কুঁচকে হঠাৎ প্রশ্ন করল বাসনা।

কোনো জবাব না দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল অমলেন্দু এবং এখনও হাসছিল মুচকি-মুচকি।

'মানেটা এমন কি কঠিন!' অমলেন্দু অতি তরল স্বরে বলছিল, 'কমলা বউদিরা এলেই আমাদের রেজিস্ট্রীর কাজটা সেরে নিতে পারি।'

কথাটা কানে যেতেই বাসনার সারা বুকের মধ্যে একটা কাঁপুনি দিয়ে গেল। হাত দু'টো কেমন অসাড় অসাড় লাগছিল। মুখটা শুকনো। ভুরু আর কপাল কুঁচকে উঠেছিল। অস্বস্তি বোধ করছে বাসনা, বিরক্তও হয়েছে খুব। অমলেন্দুর দিকে অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে

বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'মনে মনে এসব বুঝি ভেবে রেখেছ?'

'হ্যাঁ। মোটামুটি ঠিক করে রেখেছি।'

'আমায় তো জিগ্যেস করো নি।' বাসনা এমনভাবে বলল, এমন একটা কঠিন সুরে যার অর্থ বোঝালো, আমায় না জানিয়ে এসব ঠিক করার কোনো অধিকার তোমার নেই।

'করি নি মানে, বললুম যে সেদিন।' অমলেন্দু অবাক হচ্ছিল।

'না, সেদিনের কথা থেকে এসব বোঝায় না।' একটু থেমে, 'আমিও তো সেদিনই তোমায় বলে দিয়েছি কমলাদের কিছুই জানাতে চাই না এখন। যা জানবার ওদের, যা জানাবার পরে ওরা জানবে। আমি চলে যাওয়ার পর, আগে নয়।'

অমলেন্দু চুপ করে শুনল কথাগুলো। জবাব দিল খানিকটা পরে, 'লুকোচুরি করার কোনো দরকার ছিল না। সোজাসুজি, স্পষ্টাস্পষ্টিই কাজটা হতে পারত।'

'না, পারত না। কি তুমি সৎকাজ করছ!' কথাটা ঠোট থেকে ফস করে বেরিয়ে এল বলে ভাবল বাসনা, একটু বেশিই বলা হয়ে গেছে বোধহয়। অমলেন্দুর হয়তো ভাল লাগল না কথাটা কানে। একটু থেমে, একটু ভেবে—আগের কথার জের টেনে জিনিসটা হালকা করতে চেষ্টা করল বাসনা, 'তোমার কি, এদের সঙ্গে কতটুকু আর তোমার সম্পর্ক। কিন্তু আমার অবস্থাটা কেমন হবে ভেবে দেখেছ। কমলা শুনে পর্যন্ত মুখ ঘুরিয়ে নেবে, সুধাময় ছি-ছি করবে, বীথি বলবে— কী যে সে বলবে না-বলবে জানি না, তার পক্ষে সবই সম্ভব। আমার অত দুঃসাহস নেই। যা করবার আড়ালেই আমি করতে চাই।' বাসনা ছটফট করছিল।

অমলেন্দু ভাবছিল। বাসনার এই মামুলি লজ্জা, আড়ষ্টতা এবং ভয়-ভয় ভাবটা বেশি। সেদিনও বাসনা বলেছিল. সামনা-সামনি কিছুই সে কমলাদের জানাতে চায় না। চলে যাবার পর ওদের জানতে কিই বা আর বাকি থাকবে। তবু যা জানাবার পরে জানাবে বাসনা, চিঠিতে।

অমলেন্দুর এটা পছন্দ নয়। কিন্তু বাসনার কথা ভাবলে অবশ্য, ওর অবস্থাটা বুঝে এই লুকোচুরি না-করেই বা উপায় কি! 'এই লোকলজ্জাটা কাটাতে পারলেই কিন্তু ভাল হত।' বলল অমলেন্দু, 'অসৎ কাজই বা তুমি কি করছ!' একটু থেমে আবার, 'সুধাদাকে আমি চিনি। সোজাসুজি ব্যাপারটা বললে আর যাই হোক তার মনটাও খুঁতখুঁত করত না।'

জবাব দিল না বাসনা। ভাবছিল, লোকলজ্জা কাটাতে বলার উপদেশটা অমলেন্দুর মতন লোকের পক্ষে দেওয়াই সম্ভব যার সঙ্কোচ-লজ্জার বালাই নেই। মনে মনে বলছিল বাসনা অমলেন্দুকে, তোমার মুখেই এসব কথা শোভা পায়, তোমার মতন চরিত্রের লোকের মুখে।

লোকলজ্জা আমার আছে, থাকবে। নাচতে নেমেছি বলেই যে আমার আলগা গায়ে থাকতে হবে, তার কি মানে আছে! আমার রুচিতে এবং ইচ্ছেয় এসব বাধে। তাছাড়া, তুমি আর কতটুকু বুঝবে —যারা আমার এত বিশ্বাস করত, শ্রদ্ধা করত, যারা জানত, সিঁথির সিঁদুর মুছলেও আমার মধ্যে কোনো গ্লানি কি হতাশা দুঃখ ছিল না, তাদের চোখের সামনে হঠাৎ এক পর-পুরুষের হাত ধরে ঘর ছাড়বার তেজ দেখালে কেউ আমায় বাহবা দেবে না। চোখের সামনে সেই কেলেঙ্কারি হওয়ার চেয়ে আড়ালে হওয়াই ভাল। না আমি, না ওরা কেউ কারুর কথা শুনতে যাচ্ছি; ঘেন্না, জ্বালা, দুঃখ, কান্নাকাটি দেখতে পাচ্ছি।

শেষ পর্যন্ত অমলেন্দু বলল, 'বেশ, তুমি যখন চাইছ তাই হবে। কিন্তু কমলাবউদিরা আসার আগে তোমার যাওয়া হচ্ছে কই!'

বাসনাও ভাবল একটু। জবাব দিল, 'কমলারা আসার দিনই যদি চলে যেতে পারতুম! ওর কাছে আমি সব সময় এখন ভয়ে ভয়ে থাকব।'

'ক'টা দিন থাকতেই হবে, উপায় নেই।' অমলেন্দু একটু হেসে বাসনার হাতটা টেনে নিল।

'তাও থাকতে হয় না যদি ব্যবস্থা করো।' অমলেন্দুর মাথার

কাছে ঘন হয়ে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল বাসনা। তারপর সামান্য পাশে হেলে পড়ে, চেয়ারে-বসা অমলেন্দুর মাথা-মুখের সঙ্গে ওর বুক ছুঁইয়ে, অমলেন্দুর চুলে আঙুল দিয়ে ইলিবিলি কাটতে লাগল। কখন মুখটা নীচুও করল খানিক, প্রায় কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তুমি কিছু মনে করলে না তো!'

অমলেন্দু মাথাটা আরও যেন হেলিয়ে দিয়ে হাসল, 'না, মনে করব কেন!'

অমলেন্দু চলে গেলে বাসনা চিঠি লিখতে বসল কমলাকে। দু'চারটে এ-কথা সে-কথার পর লিখল ; সুধাময়ের ইচ্ছে তোরা আর ক'দিন থেকে আসিস। এখন নাকি শীত পড়ছে ওখানে, সময়টা খুব ভাল। আমিও ভেবে দেখলাম, আরও দিন আট-দশ অনায়াসেই তোরা থেকে আসতে পারিস। অমলেন্দুও সেদিন আমাদের কাছে বলছিল দিন সাতেকের জন্যে একবার ওখানে বেড়াতে যাবে। ওর যেতে অবশ্য দিন সাতেক দেরি হবে। তোরা যদি তখন চলে আসিস—অমলেন্দু যাবে না। যদি না আসিস, হপ্তাখানেক তোদের সঙ্গে থেকে এক সঙ্গে সব ফিরতে পারবি। আমার মনে হয় তাই ভাল। ফেরার সঙ্গী পাবি, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে অসুবিধে হবে না। কি করবি জানাস।

চিঠিটা খামের মুড়ে, কলম রেখে একটু চুপচাপ বসল বাসনা। গালে হাত দিয়ে ভাবল, আজ মঙ্গলবার—আগামী বুধবার আর একটা চিঠি লিখতে হবে কমলাকে ঃ অমলেন্দুর যাওয়া বোধহয় হলো না। তোরা আগামি সপ্তাহেই ফিরিস। আমার শরীরটা ভালো নেই।

কমলারা আসার আগেই রেজিস্ট্রীর কাজটা সেরে রাখতে চায় বাসনা। আর যেদিন ফিরবে কমলারা, সে-দিনই কি বড়জোর পরের দিনই এ-বাড়ি ছাড়তে চায়। কমলার চোখের সামনে একটা দিন কাটানোও এখন কি যে কষ্টের আর ভয়ের সে শুধু বাসনাই বুঝতে পারছে।

কিন্তু, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবছিল বাসনা—এই চিঠির পরও যদি কমলা জবাব দেয়, সে আগামী সপ্তাহেই ফিরছে, তবে?

॥ নয় ॥

হাতটা কাঁপছিল। কলমটাকে শক্ত করে ধরতে গিয়ে মনে হল, সব অসাড় হয়ে গেছে, বরফে হাত রেখে বসে থাকলে যেমন হয়। ঘামে ভিজে গেছে। বুকটা কেমন এক উত্তেজনায় ধক্‌ধক্ করছিল। কিসের আঁচ লেগে চোখ যেন জ্বালা করছে, গরম। নিশ্বাসও উষ্ণ।

তবু কাঁপা হাতেই বড় বড় করে সইটা করে ফেলল ও; বাসনা সেন। ইংরিজিতেই। অক্ষরগুলো কেঁপে অসম হয়ে রইল। থাকুক। একটি পলক সেই কাগজটির দিকে চেয়ে থাকল বাসনা, নীচের ঠোঁট দাঁতে কামড়ে। তারপর আস্তে আস্তে কলমটা টেবিলে নামিয়ে রাখল।

একটি কি দু'টিবার চোখ তুলেছে বাসনা সারাক্ষণে। নয়তো মুখ নীচু করেই বসে। কাঠের পার্টিশান দেওয়া এই ছোট্ট ঘরে কে আছে, কারা আছে তা দেখবার যেন দরকার নেই। সত্যিই নেই। কাউকেই চেনে না বাসনা, এক অমলেন্দু ছাড়া। কিন্তু সেই অমলেন্দুর দিকে তাকাতেও পারছে না বাসনা। অদ্ভুত এক সঙ্কোচ। বাসনা জড়সড় হয়ে বসে। অমলেন্দু বাদে আর চারজোড়া চোখ যেন দেখছে, হাসছে, ঠোঁট টিপেটিপে এবং ভাবছে, ভাবাই স্বাভাবিক—এই মেয়ে, বাসনা সেন যা করল, হ্যাঁ তা একটা কীর্তিই বৈকি! বিধবা একে বলা যায় না, বেহায়া-বিধবা, কাঁচা বয়সের জ্বালায় জ্বলছিল, আর তারপর যা হয় —প্রেমেই পড়েছিল অমলেন্দুর সঙ্গে। লুকিয়ে লুকিয়ে কত রঙ্গই করেছে। এখন চোরের মতন দেখ, ওয়েলিংটনের এই কাঠের পার্টিশনে দেওয়া ছোট্ট এক ফালি ঘরে তার বৈধব্যকে খসখস কলমের সইয়ে আর বিড়বিড় মুখের কথায় (আমি বাসনা সেন শ্রীঅমলেন্দু মিত্রকে আজ থেকে বৈধ স্বামীরূপে গ্রহণ করিলাম—) বাসি কাপড়ের মতন আড়ালে খুলে ফেলে দিল।

শপথ করতে গিয়ে গলা যেন আর ফুটছিল না। নেশার ঘোরে কোনোরকমে ঠোঁট নেড়ে সাপ চলার সুরে কথাগুলো আওড়ে গেল বাসনা। কিন্তু মনে মনে একবার থেমেছিল। বৈধ স্বামী। স্বামী···

আর এক স্বামী, এক ফোঁটা বৃষ্টির মতন টুপ করে যেন চোখের পাতায় পড়ে একটু বুঝি ভিজিয়ে দিলে, অস্পষ্ট করে তুলল দৃষ্টি। বাসনা খুব অস্পষ্ট, ভুলে যাওয়া স্বপ্নের মতন ফিকে খাপছাড়াভাবে দেখছিল —পরিমলকে, সামনে বসে, গায়ে সাদা পাতলা চাদর, খালি গা, হাতে বাঁধা হলুদ সুতো···হালকা ছু'টি ভুরুর নীচে অত্যন্ত নিরীহ লজ্জাভরা ছু'টি চোখ নিয়ে বসে আছে।

···বৈধ স্বামী হিসেবে গ্রহণ করিলাম। হ্যাঁ, কথাটা—ঠোঁট বেঁকিয়ে কাঠের মত শক্ত করে শেষ করে ফেলল বাসনা। কপালের শিরা দপ্ দপ করছিল।

মনে হচ্ছিল বাসনা ঘুমের মধ্যেই বিছানা ছেড়ে উঠে ঘুম-চোখেই নিশির ডাকে কোথাও চলে এসেছে। এখানে সব অন্ধকার, আবছা। বাতাস নেই, আলো নেই। পুকুর পাড়ের স্যাঁতসেঁতে অনুভূতি, কতক-গুলো ঝিঁঝিঁ ডাকছে কানের কাছে, গাছ পাতা লতার ফিসফিস। খসখস।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার একটা শব্দ হল। চমকে উঠল বাসনা। বুকটা আবার ধক্‌ধক্ করে উঠল।

ভদ্রলোক হাসছেন। নমস্কার করলেন এবং বললেন—।

কী বললেন বাসনার কানে গেল না। আড়ষ্ট হাতে বাসনাও প্রতি-নমস্কার করল।

তারপর বাইরে। সেই তিনজন। এরা কে—? বাসনা চেনে না। অমলেন্দুর বন্ধু, পরিচিত সব। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সিগারেট ধরালো। কথা বলছিল হেসে। তরল সুরে।

ঠক-ঠক শব্দ হচ্ছিল সিঁড়ির। বাসনার পা কাঁপছিল, ভয় পাচ্ছিল না।

কোথায় নামছে বাসনা, কতটা নেমে এসেছে, কোথায় নেমে যাচ্ছে?

রাস্তায়।

'আমরা যাই অমলেন্দু, তুমি ট্যাক্সি নাও। উইশ ইউ বোথ্ এ ভেরী হ্যাপি কনজুগাল লাইফ।' বাসনা তাকালো, একজন বলছে, সেই তিনজনের একজন। এবার বাসনার দিকে চাইল, হাসল একটু, 'পরে আলাপ হবে আপনার সঙ্গে, বউদি। এই তিন নাপিতের পাওনাটা কিন্তু থেকেই গেল। পরে আদায় করে নেব। নমস্কার।'

হাত তুলে তুলে বাসনাকে তিনটি নমস্কার করতে হল। দম দেওয়া পুতুলের মতনই। মুখের কোথাও একটু হাসি ফুটল না, রেখা কাঁপল না।

ট্যাক্সিতে এক পাশ ঘেঁষে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকল বাসনা। ভীষণ অন্যমনস্ক।

সিগারেট ধরালো অমলেন্দু। কী যেন বললে একটা, বলে তাকালো বাসনার দিকে। কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

হাত বাড়িয়ে বাসনার গা ছুঁয়ে যেন তাকে জাগালে অমলেন্দু, 'কি ব্যাপার, চুপচাপ যে!'

অমলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু একটু করে বাসনা যেন নিশির ঘোর কেটে জেগে উঠছিল।

'ভয় হচ্ছে?' অমলেন্দু বলল আবার হাসি-মুখে।

'ভয়।' মাথা নাড়ল বাসনা, 'না।'

'লজ্জা?' অমলেন্দু একটু সরে এল।

'লজ্জা,' ঠোঁটে দাঁত ছুঁইয়ে ফিসফিস গলায় জবাব দিলে বাসনা, 'লজ্জা হবে কেন?'

'তবে—?'

'কি?'

'একেবারে চুপচাপ যে! মনে হচ্ছে তুমি যেন মনমরা হয়ে রয়েছ।'

'পাগল!' বাসনা একটু হাসবার চেষ্টা করল। অমলেন্দুর হাতটা সরিয়ে দিতে গিয়ে, হঠাৎ কী যেন খেয়াল হল, আস্তে করে নিজের

হাতখানা রাখল ওর হাতের ওপর।

'কি ভাবছ?' শুধলো অমলেন্দু একটু থেমে।

কি ভাবছে বাসনা, সেটা এখন—বিকাল চারটের পর আর বলা যায় না। এখন আমার বৈধ স্বামী, বাসনা যেন মনে মনে নিজেকে এবং অমলেন্দুকে ভেঙচি কেটে বলছিল, এখন আমার বৈধ স্বামী তুমি—অমলেন্দু মিত্র। আর আমি বাসনা সেন—পরিমল সেনের বিধবা স্ত্রী—অক্টোবরের তেইশে বিকেল চারটের পর বাসনা মিত্র হয়ে গেছি।

তোমার স্ত্রী হওয়ার পর আমার আর ভাববার কি থাকতে পারে? আমি যদি এখন বলি যে, আমি—হ্যাঁ আমি, তেইশে অক্টোবরের বিকেল চারটের পর যে বাসনা মিত্র হয়েছে—সেই মেয়ে বাসনা সেনকে ভাবছে এবং পরিমলকে, তুমি কি খুশী হবে? হবে না। নিশ্চয় নয়। পরিমলও হত না, হয়তো হয় নি, যদি ধরে নেওয়া যায় কোনো সূক্ষ্ম বায়বীয় অস্তিত্ব নিয়ে সে বেঁচে থাকে, বেঁচে ছিল, আছে এখনও।

বাসনা মুখ ফিরিয়ে বাইরে তাকালো। হুস্ করে একটা বাস পেরিয়ে গেল। ট্রামের ঠং-ঠং ঘণ্টা বাজছে। রাস্তায় লোক। জুতোর দোকান। একটা কুলি ঝুড়ির মাথায় লাল রঙের এক ট্রাই-সাইকেল চাপিয়ে চলেছে। দমকা ঠাণ্ডা হাওয়াও বুঝি বয়ে গেল।

পরিমল আমাকে ভালবাসত। সাধারণত স্বামীরা স্ত্রীকে যেমন ভালবাসে। হ্যাঁ, তেমনি। আমরা ঘর করেছি এক সঙ্গে বিছানায় শুয়েছি। একই বালিশে মাথা দিয়ে। মুখে মাথায় এক হয়ে। গায়ে গায়ে তফাৎ থেকেও না থেকে। আর তার কাছেও আমার লজ্জা ছিল না। কোনোখানেই নয়। আমার সব তারই ছিল। যদি বলো তবে, তুমি ভাবতে পার তার হাতে তার চোখে আমি মনে শরীরে নগ্নই ছিলাম।

পরিমলের জন্য আমার সময়কে আমি একদিন খরচ করেছি কত সুখে। ওর ঘুম ভাঙিয়েছি সকালে, ওর জন্যে হাত পুড়িয়েছি উনুনে, শাড়ি জামায় সেজেছি ওর চোখে যাতে ভাল লাগে। তার জন্যে

আমি ভাবতাম। বাধ্য স্ত্রী, বৈধ স্ত্রীর মতনই এ-সব ভাবনা, স্বামীর সুখ-দুঃখের ভাবনা ভাবা আমার কর্তব্য ছিল এবং আমি ভেবেছি। পরিমলের মুখ কালো দেখলে ভেবেছি, কি হয়েছে ; কি হয়েছে ওর, শরীর খারাপ হলে ভেবেছি—অসুখটা তাড়াতাড়ি সেরে যাক।

যাকে ভালবেসেছিলাম—সে মরে গেলে কেঁদেছি বৈকি। আঘাত পেয়েছি। দুঃখ বেজেছে। কতদিন মনে হয়েছে আমার সর্বস্ব পরিমল তার চিতায় ছাইয়ের সঙ্গে পুড়িয়ে উড়িয়ে বিলিয়ে দিয়ে চলে গেছে। মনে হত লোকটা কী নিষ্ঠুর। এত যন্ত্রণা কেন সে দিল আমাকে।

তারপর এখন সেই পরিমলকে আমি ভাবছি তোমার স্ত্রী হয়ে। বৈধ স্ত্রীদের এ-সব ভাবার অধিকার অবশ্য নেই। তবু ভাবছি। যেমন তোমার কথাও আমায় ভাবতে হয়েছে বাসনা সেন থেকেও।

অমলেন্দু কথা বলছিল। বাসনা যেন চমকে উঠে চাইল।

'এতদিন তবু ছিলাম একরকম। এখন থেকে খুবই খারাপ লাগবে।' অমলেন্দু বলছিল।

'কেন ?' বাসনা চোখ তুলে তাকালো।

'তুমি এক জায়গায়, আমি অন্য জায়গায়।' অমলেন্দু হাসবার চেষ্টা করল।

'ও!' বাসনার বুকের মধ্যে কেমন একটু শিরশির করে গেল। অমলেন্দুর চোখে চোখে চেয়ে একটু চুপ করে থেকে মৃদু গলায় বলল, 'আমারও ভাল লাগবে না। কিন্তু আর ক'দিন বা। দিন চারেক।'

'কমলাবউদিরা সত্যিই শুক্রবারে ফিরবে তো ?'

'তাই তো লিখেছে।'

'লিখেছে, কিন্তু যদি না এসে পৌঁছায়!' অমলেন্দু সুস্থির হতে পারছিল না।

'না এলেই বা।' বাসনা এবার, প্রথম ঠোঁট মেলে হাসল, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আর কিসের ভয় তোমার।'

'ভয় না। তবু—!' অমলেন্দু বাসনার হাত তুলে নিল, 'আমি ঘরভাড়া করেছি জান তো।'

'জানি। বলেছ আগেই।'

'কিছু কিছু জিনিসপত্র কিনেছি।'

'না কি!' বাসনা বুক চেপে নিশ্বাস ফেলল।

হ্যাঁ, বিছানা, বাসনপত্র—'

'খুব সংসারী তো তুমি।'

'কয়েকটা শাড়ি কিনেছি তোমার জন্যে। নিজের চোখে যে রং ভাল লেগেছে তাই দেখে দেখে।'

'শাড়ি।' বাসনার গলার কাছে খানিকটা বাতাস হঠাৎ যেন মুঠোর মতন শক্ত হয়ে আটকে গেল।

উজ্জ্বল গাছপাতা-রং শাড়ি পরিয়ে চেহারাটা যেন মনে মনে একবার দেখল বাসনা। তারপর খুব সহজেই তার মনে এল, এরপর অমলেন্দু চাইবে বাসনার এই সাদা সিঁথিতে সিঁদুর উঠুক, কপালে টিপ, পায়ে আলতা। আরও হয়তো অনেক, অনেক কিছুই।

এমন নয় যে অমলেন্দু চাইলেই বাসনাকে এই বয়সে আবার নতুন করে টিপ আলতা পরতেই হবে। কিন্তু সিঁদুর!

বাসনার শুকনো, সাদা নরুনের আগার মত সরু সিঁথিটা কিরকির করতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন অনেক ধুলোবালি ময়লায় সিঁথিটাই হারিয়ে গেছে।

আলগোছে হাতটা মাথায় আস্তে আস্তে টেনে বুলিয়ে নিল বাসনা। নিয়ে কপালে ধরে থাকল।

'কি, মাথা ধরেছে?' অমলেন্দু কোমল স্বরে শুধলো।

মাথা হেলালো বাসনা। হ্যাঁ ধরেছে। যদিও মাথা ঠিক ধরে নি, ঝিম-ঝিম করছিল।

'তুমি কেমন নার্ভাস হয়ে পড়েছ।' খানিক থেমে বলল অমলেন্দু, 'এ-সব হাঙ্গামা একটু সহ্য করতে হবে বৈকি। তবু তো রেজিস্ট্রীর ব্যাপারটা কত ইজি!' অমলেন্দু একটু হাসল।

বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামল। 'ক'টা বেজেছে?' শুধলো বাসনা। সুধাময়ের অফিস থেকে ফেরার কথা বার বার মনে পড়ছিল।

বাচ্চা গুলোর ওপর যেন ফলিয়ে এসেছে।

খারাপ লাগছিল তুষারের, অনুতাপ হচ্ছিল। নিজের অকারণ মানসিক চাঞ্চল্যের জন্যে গ্লানি বোধ করছিল।

পরে অশোক শানু যমুনার জন্যে তুষারের কেমন কষ্টও হল ওদের দোষ নেই, ওরা কি জানত রোজ ওরা যা করে যে-ভাবে সব কাটায়, আজ তুষারদিদি তাতে হঠাৎ রাগ করে বসবে!

তুষার উঠল। মনে মনে ঠিক করল আজ অশোক যমুনাকে দিয়ে অন্য রকম ভাবে ইতিহাসের একটা গল্প পড়াবে।

দুপুরের খাওয়ার ছুটিতে আদিত্যকে দেখা গেল। তুষারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে খাবার ঘরের দিকে যাচ্ছে, আদিত্য গাছতলা দাঁড়িয়েছিল।

ছেলেমেয়েরা চলে গেছে অনেক।, তুষার যাচ্ছে, আদিত্য গাছতলা থেকে ডাকল।

তুষার দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই ভাবল, তার চলে যাওয়া উচিত ছিল।

আদিত্য কয়েক পা এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। মুখে চোখে প্রবল হাসি মাখানো। 'কি খবর?'

তুষার মুখ তুলল না। মানুষটার গলার স্বর থেকেই আদিত্যর উৎফুল্লভাব অনুমান করতে পারছিল। এত আনন্দের কি আছে! তুষার বিরক্ত হয়ে ভাবল, এত খুশী হবার মতন পেয়েছে ও?

'কাল আপনার জন্যে যা ভুগলাম।' আদিত্য দুর্ভোগের দায় জানবার জন্যে তার কথার স্বর ও শব্দে ঝোঁক দিল।

তুষার কথা বলল না। কে ভুগেছে কাল? যে-লোক শাসন মানে না, যে-লোক সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকে? আদিত্যর এই নিয়ে উক্তিতে যেন তুষারের আরও রাগ হচ্ছিল।

'কাল দেখলাম, মানুষ কত অভদ্র হয়।' আদিত্য বলল।

তুষার মুখ তুলল, দেখল আদিত্যকে। লোকটা তাকে বলছে। তুষারের কপালের কাছটায় জ্বালা করে উঠল। কী দুঃসাহস, কতখানি ঔদ্ধত্য। 'কে অভদ্র?'

'আপনাদের স্টেশন-স্টাফ'।

তুষার রুক্ষ চোখে দেখছিল আদিত্যকে। কথা পালটে নিয়েছে আদিত্য, তুষার সন্দেহ করল, বে-ফসকা কথাটা বলে এখন সামলাবার চেষ্টা করছে।

'আমি মাঝ রাতে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে একটু শোবো ভেবেছিলাম। তালা বন্ধ ঘর, বললাম···মশাই একটু খুলে দিন। দিল না; বলল, আপনি ত প্যাসেঞ্জার নন।' আদিত্য নিজের মনেই বলে চলল, লোকগুলো একেবারে অ্যানিমাল···'

'যে-সে এলে থাকতে চাইলেই ঘর খুলে দেবে—' তুষারের মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল। সে স্টেশনের প্রসঙ্গে কথাটা বললেও আসলে এই কথার অন্য অর্থ ছিল, ভিন্ন ঈঙ্গিত। আদিত্য তাকে ইঙ্গিত করেছে আগে, কাজেই তুষার সেই ইঙ্গিতের প্রত্যুত্তর দিল। আর কিছু বেশী হয়ত দিল, আদিত্যকে ভদ্রতা এবং ভদ্র বোধ সম্পর্কে কিছু জ্ঞান।

'যে সে—। যে সে মানে কি! ওয়েটিং রুম কারও ভাড়া করা বাড়ি নয়।'

'আপনি প্যাসেঞ্জার নন।'

আদিত্য হাসল। বলল, 'আঃ-হা, তা একটা লোক যখন বিপদে পড়েছে তখন অত নিয়ম কি। নেসেসিটি···।'

'সবাই নিয়ম ভাঙতে চায় না।' তুষার অন্য অর্থে বলল।

'সে যারা ভীতু, বা···নিতান্ত প্রেজুডিস···'

'আপনি তা মনে করতে পারেন।' তুষার বলল, বলে হাঁসতে শুরু করল।

পাশে পাশে হাঁটছিল আদিত্য। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আপনি কাল যদি কিছু খাইয়ে দিতেন তা হলেও বাঁচতাম। রাত্রে খিদে পেয়ে গেল খুব। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখি মাত্র পাঁচ আনা পয়সা। খেয়াল ছিল না, টাকা পয়সা নেই।'

অনাহারে এবং অনিদ্রা—, তুষার ভাবল, কাল এই মানুষটা

অনাহারে এবং অনিদ্রায় রাত কেটেছে, কাটুক, তুষার তার কি করতে পারে।

'তারপর ওই খালি পেটে ভোর হতে না হতেই হাঁটতে শুরু করেছি। হেঁটে হেঁটে একটা পথ।' আদিত্য হাসল কেমন করে যেন, হাসি থামলে বলল, 'খুব শিক্ষা দিলেন।'

তুষার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। শিক্ষা পেয়েছে না কি লোকটা পেয়েছে যদি তবে হাসছে কেন?

'পাওয়া উচিত।' তুষার বলল, জোর দিয়েই বলল।

'উচিত?'

'নয় ত কি ভাবছেন আপনার কোনো জ্ঞান হত।'

'আমার জ্ঞান কি আপনার চেয়ে কম?

'আপনার কোনো জ্ঞানই নেই।'

আদিত্য উচ্চস্বরে হেসে উঠল। তুষারের কথা বলার ঢং এবং রাগের ভাবে যেন সে অসাধারণ কোনো মজা পাচ্ছিল।

অপ্রত্যাশিত এই হাসি তুষারকে তেমন বিব্রত করল না। তার সমস্ত কাঠিন্য, বিরক্তি যেন অর্থহীন হয়ে গেছে; আদিত্য কিছু স্পর্শ করতে পারছে না। কিছুই সে গ্রাহ্য করছে না।

'তাড়িয়ে দিয়েও অত বড় বড় কথা শোনাচ্ছেন কেন? আদিত্য হাসি মুখে বলল।

তুষার নীরব। খাবার ঘরের কাছাকাছি তারা পৌঁছে গেছে।

'কাল আপনি আমায় যে-ভাবে তাড়ালেন, মনে হল যে কোনো ডাকাত কিংবা চোর-ফোরকে বাড়ির ত্রি-সীমানা থেকে সরালেন।'

মনে মনে তুষার স্বীকার করল, হ্যাঁ। হ্যাঁ সে এই মানুষটাকে ভয় পেয়েছিল। লোকটা তার বাড়িতে অবাঞ্ছিত ছিল। এমন মানুষকে কেউ আশ্রয় দেয় না। দেওয়া উচিত না।

'খিদের মুখে আমার যা রাগ হচ্ছিল আপনার ওপর...। দুটো খেতে দিয়েই না হয় বাড়ি থেকে তাড়াতেন!'

তুষার বলব কি বলব না করে শেষ পর্যন্ত বলল, 'আপনিই কি আমায় খুব স্বস্তি দিয়েছেন ?

'আই ডিড নাথিং।'

'না, কিছুই করেন নি।...খালি শাসিয়ে গেলেন, যখন খুশি চলে আসতে পারেন।'

'কিন্তু আমি আসি নি।'

কি যেন বলতে যাচ্ছিল তুষার, অকস্মৎ অনুভব করল, আদিত্য আসে নি বলেই কি তুষার এত বিরক্ত অপ্রসন্ন শূন্য বোধ করছে। আজকের এই ক্ষোভ দুঃখ রাগ মনমরা ভাব কি আদিত্যর না আসার জন্যে ?

স্বপ্নের কথা মনে পড়ল তুষারের। আর সহসা সে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে উঠল, ছি ছি, এই সব বিশ্রী চিন্তা তার মনে আসছে কেন ? কে আদিত্য, তার সঙ্গে তুষারের কিসের সম্পর্ক ? কেন তার আসা না আসার ওপর তুষারের মন বিরক্ত বা অপ্রসন্ন হবে, কেন তার স্বপ্ন দেখে তুষার চোখের জল দিয়ে ভোর শুরু করবে।

তুষার কোনো কথা বলল না, দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল।

নয়

'দিদি ?'

'কি ?'

'তুই কোথায় গিয়েছিলি ? বাইরে ?'

'না। বাগানে ছিলাম। বসে ছিলাম।' তুষার অন্যমন গলায় বলল।

শিশির দিদিকে দেখছিল। লণ্ঠনের মেটে আলোয় তুষারকে নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিল, আলোটাও জানালার দিকে, তুষার দেরাজের কাছে দাঁড়িয়ে। শিশির দিদিকে লক্ষ্য করছিল। আজ এখন

পর্যন্ত দিদি তার সঙ্গে তেমন কোনো কথা বলে নি। স্কুল থেকে ফিরে, অবেলায় অনেকক্ষণ নিজের ঘরে শুয়েছিল, সন্ধ্যে পর উঠে চা খেয়ে, কাপড় ছেড়ে একবার এ-ঘরে এসেছিল দু একটা কথা বলে চলে গেছল। তারপর অনেকক্ষণ পরে—হয় ঘণ্টা খানেকেরও বেশী বাইরে থাকার পর, এই ফিরল।

দিদিকে ভাল দেখাচ্ছে না। অবেলায় শোয়ার জন্যেই হোক কিংবা দিদির কোনো কারণে শরীর খারাপ হয়েছে হয়ত, তার কেমন ম্লান মনমরা শুকনো দেখাচ্ছে দিদিকে।

'বাগানে ছিলি এতক্ষণ? কি করছিলি একলা একলা?' শিশির বলল।

'বসে ছিলাম।'

'তুই আবার একা বসে থাকতে পারিস নাকি?' শিশির যেন বিশ্বাস করল না, কিংবা দিদির স্বভাবকে নিন্দেই করল। 'যে আমি, একা থেকে থেকে অন্য অভ্যেসই হয়ে গেছে।'

'বাইরেটা ভাল লাগছিল।' তুষার দেরাজ থেকে পুরোনো ওষুধের শিশি সরিয়ে কি যেন খুঁজছিল।

'আমায় ডাকলি না কেন?' শিশির বলল।

তুষার কথার জবাব দিল না। সে একা ছিল। একা থাকার সময় ভাইকে ডাকা যায় না। ডাকতে ইচ্ছে করে না।

'হ্যাঁরে, কখানে না একটা অ্যাসপিরিনের শিশি ছিল?' তুষার ভাইয়ের দিকে তাকাল।

'দেখ, আছে ওখানেই।...তুই অ্যাসপিরিন খাবি?'

'মাথা ধরেছে বড়।'

'অবেলায় ঘুমোলি যে।'

'না। ঘুমোই নি। শুয়েছিলাম।' তুষার অ্যাসপিরিনের শিশি খুঁজে পেল। 'সকালের দিকে ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়।' তুষার কথা বলতে বলতে দেওয়ালের দিকে গেল। কুঁজো থেকে

জল গড়িয়ে নিয়ে ভাইয়ের দিকে তাকাল, বলল, 'ক'টা খাব রে? দুটো? চারটে?'

'না—না, চারটে নয়, বুক ধড়ফড় করে মরবি। দুটো খা।'

তুষার অ্যাসপিরিন মুখে দিয়ে জল খেল। অনেকটা জল। তারপর শিশি জায়গা মতন রেখে ভাইয়ের বিছানায় এসে বসল।

ভাই বোন মুখোমুখি। তুষার বিছানায় পা গুটিয়ে বসল। 'তাস খেলবি?'

'না' মাথা নাড়ল শিশির। 'তোর ত এমনিতেই মাথা ধরে আছে।'

'তা হোক; তাস আনি।' তুষার নেমে পড়ছিল।

'না রে দিদি, তাস না। ভাল লাগছে না। বরং দুটো গল্প করি।'

তুষার আবার পা গুটিয়ে নিল। ভাইয়ের মুখ দেখল ক'পলক। শিশিরের মুখ বেশ সুন্দর। নরম পাতলা টিকলো নাক, শান্ত চোখ, কপাল বেশ লম্বা। তুষারের মুখের সঙ্গে নীচের মুখের মিল আছে ওপর মুখের নেই। ভাইয়ের মুখ মাঝে মাঝে তুষারকে কেমন বেদনা দেয়। কারণ এমন সুন্দর নরম মুখের পুরুষ মানুষটি কোনোদিন জীবনের সব তৃপ্তি পাবে না। ভগবানের নিষ্ঠুর অভিশাপ তাকে কী ভীষণ অক্ষম করে রেখেছে।

'হ্যাঁরে দিদি, আমাদের বাগানে শিউলি ফুটেছে?'

'ফুটেছে। এখন অল্প।'

'আমি কালও গন্ধ পেয়েছি যেন।' শিশির জানলার দিকে তাকাল, 'গাছটাকে এ-বছরে এমন করে নষ্ট করে দিল।'

'তোর জন্যেই ত।' তুষার বলল।

শিশির চুপ করে থাকল। শিউলি গাছটাকে এক বন্ধুর কথা শুনে লোকে ডেকে ডাল পালা ছাঁটিয়ে দিয়েছিল শিশির। নতুন ডালপালা, নতুন অজস্র পাতার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু গাছটাকে

আগামুড়ো অমন করে কুপিয়ে কেটে দিলে এক বর্ষার জল আর কত তার গা ভরতে পারে।

'আমায় কাল কিছু ফুল এনে দিস ত।' শিশির বলল।

তুষার মাথা নাড়ল। দেবে। তারপর কি ভেবে আচমকা একটু ঠাট্টা করল। 'ফুল দেখে কবিতা লিখবি?'

'লিখলেই বা।' শিশির জবাব দিল। দিদির চোখে চোখে চেয়ে হঠাৎ তার মাথায় কোনও দুষ্টু বুদ্ধি এল, বলল, 'আমরা ফুল দেখলে কবিতা লিখি, তোরা হলে মালা গাঁথতিস।'

'গাঁথতাম, অন্যায়টা কি হত!'

'কিছু না। মেয়েদের সবটাই ত কাজে লাগে এমন কিছু করা, প্র্যাক্‌টিকাল পারপাস ছাড়া...'

'থাম্, তুই আবার ছেলে মেয়ে কি বুঝিস? এক ফোঁটা ছেলে।'

'বুঝি না?'

'ডিম বুঝিস।'

'আচ্ছা, তা হলে তোকে...ধর তোকে নিয়েই একটা গল্প লিখি।'

'গল্প?'

'লিখি না একটা।...আগে দু তিনটে লিখেছি।...আজ কাল গল্প লিখতেও ইচ্ছে করে, দিদি।' শিশিরের গলায় কোনো এক রকম বিষাদ। যেন বলতে চাইছে, সারাদিন—সারাটা দিন একা একা আর পারি না রে বড় অসহ্য লাগে। এই অসহ্য একঘেয়ে সময় কাটানোর জন্যে আর কি করা যায়, এক বসে বসে গল্প লেখা ছাড়া! আমি পারি, এই অফুরন্ত সময় নিয়ে বসে বসে, খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমি এক মনে একটা একটা করে গল্প লিখতে পারি।

তুষার নীরব থাকল। ভাইকে আর দেখছিল না। শিশির কি কিছু বলতে চায়, শিশির কি কোনো কিছু বুঝতে পারে! তুষারের

মনে হল, এই গল্প লেখার কথাটা একেবারে অকারণে নয়; তার সন্দেহ হল, শিশির কিছু ভাবে, হয়ত ভেবেছে।

ভাই বোন দুজনেই অল্প সময় নীরব থাকল। বাইরে শরতা-কাশের চাঁদ স্নিগ্ধ পূর্ণ জ্যোৎস্না ঢেলেছে, জানলার গা দিয়ে সেই জ্যোৎস্না ঘরে আসার অপেক্ষা করছে। শীতল মৃদু বাতাস আসছিল। রাস্তা দিয়ে কখনো কখনো সাইকেল যাচ্ছে। সাইকেলের ঘন্টি শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট ভাবে। তুষার ঘন্টির সঙ্গে অন্যমনস্ক এবং ভীত হচ্ছিল।

'শিশির—'তুষার কিছু ভাবতে ভাবতে বলল, 'এবারে পুজোর সময় কান্তিমামাদের ওখানে যাবি?'

কান্তিমামা—!' শিশির বোধ হয় অবাক হয়েছিল।

'চল্ না। অনেক বার ত বলেছে।'

'তুই পাগল।' শিশির বলল।

'পাগল!—কেন?'

'এই ঘর বাড়ি ফেলে যাওয়া!...তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে তার কিই বা আত্মীয়তা?'

'আমাদের কার সঙ্গেই বা আত্মীয়তা!' তুষার বলল, 'ও-সব আত্মীয়তার কথা ধরলে তোর আমার যাবার জায়গা কোথাও নেই। এখানেই সারা জন্ম থাকতে হয়।'

'রয়েছি তাই।' শিশির দিদির চোখে চোখে তাকিয়ে বলল।

তুষার কেমন যেন বাধা পেল। কয়েক পলক ভাইকে দেখল, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল, মৃদু গলায় বলল, 'একবার না দুবার আমরা বাইরে গেছি, বাবা বেঁচে থাকতে। তারপর সেই যে এখানে পড়ে আছি, কোথাও যাই নি। আর ভাল লাগে না রে!'

দিদির গলার স্বর শিশির মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। দিদির কথায় হতাশা ক্লান্তি, দিদির মন তার গলার স্বরে ধরা পড়ছিল। শিশির স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, দিদির যেন আজ ক'দিন কিছু আর ভাল লাগছে না।

অল্প সময় শিশির নিজমনে কিছু ভাবল। ভেবে নিশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, 'ও সব তোর খেয়ালের কথা ছাড়। এখান থেকে তুই কোথাও গিয়ে থাকতে পারবি না, যেতে ও পারবি না। কেন বাজে কথা বলছিস, দিদি।'

তুষার বুঝতে পারল না, বাস্তবিক এই অসম্ভব অকারণ কথা কেন সে বলতে গেল। এখান ছেড়ে এ-বাড়ি ছেড়ে কোথাও কি কখনও গিয়েছে তুষার? যাবার কথা কি ভেবেছে?

অথচ যখন তুষার কথাটা বলেছিল, তখন মনে হয়েছিল, সত্যিই এখানের একঘেয়েমি এবং ক্লান্তি সে অনুভব করছে; অন্য কোথাও যেতে পারলে হয়ত বাঁচে।

শিশির হাত বাড়িয়ে একটা বালিস টেনে নিল, কোলের ওপর রাখল। 'জ্যোতিদার খবর কি রে?'

তুষার যেন শুনতে পায় নি। মুখ সামান্য বেঁকা করে বসেছিল। জানলার দিকে সরাসরি মুখ নয়, কিন্তু জানলা দেখা যাচ্ছিল। জ্যোৎস্না এসেছে, জানলার শিক গলে, শিকের ছায়া ফেলে আলো এসে গেছে।

'জ্যোতিদার সঙ্গে তোর দেখা হয় না?' শিশির আবার বলল।

কথাটা এতক্ষণে তুষার শুনতে পেয়েছে। জ্যোতিদা…! শিশিরের মুখের দিকে তাকাল তুষার। জ্যোতিবাবুর কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিল তুষার এমন চোখ করে তাকিয়ে থাকল। বলল, 'দেখা হয়।'

'একদিন আসতে বলিস না। অনেক দিন আসেন নি।'

তুষার শুনল। কোন জবাব দিল না। মনে মনে জ্যোতিবাবুর কথা ভাবছিল।

'এ-রকম মানুষ আমি দেখি নি।' শিশির বলল, 'স্কুল নিয়ে মাতল ত মাতলই, আর এ-মুখো হল না।

'অনেক কাজ কর্ম নিয়েছেন যে।' তুষার অন্যমনস্ক গলায় জবাব

দিল। সামান্য চুপ করে থেকে আরও বলল, 'সারা দিনই একটা না একটা ঝঞ্ঝাট থাকে।'

'বাড়িতেও আসে না।' শিশির বালিশের ওপর কনুই রেখে সামান্য কুঁজো হল। 'তোকে বলি নি। সেদিন জয়ন্তীদি এসেছিল।'

'এখানে?'

'হ্যাঁ। শিশির মাথা নাড়ল। বলল, 'দুপুর বেলায় কী কাজে বেরিয়ে এখানে এসেছিল, অনেকক্ষণ ছিল। গল্প করল অনেক।'

'কি বলল?' তুষার আগ্রহ বোধ করছিল।

'সে অনেক কথা—'শিশির পিঠ সোজা করল। 'জ্যোতিদা বাড়ি আসে না, ছেলেমেয়ে নিয়ে জয়ন্তীদি একলা। বড় ছেলেটা হাত ভেঙেছে। মেয়েটার জ্বর। তার ওপর এমন দুই ভাড়াটে জ্যোতিদাদের, রোজই ঝগড়া মারপিট করছে, একজন আবার থানায় গিয়ে ডায়রি করেছে।'

তুষার মন দিয়ে শুনছিল। বলল, 'জ্যোতিবাবুকে বলব।'

'বলিস!'

সামান্য ইতস্তত করে শিশির বলল, 'আরও একটা কথা দিদি।'

'কি?'

'তোকে বলব?' শিশিরের মুখে সামান্য দ্বিধা।

'আমায় বলবি না। কি কথা?'

'তোদের সেই মলিনার বাবা একদিন জ্যোতিদাদের বাড়ি গিয়ে যা তা করেছে।'

'যা তা—!' অস্ফুট বিস্মিত স্বর বেরুল তুষারের গলা দিয়ে। তুষার অপলকে তাকিয়েছিল।

শিশির সসঙ্কোচে মৃদু গলায় বলল, 'একদিন মদফদ খেয়ে হাজির হয়েছিল জ্যোতিদাদের বাড়িতে। জয়ন্তীদিকে যা তা বলে গেছে।

জ্যোতিদা নাকি তার মেয়েকে ভুলিয়ে স্কুলে নিয়ে গেছে।' শিশির আর কিছু বলল না।

তুষার স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল।

দশ

জ্যোতিবাবু এই শহরের লোক। তুষাররা যত দিনের তার চেয়ে অবশ্য কম। তবু পুরোনো বাসিন্দেই বলা যায়। জ্যোতির বাবা ছিলেন পুলিশ দারোগা। চাকরীর শেষ পর্বে এখানে এসেছিলেন, তারপর অবসর নিয়ে আর অন্য কোথাও যান নি, পুরোনো হাটের দিকে অনেকটা জায়গা কিনে বাড়ি তুলেছিলেন। বাঙলো ছাঁদের বাড়ি, একতলা। বাড়ির মাথায় টালির ছাউনি। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন এখানে বসেই। সেই মেয়ে পাঁচ বছরের মধ্যেই বিধবা হয়ে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এল। জ্যোতির মা তার আগেই মারা গেছেন।

বিধবা মেয়ে ও নাতি নাতনিদের নিয়ে কয়েকটা বছর হরসুন্দর দারোগার কেটে যায়, তিনি বজ্রাঘাতে মারা যান। লোকে বলত পাপের জীবন এমনি করেই শেষ হয়। হরসুন্দর দারোগার কোথায় পাপ কেউ জানত না, তিনি এ-শহরে এসে এমন কিছু করেন নি যাতে পাপের কথা মুখে আসে, তবু লোক বলত। প্রথমে স্ত্রী, তারপর জামাতা হারালেন। শেষে নিজে ভগবানের পায়ে ঠাঁই নিলেন। সবই যে তাঁর পাপের ফল এ-ধারণা এখানের বহু লোকেরই ছিল, হয়ত আজও আছে।

বাবা মারা যাবার সময় জ্যোতি সবে মাত্র কলেজের পড়া শেষ করেছে। বছর বাইশ তেইশ বয়স। এই ছেলে ছিল আলাদা প্রকৃতির শহরে তার কোথায় ঘনিষ্ঠতা ছিল না। বাল্যাবধিই বাইরের স্কুল কলেজে পড়েছে, হোটেল-বোর্ডিংয়ে থেকেছে। ছুটিতে বাবার কাছে

এসেছে, কিন্তু সে-থাকা এত নিভৃত নিঃসম্পর্ক যে শহরের তার সমবয়সীরাও তার নাগাল পায় নি।

সংসারটা, বাবার মৃত্যুর পর, জ্যোতির ঘাড়ে পড়ল। দিদি আর ভাগ্নে ভাগ্নি সংসারে, সবে কলেজ ছেড়ে এসেছে ও। কি করবে ভেবে পায় নি। প্রথম প্রথম তু' এক জায়গায় কাজ করেছে, ভাল লাগে নি বোধ হয়, ছেড়ে দিয়েছে। বাস কোম্পানির এজেন্টগিরি করেছে কিছুদিন, তাও ছেড়ে দিয়েছে পরে। শেষে একটা মনিহারি দোকান খুলেছিল। বছর তুয়েক পরে সে-দোকানও উঠিয়ে দিল।

শেষে শিশু তীর্থে। শিশু তীর্থ জ্যোতিই সব চেয়ে পুরোনো। তারপর আশাদি, তারপর তুষার। তুষারকেও জ্যোতিই শিশুতীর্থে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

ঘটনাটা এই রকম। জ্যোতি এই শহরের যে তু' পাঁচজনের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত পরিচিত হয়েছিল, বা যাদের সঙ্গে মোটামুটি তার একটা সৌহার্দ্যর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে শিশির একজন। শিশিরের কোন বন্ধুর সঙ্গে জ্যোতি একদিন এবাড়ি এসেছিল। শিশিরকে দেখে কেমন গভীর সহানুভূতি বোধ করেছিল, আর সেই সহানুভূতির দরুন মাঝে মাঝে আসত এ-বাড়িতে। তুষারের সঙ্গে পরিচয় সেইসূত্রে।

সাহেবদাতুর শিশুতীর্থে জ্যোতি নিজের জায়গা করে নেবার পর তুষারকেও নিয়ে গেল। কথাটা অন্যভাবেও বলা বলা যায়, বরং সেটাই বলা উচিত।...শিশুতীর্থর তখনও নামকরণ হয়নি, সবে সাহেব দাতু কয়েকটা আদিবাসী ছেলে যোগাড় করে একটা পাঠশালার মতন চালাচ্ছেন, এবং আরও তু' পাঁচজন ছেলে যোগাড়ের চেষ্টা করছেন আশপাশ থেকে। এ সময় একদিন জ্যোতি বেড়াতে গিয়ে হল ওদিক পানে। সাহেবদাতুর সঙ্গে তার চোখের পরিচয় ছিল। বেড়াতে গিয়ে সেই পরিচয় পাকা হল। তারপর সাহেবদাতুর কাছে যাওয়া আসা করে জ্যোতি সাহেবদাতুর কল্পনার কথা শোনে, এবং ক্রমশ ওদিকে জড়িয়ে পড়তে থাকে। সাহেবদাতুই জ্যোতিকে

ডেকেছিলেন : তুমি এলে আরও একটু ভরসা পাই জ্যোতি, নতুন করে কিছু কাজও করা যায়।

জ্যোতি শিশুতীর্থের প্রয়োজনে নিজেকে উৎসর্গ করল। তারপর শিশুতীর্থ একটু একটু করে বেড়েছে, আর জ্যোতি একে একে তাদের নিয়ে গেছে, তুষারকে মলিনাকে। আশাদিকে সাহেবদাদু নিজেই খুঁজে বের করেছিলেন। প্রফুল্ল গিয়েছে আশাদির ডাকে।

তুষারকে যেদিন শিশুতীর্থের কথা বলেছিল জ্যোতি, তুষার অবাক হয়েছিল। তার ধারণায় আসেনি কেমন করে, কি গুণে তুষার শিশুতীর্থে জায়গা পেতে পারে।

'আমি!' তুষার সবিস্ময়ে বলেছিল।

জ্যোতি নীরব। শিশির পাশে বসে আছে। জ্যোতি শিশিরের দিকে তাকিয়ে, যেন কথাটা সে শিশিরকেই বলেছে।

'আমাদের লোকের বড় অভাব।' জ্যোতি বলেছিল, 'ছেলে মেয়ে কিছু হয়েছে, লোক পাচ্ছি না।'

'তা বলে আমি!' তুষার তখনও বিশ্বাস করতে পারছিল না। শিশুতীর্থের কাজ যে নিতে পারে, সে যোগ্যতা তার আছে।

'তুমি বেশ ভাল পারবে।' জ্যোতি বলল। জ্যোতি তুষারকে তুমি বলত। বলে তুষারের চোখে চোখে তাকিয়ে অনুরোধের মতন করে স্মিত হাসল যেন, 'তোমার স্বভাব শান্ত।'

কথাটা শুনে তুষার হেসে ফেলেছিল, শিশিরের দিকে তাকিয়ে আরও যেন মজা পেল, বলল, 'শিশির বলেছে বুঝি?'

'শিশির কেন বলবে, আমি দেখেছি।' জ্যোতি মৃদু গলায় জবাব দিল, 'তুমি আমাদের শিশুতীর্থ দেখেছ? দেখো নি। দেখলেই বুঝতে পারবে—এ অন্য ধরনের কাজ। স্বভাবত ইচ্ছা থাকলেই আমাদের কাজ হয়।'

'আমি নিজেই কিছু জানি না, অন্যদের কি পড়াব?'

'না পড়ালে। তোমার যা জানা আছে তাই শেখাবে ওদের।' জ্যোতি যেন নিঃসন্দেহ, তুষার পারবে; নিঃসন্দেহ বলেই আর কথা

বাড়াতে চাইল না।

মনে মনে তুষার ঈষৎ রোমাঞ্চিত হলেও ভরসা পাচ্ছিল না। তা ছাড়া শিশির আছে; শিশিরকে একা বাড়িতে ফেলে রেখে সে কি করে সারাদিনের মতন বাইরে যেতে পারে! স্কুটুর গাড়ি তখনও আসত না। তাকে কে নিয়ে যাবে, কি ভাবে সে যাবে! সমস্যা অনেক। 'আমায় দিয়ে হবে না।'

'হবে। না হলে শিখিয়ে নেব।' জ্যোতি শান্ত করে হাসল, বলল, কাজটাকে কাজ মনে করো না। তোমায় আমরা টাকা পয়সাও দিতে পারব না। যদি মন ভরে, ভাল লাগে তুমি নিজেই সব পারবে।'

তুষার নীরব ছিল। তার ভাল লাগবে কি!

শিশির হঠাৎ কথা বলল। বলল, 'সারাদিন বাড়িতে বসে থাকিস তুই। একবার এ-ঘর, একবার ও-ঘর করিস। এ তোর ভাল লাগবে দিদি। সময়টা কাটবে।'

তুষার আর আপত্তি করে নি।

কিন্তু শিশুতীর্থ তুষারকে সামান্য দিনেই মোহের মতন টানল। তুষার ভাবে নি, তার সাধ্য আছে; তুষারের সন্দেহ ছিল—এই কাচ্চাবাচ্চাদের নিয়ে তার দিন কাটবে কিনা; এবং তুষার ভেবে ছিল, জ্যোতিবাবু তাকে দায়ে পড়ে বেশী রকম বিশ্বাস করে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে সে উপযুক্ত পাত্র নয় এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

আশ্চর্য, তুষার শিশুতীর্থের মধ্যে খাপ খেয়ে গেল। সাহেব দাদু তাকে যাদু করল; সে কী এক পবিত্র গন্ধ পেল এখানে, কিসের আনন্দ, দিন ব্যয়ের সুখ, আত্ম নিবেদনের শান্তি যে তুষার শিশুতীর্থকে তার প্রত্যহের অস্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলল। সুখ বা শান্তি হয়ত এই রকমই। যে ভেবে নেয় পেলাম সে পায়। কোন গল্পে আছে না, মাটিকে সোনা সোনা ভেবে এক ফকির পুঁটলি ভরে মাটি বয়ে গ্রামে ফিরেছিল দীর্ঘকাল ধরে। লোকে

বলল, হায় বোকা—এ ত মাটি, এতদিন পরে এই মাটি তুমি সোনা ভেবে বয়ে এনেছ! ফকির হাসল, বলল, এই সোনা যে মাটি নয় সেটা বুঝতেই এতকাল বাইরে ছিলাম।

সুখ শান্তিও তেমনি। তুষার ক্রমে ক্রমে ভেবে নিল এই শিশু তীর্থের মধ্যেই সুখ আনন্দ তার। সুখ আনন্দ পেল। তুষার ভেবে নিল, নিজেকে ব্যয় করার এই পথটিই তার মনকে তৃপ্তি দিচ্ছে সুতরাং তুষারের মন ভরে থাকল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে তুষার অনেক দিন পরে পুরোনো কথা-গুলো আজ ভাবল। জ্যোতিবাবুকে সে কখনও গভীর করে খুব কাছাকাছি এমন ভাবে নি। কারণ জ্যোতিবাবু তেমন মানুষ যাকে কাছে আনার বা কোনো নিকট সম্পর্কে এনে ভাবার সুযোগ পাওয়া যায় না। তুষারের সঙ্গে জ্যোতিবাবুর পরিচয় পুরোনো, অথচ তুষার কখনও এই শান্ত নম্র ধীর স্থির মানুষটিকে অকারণে মনে করতে পারে নি। অপ্রয়োজনে তার সামনে যেতে বা কথা বলতে পারে নি। তার ফলে পরিচয় সত্ত্বেও, জ্যোতিবাবু তাকে শিশুতীর্থের মায়ায় জড়িয়ে দেওয়ার কারণ হলেও, তুষার ওঁকে দূরে দূরে রেখেছে, তুষার ওঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেছে। জ্যোতিবাবুকে দেখলে তুষারেরর মনে যে ভাব হয়েছে তাকে ঠিক কি ভাবে বর্ণনা করা যায় তুষার জানে না। তবু যদি বর্ণনা করতেই হয়, তুষার বলবে, বুঝলি শিশির, তোদের জ্যোতিদাকে মিশনের সাধুটাধু মনে হয়।

প্রকৃতপক্ষে জ্যোতিবাবুকে তেমন করে কেউ দেখে না। জ্যোতিবাবু কোনো উঁচু জায়গায় চড়ে নেই। খুব সাধারণ সরল কাজের মানুষ। অথচ এই মানুষটিকে কখনও অন্তরঙ্গ ভাবা যায় না, উপায় নেই ভাবার। কেন?

বোধ হয়, তুষার ভাবল, বোধ হয় জগতে এই রকম কিছু মানুষ থাকে, যারা আত্মীয়তা ও প্রীতি সম্পর্কের নাগালের মধ্যে থাকলেও

শ্রদ্ধা-সম্মানের পাত্র হলেও, কোন আশ্চর্য কারণে ঘনিষ্ঠ হতে পারে না।

আদিত্য এবং জ্যোতির তুলনা তুষারের এই মুহূর্তে মনে পড়ল। আকস্মিক ভাবেই।

এদের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। তুষার মনে মনে ভাবল, দুই মূর্তিকে দু পাশে দাঁড় করিয়ে যেন দেখল অল্পক্ষণ, তারপর অপ্রসন্ন বোধ করল।

'দিদি—'শিশির কথা বলল।

তুষার তখনও ভাবছিল। অন্যমনস্ক চোখে শিশিরের দিকে তাকাল। শিশিরকে এখন কেমন ছায়ার সঙ্গে জ্যোৎস্না মেশান ছবির মতন দেখাচ্ছে। চাঁদের আলো যে কখন জানলা দিয়ে আরও এগিয়ে বিছানায় এসেছে, কখন যে শিশির সেই আলোর দিকে সরে বসেছে তুষার জানে না। সে খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। এখন খেয়াল হল।

'তোদের পুজোর ছুটি কবে হচ্ছে রে?' শিশির শুধলো।

'জানি না।' তুষার জবাব দিল। 'কেন—?'

'জিজ্ঞেস করছি।'

'হবে শীঘ্রি। পুজোর ত আর দেরী নেই।'

'ছুটি একটু আগে আগে হলে ভাল হয়। বাড়িটায় এবার চুনকাম করা দরকার। দেখছিস না দেওয়াল-টেওয়ালগুলো কেমন হলদে হয়ে যাচ্ছে।'

তুষার দেওয়ালের দিকে তাকাল। লণ্ঠনের অপ্রচুর আলোয় চারপাশটাই আবছা হয়ে আছে, অন্ধকারই বেশী, দেওয়ালগুলো কালো ছায়ার মতন দেখাচ্ছে।

'তোর ছুটি না থাকলে হবে না—!' শিশির বলল।

গলার হারটায় তুষার অযথা আঙুল দিয়ে ঘষছিল। শিশিরের পায়ের কাছে চাঁদের আলো সাদা লোমঅলা পোষা বেড়ালের মতন

যেন ঘুমিয়ে আছে। তুষার অকস্মাৎ অনুভব করল, তার চারপাশে কেমন বেদনার নীরবতা। নিরানন্দের একটি জগতে তারা দুই ভাইবোনে বসে আছে। তারা দেওয়ালে চুনকামের কথা ভাবছে। তারা তাদের গৃহবাসকে হলুদ মলিন বিবর্ণ হয়ে আসছে দেখে উজ্জ্বল করে তোলার প্রয়োজন অনুভব করছে। কিন্তু তা কি সম্ভব?

সহসা বাইরে সাইকেলের ঘন্টি বাজল। চমকে উঠল তুষার। কান পেতে থাকল। তার বুকের শব্দ ইষৎ দ্রুত, নিশ্বাস অনিয়মিত। কপালে সামান্য উষ্ণতা অনুভব করছিল।

তুষার মনে মনে স্থির করল, আদিত্যকে সে আজ বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেবে না। রূঢ় এবং নিস্পৃহ আচরণ দেখাবে। মানুষটা সহজ সৌজন্যের সুযোগে অনেক বেশী মাথায় উঠেছে। না, তুষার আর ওই লোকটিকে ছেলেমানুষ ভেবে, কৌতুক অনুভব করে, অকারণে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ দেবে না!

বিছানা ছেড়ে ওঠার জন্যে যেন তুষার অপেক্ষা করতে লাগল। আদিত্যকে স্পষ্ট করে তুষার আজ বলে দেবে, সন্ধ্যে বেলায় আমার কাজ থাকে, গল্প করার সময় আমার কই। আপনি বরং অন্য কোথাও...

বাগানে কোনো শব্দ হল না। সাইকেলের ঘন্টি আরও দূরে বার কয়েক বেজে বেজে আর বাজল না। তুষার বুঝতে পারল, আদিত্য নয়। রাস্তা দিয়ে কেউ চলে গেল।

তুষারের উচিত ছিল স্বস্তি অনুভব করা, কিন্তু তুষার স্বস্তি পাচ্ছিল না।

দশ

আশাদির ঘরে তুষার কাপড় বদলাচ্ছিল। বাইরের দরজা ভেজানো, ঘরের ভেতর দিকের দরজা খোলা। আশাদি স্নানের ঘরে স্নান করছে, জলের শব্দ ভেসে আসছিল। খোলা জানালার পরদা

দিয়ে মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল রোদ অনুভব করা যায়। বাইরে একটা ঘুঘু অনবরত ডেকে যাচ্ছে। এই ঘর নিস্তব্ধ। তুষার আঁচলটা গায়ে টেনে নিয়ে বেতের মোড়া টেনে বসল, চুল ঠিক করে নেবে। চিরুনি হাতে উঠিয়ে, আশাদির ছোট আয়নায় নিজের মুখ দেখে তুষার একটুক্ষণ চেয়ে থাকল। তার চোখের সাদা জমির কোনে যেন লালের ছিট লেগেছে। বেশী জল ঘাঁটার জন্যে, নাকি সাবানের ফেনায়, অথবা রোদ লেগে এই লালটুকু হয়েছে, তুষার বুঝতে পারল না। আজ সে খুব জল ঘেঁটেছে, অনেকক্ষণ ধরে স্নান করেছে। মাথাটা কেমন ভাব ধরা-ধরা হয়েছিল সকাল থেকেই, রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি। যেন ঘুমের মোটা সর কোনো কারণে দুধের সরের মতন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। সকালে বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে করছিল না, বাসের হর্ন শুনে উঠেছে। আজ তার তৈরী হয়ে বেরুতে বেশ দেরী হয়ে গেছে।

চিরুনি বসিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়তে তুষার অনুভব করল, তার চুল মাথা এখন খুব ঠাণ্ডা। ভাত খাবার পর সমস্ত গা ঘুমের আলস্যে জড়িয়ে ধরবে। ঘুম পাবে খুব।

খাওয়া দাওয়ার পর ছেলেমেয়েগুলোর খানিকক্ষণ শুয়ে থাকার কথা। যা দস্যি সব, শোয় না, ঘুমোয় না—চুপ করেও থাকে না। কেউ লুডো খেলে, কেউ স্নেক ল্যাডার; নয়ত মাঠে ছুটবে, টেনিস বল নিয়ে ফুটবল খেলবে। আজ ওদের শাস্ত করতে পারলে তুষার নিজের ছোট ফালি-ঘরে গিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে নেবে একটু।

টেনে টেনে চুল আঁচড়াচ্ছিল তুষার। এলো চুলই থাকবে। একটা গিট দিয়ে নেবে দু পাশের দু গুচ্ছ চুল এনে। রোজই তাই করে। সারা দুপুর বিকেলে চুল শুকোয়, বাড়ি ফিরে তবে বিনুনি বা খোঁপা বেঁধে নেয়।

পুজোর ছুটির জন্যে আজ সকাল থেকেই তুষার কেমন ছেলে-মানুষদের মতন কাতর হচ্ছিল, আনমনা হয়ে যাচ্ছিল। পুজো খুব কাছে। আর বুঝি বিশ বাইশটা দিন। এখানে আকাশ যেন

অপরাজিতা ফুলের পাপড়ির আগার মতন বেগুনে-নীল, কী নির্মল নয়ন জোড়ানো, হালকা তুলোর মেঘ কোথাও কোথাও রোদে গা ভাসিয়ে শুয়ে আছে. রোদের রং সোনার মতন, বর্ষার শেষে গাছ-পালা মাঠ সবুজ, সবুজে রোদ পড়ে সর্বত্র একটি আভা ঠিকরে উঠেছে। আর এই বাতাস বার বার শরতের সেই সুগন্ধ এনে দিচ্ছে।

তুষার আজ শিশুতীর্থ আসার পথে বাইরে প্রকৃতি দেখতে দেখতে অনুভব করল, তার মন এখন সব দায় দায়িত্ব ভুলে গিয়ে নিভৃত বিরাম চাইছে। প্রত্যহের এই পুনরাবৃত্তি থেকে কিঞ্চিত বিরাম।

আশাদি বারান্দায়, তার গলার আওয়াজ শোনা গেল। মনে মনে কথা বলে আশাদি, অথচ সে কথা উচ্চস্বর হয়ে ওঠে। তুষার শুনল শুনল না, তার কানে ভাসা ভাসা ভাব একটা কথা গেল শুধু, মলিনা ··।

সামান্য পরেই আশাদি ঘরে এল। আলগা অগুছালো শাড়িতে আশাদিকে বউ বউ দেখাচ্ছে। আয়নার এক পাশে চোখ করে তুষার আশাদিকে দেখল। তার হাসি পাচ্ছিল, মজা লাগছিল দেখতে।

'তোর চুল আঁচড়ানো হল?' আশাদি বললেন।

হ্যাঁ। হয়েছে।' বলে তুষার আয়না থেকে মুখ সরিয়ে ঘাড় ফেরাল।

গা থেকে শাড়ির আঁচল আলগা করে আশাদি সেমিজের ওপর জামা পরছিল।

'আশাদি?'

'বল।'

'তুমি রঙীন শাড়ি পড়ে বাইরে যাও না কেন?' তুষার শুধলো।

হাত গলিয়ে জামা গায়ে পরে নিয়ে আশাদি তুষারের দিকে না তাকিয়ে বলল, 'সেফটিপিন দেত।'

তুষার উঠে নিজের বেতের টুকরি থেকে চাবির গোছা বের

করল। চাবির রিঙে দু একটা সেফটিপিন থাকে।

আশাদির হাতে সেফটিপিন দিয়ে তুষার আবার বলল, 'রঙীন শাড়িতে তোমায় বেশ দেখায়, আশাদি।'

জামায় সেফটিপিন আঁটকে আশাদি মুখ তুলে তুষারকে দু পলক দেখল। চোখের তলায় সকৌতুক হাসি সামান্য। আয়নারদিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আমাদের কি রঙীন শাড়ি পরার বয়েস আছে রে! বুড়ি হয়ে গেলাম।' নিজের চিরুনি খুঁজে নিয়ে আশাদি চুল আঁচড়াতে বসল।

তার চিরুনিটা পরিষ্কার করে জানালা দিয়ে ওঠা-চুলের গুচ্ছটা ফেলে দিচ্ছিল তুষার। আদিত্যকে দেখতে পেল। রান্নাঘরের দিকে গাছতলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে মলিনার সঙ্গে। যেমন করে মানুষ রেল স্টেশনের গাড়ি দেখে, সরল কৌতূহলে, তুষার সেই ভাবে আদিত্যদের দেখল। দেখে জালালা থেকে সরে এল।

'তোমার যা কথা—' তুষার আশাদির বিছানার পায়ের কাছে বসল, 'সত্যি তুমি রঙীন শাড়ি মাঝে মাঝে প'রো, আশাদি: বেশ দেখায়।'

'কেমন দেখায় শুনি।'

'আ-হা। কেমন আর? ভাল।' তুষার হাসল। 'বাড়িতে' যেমন বউদি-টউদিদের দেখায়।'

'খুব।' আশাদি মোড়া ঘুরিয়ে তুষারের মুখোমুখি বসল, চুল আঁচড়াতে লাগল, 'তোর দেখি খুব সাধ।'

'ওমা, সাধ কিসের।' তুষার বোধ হয় সামান্য অপ্রস্তুত, 'দেখতে ভাল লাগে তাই বললাম।'

চুলের প্রান্ত বুকের কাছে এনে জটের বাধা ছাড়াতে ছাড়াতে আশাদি বলল, 'ভাল লাগলেই কি সব করা যায়!' বলে দু মুহূর্ত থামল, আবার বলল, 'রঙীন পরতে আমার বড় লজ্জা করে রে। পরি না ত। এই ঘরে কাপড়-চোপড় ছাড়তে বা বিকেলে পরতে হয়। ঘরে চলে। বাইরে নয়।'

তুষার বুঝে পাচ্ছিল না, ঘরে যদি পরা যায় বাইরে নয় কেন? কিসের বাধা?

আশাদি কি ভেবে বলল, 'এই শাড়িটাও কি সাধে পরেছি।... কাল বিকেলে মলিনা একটা শাড়ি চাইল। দিলাম বাক্স খুলে। তখনই এটায় চোখ পড়ল। কবেকার কেনা জানিস, ছ বছর আগে। বাঙলা দেশ ছাড়া এ-শাড়ি তুই পাবি না। পরতে ইচ্ছে হল খুব। হাজার হোক মেয়েমানুষ ত রে...' আশাদি হেসে উঠল, 'শাড়ির লোভ বড় লোভ। কাল সন্ধ্যেবেলায় পরেছিলাম।'

তুষার শুনছিল। মলিনার কথায় আবার তার আদিত্যের কথা মনে পড়ল। এখনও কি ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে গাছতলায়? তুষারের ইচ্ছে হল, একবার উঠে গিয়ে দেখে। দেখল না।

তুষার আঁচড়ানো শেষ করে আশাদি মুখ মুছে নিল। এখন যেতে হবে। শাড়িটা বদলে নিলেও চলত, কিন্তু তুষারের জন্যেই যেন, বদলাল না আশাদি; খেয়ে এসে বদলালেই চলবে।

'তুষার?'

'বলো'

'একটা কথা বলি, তোকে।' আশাদি এলো আঁচলের প্রান্ত কাঁধে উঠিয়ে নিল। 'জ্যোতিবাবুর আস্কারায় মলিনা যা করছে আজকাল, চোখে লাগে বাপু আমাদের।'

'কি করছে মলিনা?' তুষার তাকাল, তাকিয়ে থাকল অপলকে।

'কাল সন্ধ্যের গোড়ায় মলিনা ওই আদিত্যের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে গেল—ফিরল যখন তখন আমরা খেতে বসেছি। কী বিচ্ছিরী লাগে দেখতে বলত!' আশাদি অনুযোগের গলায় বলল।।

তুষার যেন কেমন হতবুদ্ধি হল। কথাটা বুঝেও না-বোঝার মতন করে বসে থাকল।

'এখানে এ-সব ছিল না।...আমি বলছি না এতে কিছু মন্দ

আছে, তুষার। কিন্তু মানুষের চোখ বলে একটা জিনিস আছে। দৃষ্টিকটু লাগে। লাগত না, যদি ওরা এখানে আশেপাশে কোথাও ঘুরে বেড়ান অত রাত না করত।' আশাদি যে বেশ অসন্তুষ্ট, ব্যাপারটা পছন্দ করে নি বোঝা যাচ্ছিল।

খুবই আচমকা তুষার কেমন বিরক্তি অনুভব করল, রাগ হয়ত।' বলল, 'এতে জ্যোতিবাবুর দোষ কোথায় ?'

'দোষ দিচ্ছি না আমি, বলছি। জ্যোতিবাবু মলিনাকে প্রশ্রয় দেন যথেষ্ট। নয়ত এ-রকম সাহস মলিনার হত না।'

'মলিনার নিজেরই বোঝা উচিত।' তুষার বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বলল।

'কে বুঝবে ! কোনো জ্ঞান-গম্যি আছে তার।' আশাদি এবার রাগের গলায় বলল, 'এখানে ওকে দিয়ে কাজ চলে না। যে স্বভাব মন ওর নয়। জ্যোতিবাবু ভাবেন, ওকে তৈরী করে নেবেন। তৈরী হবার মতন মেয়ে ও নয়। সে জোগ্যতা মলিনার নেই।' আশাদি উঠে পড়ল।

'চল খেয়ে আসি।' বাইরে বেরিয়ে দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিতে দিতে নীচু গলায় আশাদি বলল, 'আর ওই এক এসে জুড়ে বসেছে। যাবার নাম করে না।… তুই জানিস তুষার, একটা ঘোড়া কোথা থেকে এনে সাহেবদাদুর পুরোনো গাড়িটায় জুড়ে গাড়ি হাঁকাবার চেষ্টা করেছে। কাল ওই করতে গিয়ে মরত। যত বিদঘুটে কাণ্ড।'

তুষার নীরব। আশাদির বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মলিনার ঘরের দিকে তাকাল একবার, দরজা বন্ধ। মলিনা সকালেই স্নান করে নেয়, দুপুরে সে বড় একটা ঘরে আসে না। প্রয়োজন হয় না তার।

বাড়ির নীচে দু পাঁচ পা এগিয়ে একটা গাছ। বেশ বড়, লম্বা লম্বা পাতা। ওরা কেউ নাম জানে না গাছটার। বুনো কোনো বৃক্ষ।… ঘুঘুটা তখনও ডাকছিল। তুষার খাবার ঘরের দিকে

তাকাল। ছেলেমেয়েরা খেয়ে-দেয়ে চলে গেছে—ঝি এঁটো ফেলছে। এক খণ্ড দুধের মতন সাদা মেঘ চোখে পড়ল তুষারের। তার এখন আর কিছু ভাল লাগছিল না। অল্প আগে এই শরতের স্পর্শ মনকে হালকা আলস্য লোভী করেছিল। এখন সব বিরস লাগছে। ভাল লাগছে না। রোদের তাত মুখে লাগার মতন গাল কপাল তপ্ত লাগছে: তুষার খাবার ঘরের দিকে হেঁটে চলল।

খাবার ঘরে একপাশে মেয়েরা—আশাদি তুষার মলিনা; অন্য দিকে জ্যোতিবাবু প্রফুল্ল আর আদিত্য। মাটিতে বসে খেতে হয়। হাট থেকে কিনে আনা শালপাতার অভাব পড়ে না, পড়ে এনামেলের থালা বাটির। বাচ্চাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শালপাতা পেতে দিলে তারা খুব খুশী হয়। তুষারদের অবশ্য কাঁসার থালা কিন্তু বাটি গ্লাস এনামেলের।

ওরা পুরুষরা একদিকে মেয়েরা অন্যদিকে বসে খাচ্ছিল। খাবার ঘরের জানলাগুলো হাট করে খোলা, ডালিম গাছটা চোখে পড়ে। সিমেণ্ট করা মেঝেতে রোদের আভা আর নেই, ছায়া ছড়িয়ে আছে। ঘরটা নিরিবিলি; একটা কালো ভ্রমর এসে সমস্ত ঘরে গুঞ্জন তুলেছে; কখনও কখনও বাইরে থেকে দাসদাসীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

খাবার সময় সচরাচর মেয়েদের তরফে বড় একটা কথা হয় না; বা হলেও কোন খাবারটা কেমন হয়েছে তার জন্যে আশাদিকে হয়ত পুরুষপক্ষ থেকে কিছু বলা হয়। পুরুষদের দিকে মোটামুটি একটা কথাবার্তা থেকে যায়। মেয়েরা হয়ত খেতে খেতে সে কথায় কান দেয় কখনও, কখনও দেয় না।

আজ পুরুষদের দিকে আদিত্য অন্য দিনের চেয়েও বেশী কথা বলছিল। তার বলার বিষয়ের অভাব নেই, এবং ঈশ্বর তাকে লজ্জা সঙ্কোচ দেন নি। খেতে খেতে আদিত্য ঘোড়ার কথা বলছিল। বলছিল, এ দেশে ঘোড়ার আদর ছিল রাজপুতদের কাছে, মিঠাইভাল

যুগে। কারণ, সমস্ত রাজপুতনা আর তার আশপাশেও যে প্রকৃতি—সে প্রস্তুতি রুক্ষ নির্মম। সে মানুষকে বিশ্বাস করে নি, মানুষকে তার মাটিতে বসাতে চায় নি। চিরকাল সে বিমুখ ছিল—বিমুখতাই তার স্বভাব…

কথাগুলো জোরে জোরে বলছিল আদিত্য, বলতে বলতে তুষারের দিকে তাকাচ্ছিল। আদিত্যর কথা শুনতে ভাল লাগে। তার কথায় সব সময় হৃদয়ের আবেগ থাকে, সে ভাষায় অলঙ্কার দিয়ে কথা বলে, কিন্তু এ-কথা মনে হয় না, এ-সব বেখাপ্পা, এ-সব নাটুকে। ফলে আদিত্যর কথা সবাই শোনে। আজও শুনছিল।

রাজপুতরা কেমন করে তাদের প্রতি বিমুখ প্রকৃতিকে জয় করার জন্যে ঘোড়ার ভক্ত হয়েছিল, ঘোড়াকে খাতির যত্ন করতে শিখেছিল, আদিত্য তার এক বিবরণ দিল। বিবরণ দেওয়া শেষ হলে সে রাজপুত রাণাদের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘোড়ার নাম গুলো একে একে বলে গেল। তারপর থামল, থেমে হাসল হাহা করে, বলল, 'আমি এখানকার সব বিমুকতাকে জয় করব। বুঝলেন, জ্যোতি স্যার, সেই জন্যে একটা ঘোড়া আনিয়েছি।'

জ্যোতি স্যার কথাটা ঠাট্টা করে বলা। এইরকম ঠাট্টা আদিত্য করে থাকে। জ্যোতিবাবু রাগ করে কি? তুষার জানে না। মনে হয় না রাগ করে, রাগ করার মানুষ নয়।

আদিত্যের কথায় প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল বোধ হয়। ইঙ্গিত বলে মনে হওয়ার আরও কারণ, আদিত্য কথা বলতে বলতে প্রায়ই চোখ তুলে তুষারকে দেখছিল। তুষার লক্ষ্য করেছে।

খাওয়ার পর্ব তাড়াতাড়ি সারতে চাইছিল তুষার। তার ভাল লাগছিল না। আশাদির সঙ্গে কয়েকবার চোখাচুখি হল। মনে হল আশাদি বলছেন, বড্ড কথা বলে ভদ্রলোক, এত বাজে কথা মানুষ বলতেও পারে। তুষার মলিনাকে দেখল নজর করে, মলিনা যেন মুগ্ধ চিত্তে আদিত্যর বক্তৃতা শুনছে। কী বিশ্রী!

আদিত্য ঘোড়ার গল্প শেষ করে বলল, জ্যোতি-স্যার কি কখনও

ঘোড়দৌড়ের মাঠে গেছেন?'

'জ্যোতি মাথা নাড়ল। 'না।'

'রেস-এ বাজি ধরেন নি কখনো?'

'না।' জ্যোতি হাসি মুখে বলল।

'ছাটস্ এন এনজয়মেন্ট!…খুব থ্রি্লিং।' আদিত্য বলল, 'আমি বার দুই তিন গিয়েছি। একবার প্রায় টাকা চল্লিশেক জিতেছিলাম।'

'চল্লিশ টাকা।' মেয়েদের দিক থেকে মলিনা বলল। এমন আচমকা বলল যে, পুরুষরা সকলে তাকাল। আশাদি এবং তুষার পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। তুষারের মনে হল, মলিনা যেন তাদের এই তরফের আভিজাত্য সম্মান রুচি সব নষ্ট করে দিল।

'চল্লিশ টাকা জেতা কিছু নয়…' আদিত্য ও-তরফ থেকে বলল, 'যার লাক্ ফেবার করে সে চার হাজারও একদিনে জিততে পারে চোখের পলকে। ইট ইজ এ কোশ্চেন অফ লাক্!'

'জুয়া খেলা ভাল না—'প্রফুল্ল মিনমিনে গলায় বলল, 'মানুষে শুনেছি হারে বেশী, জেতে কম।'

আদিত্য হেসে উঠল। উচ্চস্বর সেই হাসির কোনো মাথা মুণ্ডু খুঁজে পেল না তুষার। আবার ঘরটা কি জুয়ার গল্পের আড্ডা হয়ে উঠল! বিরক্ত হয়ে তুষার হাত গুটিয়ে নিল। আশাদিও অসন্তুষ্ট। মলিনাকেই যা উৎসাহিত দেখা গেল, এই সব গল্প যেন তার খুব ভালই লাগছে।

হাসি থামলে আদিত্য প্রফুল্লকে উপলক্ষ করে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, আপনি মশাই শিশুশিক্ষার বইটই লিখুন, বেণীর গল্প গোপালের গল্প-টল্প, বিদ্যাসাগর মশাই মার খেয়ে যাবেন।…যা বললেন একটা কথা, জুয়া খেলা ভাল না, মানুষ হারে বেশী—জেতে কম!…আরে মশাই, সব খেলাতেই হারের আশংকা বেশী, আপনার কথাটাই ভেবে দেখুন না—উইন করেছেন নাকি, বেধড়ক হেরে যাচ্ছেন। তবু ত পড়ে আছেন মাটি কামড়ে। জীবনে জেতাটাও ভাগ্য! লেট আস হোপ ফর দি বেষ্ট—' বলতে বলতে আদিত্য

চোখ তুলে তুষারের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল।

তুষার মাথা তুলতেই সেই চোখ দেখতে পেল। তার অস্বস্তি হল, ঘৃণা হল। কি করে একটা লোক বার বার এ-ভাবে মেয়েদের দিকে তাকায়! তুষার এবার স্পষ্ট গলায় আশাদিকে বলল, 'আমি উঠছি, আশাদি।' অপেক্ষা করল না আর তুষার, এঁটো কুড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়ল। জ্যোতিবাবু যে তার দিকে তাকাল, তুষার দাঁড়িয়ে ওঠার পর তা লক্ষ্য করল।

দুপুরের আলস্য গভীর করে জড়িয়ে ধরেছে তুষারকে। নিজের ক্লাস ঘরের কুঠরিতে ক্যাম্বিসের চেয়ারে সে শুয়ে আছে। সামনে ফালি জানলা। শরতকালের এই দুপুর এখানে কী জারকে যেন জরে যাচ্ছে। সামনের মাঠটুকুতে ছায়ার কাপড় যেন শুকোতে দেওয়া হয়েছে, এক ছায়া থেকে অন্য ছায়ার মধ্যে রোদ, দুপুরের রোদ বলেই প্রখর মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, আর সম্মিলিত পক্ষকুলের বিচিত্র শব্দ কখনও নিকটে কখনও দূরান্ত থেকে ভেসে আসছে। পড়ার ঘরে ছেলেমেয়েগুলো খেলছে হয়ত, খেলা শেষ হলে আজ পাঁচটা ধাঁধা করবে। ধাঁধাগুলো তুষার ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিয়ে এসেছে। এই ধাঁধার মধ্যে একটা বানান সংক্রান্ত, একটা মহাভারতের, একটা ভূগোলের, আর বাকি দুটো অঙ্কের। ছেলেমেয়েরা খুব ভালবাসে এই ধাঁধা। তুষার জানে—ধাঁধার খেলা নিয়ে এক দেড় ঘণ্টা ওরা অনায়াসে কাটিয়ে দেবে। গোলমাল করবে না, বাইরে পালিয়ে যাবে না।

ক্যাম্বিসের চেয়ারে শুয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তুষার চোখের পাতা ক্রমে ছোট করে আনছিল, যেন কপালের কোথাও আলস্যজাত ঘুমের কাজল আছে, চোখের পাতায় ছুঁইয়ে নিতে পারলেই চোখ জুড়ে যাবে। ভাল লাগছিল ওর, শরীরের প্রতি অণু এই মধ্যদিনের পুঞ্জিত বিশ্রামের মধ্যে শিথিল হয়ে আসছিল।

তুষার ছুটির কথা ভাবছিল। পূজোর ছুটি যেন এখন থেকেই নেশার মতন টানছে। যত তাড়াতাড়ি ছুটি হয়, ততই ভাল। তুষার জানে না সেই ছুটি কেন তার এত কাম্য। তবু মনে হচ্ছে ছুটিটায় সে বিশ্রাম নেবে, এই প্রাত্যহিক কর্ম থেকে বিরতি, এক টানা কাজ থেকে খানিক ছুটি।

নিজেকে তুষার বাস্তবিক আজ ক'দিন ক্লান্ত অনুভব করছে। তার এমন চিন্তা—এই ক্লান্তি অনুভব আগে কখনও আসে নি। শরীর হয়ত ক্লান্ত লেগেছে, সে ক্লান্তি পরিশ্রমের, আসা যাওয়ার, দায় দায়িত্ব পালনের। আজ কাল যে ক্লান্তি অনুভব করছে তুষার —তা শরীরের, ঠিক শরীর জাত নয়, পরিশ্রমের জন্যেও নয়। মনের কোথাও যেন একটা ভাল না লাগার ভাব। উদাস ও অবসন্ন হওয়ার শূন্যতা বোধ করছে। কেন? এ-রকম কেন লাগবে তুষারের? তার শরীর কি ভাল যাচ্ছে না!

তন্দ্রায় চোখ জড়িয়ে তুষার ঘুমিয়ে পড়ছিল। আচমকা গলা শুনে চোখ খুলল তুষার। তন্দ্রার জড়তার মধ্যে আদিত্যকে দেখল। দেখেও যেন মনে করতে পারল না, ওই লোকটা সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ঘুমের চোখে তাকাল, আবার পাতা বুজল।

'বাঃ, দিব্যি ঘুমোচ্ছেন ত!' আদিত্য বলল।

তুষার ঘুমের বোজা চোখে ঠোঁটে যেন হাসল, ফিক করে সে দেখছিল না।

'মেয়েরা দুপুর বেলায় খানিক গা গড়িয়ে নেয় তা হলে—সে যে হোন!' আবার বলল আদিত্য।

চোখ মেলল তুষার। ফালি জানলার ওপাশে আদিত্য দাঁড়িয়ে আছে। ডান হাতের আঙুলে চোখের পাতা বুলিয়ে তুষার আবার দেখল। আদিত্য। তা হলে তন্দ্রায় বা ঘুমের জড়তায় নয়, সত্যি আদিত্যকে সামনে দেখছে তুষার। সঙ্গে সঙ্গে গায়ের কাপড় ঠিক করে ক্যাম্বিসের চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে, পিঠ উঁচু করে নিয়ে বসল তুষার। পায়ের দিকের কাপড় গুছিয়ে টেনে নিল। চোখের

দৃষ্টিতে বিরক্তি ফুটল।

'আপনি!' তুষার গলা তুলতে পারল না।

'দেখতে এলাম আপনাকে।' আদিত্য বলল, মুখে সেই হাসি, তুষার যে-হাসি অপছন্দ করে।

কথাটা কানে কটু শোনাল তুষারের। অভদ্র!

'আপনি কি মনে করেন?' তুষার খুব অপ্রসন্ন হলেও রাগ যথাসম্ভব সংযত করে বলল। বলে তিরস্কারের চোখে চেয়ে থাকল

আদিত্য জানলার কাছে আরও সরে এল দু পা—খাঁচায় বন্দী কোনো প্রাণীকে কৌতূহলে সকৌতুকে দেখছে—এমন চোখ কারও দেখল সামান্য সময়। বলল, 'আমি কিছুই মনে করতে পারছি না। আপনি বড় অদ্ভুত পদার্থ!'

'অদ্ভুত!'

রাগ করে খাওয়ার ঘর থেকে উঠে এলেন কেন?' আদিত্য স্পষ্ট গলায় জানতে চায়।

তুষার দু মুহূর্ত দেখলো আদিত্যকে, চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'রাগ! কিসের রাগ?'

'কি করে জানব। তবে আপনার মুখ দেখে মনে হল না আমার ওপর যথেষ্ট অনুরাগ দেখিয়ে উঠে এলেন।'

তুষারের কানে শব্দটা ভাল শোনাল না। মনের মধ্যে যেন কাঁকর পড়েছে—অনুরাগ শব্দটা সেই ভাবে অস্বস্তি জাগাল। বিরক্তস্বরে ও বলল 'আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল।

'বাজে কথা বলছেন কেন!'

'বাজে কথা—!'

আমার ওপর আপনার এত বিতৃষ্ণা কেন বলুন ত তুষার দিদমণি—আদিত্য হাস্যকর গলা করে বলল, যেন সত্যিই সে একটা কথা সরাসরি জানতে চাইছে।

তুষার জানলা দিয়ে তাকাল। আদিত্য প্রায় সবটুকু জানলাই

জুড়ে নিয়েছে। ওপাশের মাঠ বা গাছ আর দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না জ্যোতিবাবুর ঘরের বাইরের অংশ। কে কোথায় রয়েছে এখন, কে দেখছে, যদি তুষারের ঘরের সামনে আদিত্যকে এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কি ভাববে—ইত্যাদি চিন্তায় তুষার অস্বস্তি বোধ করল, বিব্রত হল।

'বিতৃষ্ণা সতৃষ্ণার কথা নয়—'তুষার চোখ নামিয়ে বলল, 'এখন বিশ্রামের সময়, আমি বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। আপনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না দয়া করে···, এটা—'তুষার কথা শেষ করতে পারল না।

আদিত্য গ্রাহ্য করল না। বরং আরও যেন দৃষ্টিকটু কাণ্ড করল, জানলার কাণা ধরে দাঁড়াল। 'সদা সত্য কথা বলিবে। কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিবে না।·· আপনি সাদামাটা সত্যি কথাটা বলে ফেলুন না. ঝঞ্ঝাট চুকে যায়'

কী বিরক্তিকর! মানুষটা কি কানে তুলো গুঁজে গায়ে গণ্ডারের চামড়া দিয়ে থাকে! কেন তুষারকে ও বার বার এমন করে অপ্রসন্ন বিরক্ত করে তুলতে চায় ভাল লাগে না তুষারের, সহ্য হয় না। বিশ্রী লাগে তুষারের, গায়ে যেন জ্বালা করে, মনে ঘৃণা আসে তুষারকে কি ও তার পরিহাসের পাত্রী পেয়েছে?

'আপনি এখান থেকে যান,।' তুষার শক্ত গলায় বলল। 'এটা গল্পগাছা করার জায়গা নয়।'

'কেউ দেখবে এই ভয় বোধ হয় আপনার!'

'দেখতে পারে।'

'দেখলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যবে?

'আমি পছন্দ করি না।'

'আমায় যে কেন আপনার এত অপছন্দ আমি বুঝে উঠতে পারি না। আমি আপনার কোনো ক্ষতি ক'র নি।·· হোয়াই স্যুড ইউ হেট্ মি? হোয়াই? অ্যাম আই এ লোফার?···কি, ব্যাপারটা কি? সরাসরি মন খুলে বলে দিন।'

আদিত্য এমন ভাবে জানলায় মধ্যে ঝুঁকে পড়ল যে, তুষারের মনে হল ও বোধ হয় গলে আসবে ফোকর দিয়ে। আসা কিছু অসম্ভব নয়, জানলাটায় গরাদ নেই, দু পাট খড়খড়ি শুধু। আর আদিত্যর পক্ষে সব সম্ভব। তুষার আরও বুঝল আদিত্য সত্যিই আহত হয়েছে, রেগেছে।

কি বলবে ভেবে পেল না তুষার। মাথায় কোনো আপাত-বুদ্ধি আসছিল না। সঙ্কুচিত আড়ষ্ট ভাব নিয়ে তুষার শরীরটাকে চেয়ারের পিছু দিকে টেনে নিল। বলল, 'ছেলেমানুষি করবেন না।… আমায় এবার উঠতে হবে।'

'উঠেই দেখুন—, একটা কেলেঙ্কারি করব।'

'মানে ?'

'চেঁচাব।'

'চেঁচাবেন—'

'চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সুর করে কবিতা আওড়াব। আপনার ঘরের সব ছেলেমেয়েকে যদি বাইরে বের করে আনতে না পারি ত কি! জাস্ট্ লাইক দি পাইপপাইপার অফ হ্যামেলিন। আমি বাঁশি বাজাতে বাজাতে যাব, আপনার ছেলেমেয়েরা নেঙটি ইঁদুরের মতন নাচতে নাচতে আমার সঙ্গে যাবে।…দেখতে চান ? আমি পারি।'

আদিত্য এমন ভাবে তাকিয়ে থাকল যেন সে তুষারের সঙ্গে এই নিয়ে একটা বাজি ধরতে চাইছে। তাকে খুব নিঃসন্দেহ দেখাছিল।

'না, থাক।' তুষার বিশ্বাস করল না এই পাগলকে। হয়ত পারবে না, হয়ত পারবে। পারুক না পারুক একটা দৃষ্টিকটু ব্যাপার ঘটবে যে তাতে তুষার নিঃসন্দেহ।

আদিত্য বিজয়ীর মত হাসল। বলল, 'তবে বসুন। এমন কিছু দেরী হয়ে যায় নি। এখন মাত্র দেড়টা।' হাতের ঘড়ি দেখল আদিত্য, দেখাল।

তুষার ভিজে চুলের গোছাটা পিঠে সরিয়ে দিল। কী বিপদেই পড়া গেল! এ মানুষ কেমন, তাড়ালে যায় না, বিরক্তি দেখালে গ্রাহ্য করে না, অপমান করলে মাখে না। আচ্ছা, ওকে কি সত্যি রূঢ় ভাবে অপমান করে দেখবে একবার তুষার, কি হয়! ও গায়ে মাখে কি মাখে না। তুষার চোখ তুলল, দেখল আদিত্যকে, কিছু বলতে পারল না। বলতে ইচ্ছে করল না।

'দেখুন দিদিমণি—' আদিত্য পরিহাস করে বলল, 'আমি স্ট্রেট ব্যাপারটা পছন্দ করি। যা করব পরিষ্কার। লুকোচুরি, মুখ আড়াল করে কথা বলা, আই হেট্ ইট।···সরাসরি বলে ফেলুন ত, আপনার চক্ষুশূল হবার মতন কারণটা কি ঘটিয়েছি?'

তুষার এই বিপদ থেকে আপাতত মুক্তি পেতে চায়। চায় বলেই কথা বাড়াবে না, মানুষটাকে শাসাবে না, বরং কেমন যেন আপোস করার ভাবই ভাল দেখাবে। তুষার অপ্রসন্নতা মুছে নেবার চেষ্টা করে বলল, 'কি যা তা বলছেন আপনি। কিসের চক্ষুশূল!'

'তবে?'

'কি তবে!'

'আমার সঙ্গে এ-রকম দুর্ব্যবহার কেন?'

'আমি কোনো দুর্ব্যবহার করি নি। কেনই বা করব!···এখানে আপনিও যা আমিও তাই।'

'পাগল।' আদিত্য ঘোরতর প্রতিবাদের ভান করল, 'আমি আউটসাইডার। আপনি ভেতরের লোক। আমার কাজ ভাঙার, লণ্ডভণ্ড করার—আপনার কাজ···কি বলে যেন···আপনার কাজ রক্ষণের, লালনের পালনের—' আদিত্য টেনে টেনে বলল, পরিহাসের গলায়।

'আপনি কি নিজেকে কালাপাহাড় ভেবে খুশী হন।' তুষারের গলার স্বর তার অজান্তে নরম কোমল ও সরস হয়ে এসেছিল।

'না। আমি নিজেকে কালাপাহাড় ভাবতে চাই না। লোকে আমায় ভেবে নেয়।'

'অন্যায় করে?'

'বোধ হয়।' আদিত্য অন্য দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক গলায় বলল। চুপ করে থাকল দু মুহূর্ত, আবার বলল, 'আমার চরিত্রে অনেক দোষ আছে, না কি বলুন?'

তুষার আবার অস্বস্তি বোধ করল। হ্যাঁ, আছে। কিন্তু তুষার কি তাই বলবে না কি! পাগল! কেউ কি বলে তা। কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্যে তুষার বলল, 'ও-সব কথা থাক। এখানে—'

'বলা যায় না বলছেন? বেশ তা হলে বাড়িতে যাব।'

'বাড়ি!' তুষার অস্ফুট গলায় বলে ফেলল।

'বারন করছেন যেতে?'

'না, না। সে কি…!' তুষার তার ছাত্রীদের মতন বিপর্যস্ত বোধ করে ঢোঁক গিলল।

'তা হলে কাল যাব।…' আদিত্যর গলা সরল, 'আজ একবার ঘোড়াটাকে গাড়িতে জুতে ট্রায়াল দিতে হবে। সাংঘাতিক বদমাস ঘোড়া! বাট, আই উইল মেক দ্যাট অ্যানিমাল বিহেভ প্রপারলি।'

বলতে বলতে আদিত্য বোধ হয় ঘোড়ার চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে জানলা থেকে সরে গেল। চলে গেল লম্বা লম্বা পা ফেলে।

জানলাটা এতক্ষণে আদিত্যের শরীরে আড়াল হয়ে ছিল। ও চলে গেলে আবার মাঠ ঘাস গাছ দেখা গেল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র চোখে পড়ল। চোখে পড়ল একটা হরিয়াল পাখিও।

তুষার জানালা দিয়ে তাকিয়ে অনুভব করল সে অনেকক্ষণ যেন নিশ্বাস বন্ধ করে ছিল। বুক ভারী লাগছে। দীর্ঘ করে নিশ্বাস ফেলল।

এগারো

বাড়ির বারান্দার কাছাকাছি আসতেই চমকে উঠল তুষার। আতা গাছটার পাশে সাইকেল। হেলান দিয়ে রাখা সাইকেলটার দিকে তাকিয়ে তুষার আর পা বাড়াতে পারল না। আদিত্য তা হলে এখনও অপেক্ষা করছে।

ভয় হল তুষারের। বাড়ির বাগানটা ছোট, গাছপালা প্রচুর নয়; চারদিকে সতর্ক চোখে তাকিয়ে আদিত্যকে খোঁজার চেষ্টা করল। তার ভয় হচ্ছিল; মনে হচ্ছিল; কোনো গাছপালার আড়াল থেকে আচমকা বেরিয়ে এসে আদিত্য তার সামনে দাঁড়াবে, বলবে—'এই রকম অভদ্রতা কেন, আমায় আসতে বলে বাড়ি থেকে পালানো?'

বাগানে কোথাও নেই আদিত্য, বারান্দাতেও নেই। তবে কোথায় গেল? চলে গেছে! চলে যাবে যদি তবে সাইকেল পড়ে থাকবে কেন? তাহলে কি তুষারকে না পেয়ে সাইকেল রেখে অন্য কোথাও ঘুরে আসতে গেছে? বোধ হয় তাই। আবার আসবে আদিত্য।

সামান্য সময় লেবুগাছের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে তুষার পা পা করে বারান্দার দিকে এগিয়ে চলল। আদিত্য আসবে জেনেও সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তুষার আশা করেছিল, বাড়ি এসে তাকে না পেয়ে আদিত্য ফিরে যাবে। ক্ষুণ্ণ হবে, রাগ করবে। তা হোক ক্ষুণ্ণ, তুষারের কিছু আসে যায় না। পরে দেখা হলে বলবে, আমায় একটা জরুরি কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল, কিছু মনে করবেন না।

প্রকৃতপক্ষে তুষার চায় নি, আদিত্য তার বাড়ি এসে আবার জ্বালাতন করুক। ওর উৎপাত সহ্য করা উচিত না; প্রত্যয় পেয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের মানুষকে একটু প্রশ্রয় দিলেই তারা

মাথায় ওঠে। বাস্তবিক, আদিত্যকে ছেলেমানুষ বা পাগল ভেবে নিতান্ত ভদ্রতা করে যেটুকু সহানুভূতি দেখিয়েছে তুষার তার পরিণাম এখন বিশ্রী হয়ে উঠেছে! সামলাতে পারছে না তুষার। আদিত্য যেন পেয়ে বয়েছে।

ইচ্ছে করে, জোর করে, আদিত্যকে দূরে সরাবার মতন কারণ তৈরী করার অন্যতম উপায় হিসাবে আজ তুষার বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সে জানত, আসব যখন বলেছে তখন আদিত্য আসবেই আর এলে সহজে মুক্তি দেবে না, লক্ষটা কথা বলবে জ্ঞানহীনের মতন। এমন অদ্ভুত কোনো অনুরোধ করে বসবে যা করা অশোভন, অযথা অনর্থক তুষারকে ক্রমাগত বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে…।

যারা অন্যের সহ্য অসহ্য বোঝে না—বুঝতে চায় না, যারা জানে না অন্যেরও ভালমন্দ লাগা আছে, ছোঁয়া পেলে আঠার মতন জড়িয়ে থাকতে চায়, ফুটে যাওয়া কাঁটার মতন যন্ত্রণা দেয়—তাদের কাছ থেকে রেহাই পেতে হলে এ-ছাড়া আর কি পথ আছে ঐ এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া, দূরে দূরে সরে থাকা বই?

কিন্তু, মানুষটা গেল কোথায়? তুষার বারান্দার সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়াল। চারপাশে তাকাল আবার, ভাল করে দেখল।

এমন ত নয়, তুষার ভাবল, আদিত্য চলেই গেছে, শুধু তুষারকে বিব্রত করতে ভয় দেখাতে সাইকেলটা রেখে গেছে?—হতে পারে; কিছুই আশ্চর্য নয়। বরং, তুষারের মনে হল, বরং আদিত্যর যা স্বভাব তাতে এই রকম বিশ্রী কিছু করাই তাকে মানায়। সে তোমায় উদ্বেগে রাখবে, দুশ্চিন্তা যাতে জিইয়ে থাকে তার চেষ্টা করবে, তোমায় ভীত ব্যস্ত পীড়িত করবে, ওতেই ওর আনন্দ।

কয়েক দিন আগে সেই রাত্রে আসব বলে শাশিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে তুষার দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘরের মধ্যে পা বাড়াল।

ঘর থেকে বারান্দা। রান্নাঘরে বাতি জ্বলছে। গঙ্গা রান্না নিয়ে

ব্যস্ত। বারান্দার একপাশে মিটমিটে বাতি। অন্ধকারে ডুবোনো দাওয়ায় দড়ির ওপর তুষারের ভিজে শাড়ি বাতাসে দুলছে। তুষার দু মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল, উঁচু মুখে আকাশ দেখল, তারার প্রশ্ন চিহ্নটা একেবারে চোখের সামনাসামনি।

গঙ্গাকে ডাকবে ভেবেছিল তুষার। না ডেকে শিশিরের ঘরের দিকে পা বাড়াল। শিশির বলতে পারবে, ওই মানুষটা কখন এসে ছিল? বাইরে থেকে চিৎকার করে কিছু বলে গেছে কিনা!

শিশিরের ঘরে পা দিয়ে তুষার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। না এগুতে না পিছিয়ে আসতে পারল। চোখের পাতা স্থির, অপরিসীম এক বিস্ময় তাকে বিমূঢ় করেছে। শিশিরের বিছানার ওপর দাবার ছক বিছানো, লণ্ঠনটা জানলার ওপর, দুজনে গালে হাত দিয়ে দাবার চাল ভাবছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে। আদিত্যের পিঠ দরজার দিকে।

তুষার এতটা প্রত্যাশা করেনি, কল্পনাও করে নি। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় শিশিরকে তার পালাবার কারণ পর্যন্ত না, বলেছিল আমি সুষমা বউদিদের বাড়ি যাচ্ছি রে, দরকার আছে! ফিরতে দেরী হবে।

দেরী হওয়ার কথাটা বলেছিল এই জন্যে যে, যদি আদিত্য খোঁজ নেয়, জানতে পারবে তুষারের ফেরার দেরী আছে, অপেক্ষা করবে না। অথচ তুষারের সমস্ত অভিসন্ধি আদিত্য ব্যর্থ করল।

এই বা কি রকম? আলাপ পরিচয় নেই শিশিরের সঙ্গে, তবু একটা বাইরের লোক সদর থেকে অন্দরে ঢুকে দিব্যি দাবা খেলছে বসে বসে। কোনো গা নেই, গ্রাহ্য নেই, সঙ্কোচ নেই। শিশিরই বা ওকে কেন ঘরে আসতে দিল!

তুষার একবার ভাবল, যেমন নিঃশব্দে সে এসেছে তেমনি নিঃশব্দে সে চলে যায়। আবার—বাইরে, বাড়ি ছেড়ে—কাছাকাছি কারও বাড়ি গিয়ে বসে থাকে। যদি রাত দশটা বাজে বাজুক, এগারোটা বেজে যায় তাতেও ক্ষতি নেই, আদিত্যকে দেখা না দিয়ে সে ফিরিয়ে দেবে। কতক্ষণ বসে থাকবে আদিত্য, কত সময় সে অপেক্ষা

করতে পারবে!

এখন ক'টা? আটটা বেজে গেছে বোধ হয়। তুষারের মনে হল, সে নিজেই বোকামি করেছে। তার আরও বেশীক্ষণ বাইরে থাকা উচিত ছিল। অথচ, বাইরে কেমন যেন সময় দীর্ঘ ও গত মনে হল, মনে হল রাত হয়ে গেছে, বাড়ি ফেরার ইচ্ছে ক্রমাগত তাকে অন্যমনস্ক করতে লাগল, সে ফিরে এল।

তুষার দুপা এগিয়ে এল। পালিয়ে গিয়ে লাভ নেই। আদিত্য, বলা যায় না সারারাতই বসে থাকতে পারে।

গলায় শব্দ করল তুষার। শিশির নৌকো চালতে ব্যস্ত, চোখ তুলল। 'দিদি।' বলল ওই যা, আবার চাল দিতে চোখ নামাল।

আদিত্য যেমন বসেছিল তেমনি, মুখ ঘাড় ফেরাল না। তুষার অবাক হল।

তুষারের আবির্ভাব ওদের দুজনকে বিচলিত বা অস্থিরচিত্ত করতে পেরেছে এমন লক্ষণ কোথাও দেখা গেল না। পায়ের মাপ আরও একটু বাড়াল তুষার, জানলার পাশে চায়ের কাপ পড়ে আছে, বোঝা যায়—দাবা-দাবা খেলার সুরুতে বা মধ্যে শিশির অতিথি আপ্যায়ন করেছে। তবে কি শিশিরই অতিথি বৎসল হয়ে আদিত্যকে ডাকিয়ে এনে ঘরে বসিয়েছে? শিশিরের ওপর রাগ হচ্ছিল তুষারের। সে যাকে এড়িয়ে যেতে চায় শিশির তাকে আদর করে ঘরে ঢোকায়। বাঁদর কোথাকার! কী বিশ্রী কাণ্ডটা বাঁধাল শিশির!

আদিত্য বিড় বিড় করে কি বলল আপন মনে, একটা চাল দিল, দিয়ে মাথা চুলকোলো। এবং পরের চাল ভাববার জন্যেই সিগারেট ধরাল।

রাগ হচ্ছিল তুষারের। কেন হচ্ছিল সে জানে না। দাবা খেলার জন্যে, নাকি তার দিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই দেখে! আদিত্য কি এখনও খেয়াল করতে পারছে না, তুষার ঘরে এসেছে?

ইচ্ছে করেই, যেন আদিত্যকে তার দাবার নেশা থেকে অন্যমনস্ক করে দেবার জন্যেই তুষার বিছানার মাথার দিকে—শিশিরের পাশে এগিয়ে গেল। 'কখন এলেন ?'

আদিত্য ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তুষারকে। 'এই যে! এসেছেন তা হলে।'

তুষার এমন ভাবে তাকাল, যার অর্থ সে বলত চাইছে, মানে—তা হলে এসেছেন মানে কি ?

শিশির আদিত্যর রাজা বেঁধে ফেলেছে। বলল, এবার সামলান।'

আদিত্য দাবার ছকের দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল কয়েক দণ্ড. বলল, 'হেরে গেলাম, ভাই।' বলে হাত বাড়িয়ে শিশিরের গাতে চাপ দিল।

হাসল শিশির। বলল, 'আপনার দুটো চাল আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। অনেক কষ্টে সামলেছি।'

'আমি সে কবে খেলে'ছ, চাল-ফাল ভুলে গেছি। তা ছাড়া ওই কনসেনট্রেসন- ওটা আর হয় না।'

'তা হলেও পাকা খেলোয়াড়ের মতন খেলেছেন।'

আদিত্য অট্টহাস্যে হাসল।

শিশির দিদিকে বসতে দিচ্ছে এমন ভাব করে সামান্য সরে গেল। তুষার বসল না।

আদিত্য এবার তুষারকে ভাল করে দেখল।

তারপর হাত ঘড়ি দেখে বলল, 'সাড়ে ছ'টায় এসেছি, এখন আটটা কুড়ি। খুব লোক আপনি।'

তুষার চোখে চোখে তাকাল আদিত্যর, লহমার জন্যে চোখ ফিরিয়ে শিশিরের দিকে রাখল। 'এক জায়গায় যেতে হল, দরকারি কাজ ছিল একটা।'...বলে তুষার সামান্য থামল, শিশিরের সামনে সমস্ত ব্যাপারটাকে সে শালীন স্বাভাবিক করতে চাইল, 'অনেকক্ষণ বসে আছেন তা হলে'—অপরাধ মার্জনা করুন গোছের ফিকে একটু

হাসি টানল মুখে। 'সময় ভালই কাটছিল দেখলাম!'

'ভালই।' আদিত্য জবাব দিল। 'আমায় কখনও বড় একটা জলে পড়তে হয় না।' কথা শেষ করে আদিত্য চোখের তারা এবং পাতায় যে ভাব দেখাল তাতে মনে হল, আদিত্য যেন বলছে, আমি এ-সব গ্রাহ্য করি না।

হয়ত আদিত্য তার ইচ্ছাকৃত অনুপস্থিতি বুঝতে পেরেছে, তুষার ভাবল। ভাবল, যদি বুঝে থাকে তবে বসে ছিল কেন? কেন ও ক্ষুব্ধ হচ্ছে না? অপমান বোধ করছে না?

'আপনার ভাইয়ের সঙ্গে অনেক গল্প হল।' আদিত্য বলল, শিশিরের দিকে সস্নেহের চোখে তাকাল, 'আমায় গান গাইতে বলছিল।'

'গান!' অস্ফুটে বলল তুষার, প্রথমে আদিত্য পরে শিশিরের দিকে তাকাল।

'সেই যে—' শিশির হেসে দিদিকে সেদিনের কথা মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করল, 'আমি পথ ভোলা এক পথিক…। আমি বলছিলাম, আপনার গান শুনেছি সেদিন, আপনাকে দেখি নি, আজ দেখলাম। বললাম একটা গান করুন, গলা ছেড়ে; গাইলেন না।' শিশির হাসছিল।

তুষার এই হাসি, এই জলের মত সাধাসিধে অন্তরঙ্গতা পছন্দ করছিল না। শিশিরের কাণ্ড জ্ঞান বড় কম। আদিত্যর কোনো কাণ্ডজ্ঞানই নেই। কি ভেবেছে লোকটা? শিশুতীর্থ থেকে বাড়ি, বাড়ি থেকে অন্দরমহল, ও কি ভেবেছে পা বাড়ালেই সব দরজা খুলে যাবে! না। দরজা খুলবে না।

মনে মনে ছটফট করলেও কিছু বলতে পারছিল না তুষার। শিশিরের কাছে দৃষ্টিকটু হয় এমন কিছু করা, শ্রুতিকটু হয়—এমন কিছু বলা যায় না। বিছানার মাথার দিকে অকারণে ঝুঁকে চাদরটা ঠিক করে হাতে হাতে ঝেড়ে দিল।

'একদিন তোমায় একটা ইংরিজী গান শোনাব।' আদিত্য হেসে

বলল শিশিরকে লক্ষ্য করে।

'ইংরিজী ?'

'খুব ভাল গান।···আই ওয়াক এ্যালোন···এ্যালোন, মাই ওয়ে ইজ···' কথাটা শেষ না করেই আদিত্য তুষারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও হো, আপনাকে বলি নি খবরটা। কাল ঘোড়া জুতে গাড়িটা চালিয়েছি।'

'কার গাড়ি!' শিশির অবাক হয়ে শুধলো।

'ওঁদের সাহেবদাদুর ভাঙা জঙ্গলের মধ্যে পড়েছিল, গাড়িটা ঠিক করলাম ঘোড়া জোগাড় করলাম—তারপর কাল ট্রায়েল দিলাম। ···এখনও বেশ রাফ রয়েছে ঘোড়াটা. আরও ট্রেইন করতে হবে। ···একদিন তোমায় বেড়াতে নিয়ে যাব। টমটমে চড়ে বেড়ান একটা প্লেজার।' আদিত্য উঠল। শিশিরের হাতে হাত দিয়ে বলল, 'চলি ভাই। আবার দেখা হবে।'

আদিত্য আগে পিছু পিছু তুষার ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বাইরে এসে আদিত্য বলল, 'আমার ভয়ে আপনি পালিয়ে গিয়ে বসেছিলেন।'

তুষার বারান্দার সিঁড়িতে, আদিত্য শেষ ধাপে নেমে দাঁড়িয়েছে। দেখল না তুষার, চোখ মুখ তুলে তাকাতে তার অস্বস্তি হচ্ছিল। নীচু গলায় বলতে গিয়ে কথাটা ঠিক মুখে আনতে পারল না।

আদিত্য বাগানে নামল। তার পায়ের চাপে কাঁকরে শব্দ উঠছিল। 'এ ধরনের লুকোচুরি খেলা আমার ভাল লাগে না।'

'লুকোচুরি!' তুষারের স্বর অস্পষ্ট।

'আমাকে আপনি সহ্য করতে পারেন না।'

'কই, না!' তুষার এমন একটা অবস্থার মধ্যে পড়বে জানলে বাড়ি ফিরত না. আরও রাত করত ; অনেক রাত।

'ন্যাকামি করছেন কেন!' আদিত্য ক্ষুব্ধ, সামান্য উত্তেজিত। তুষার বুঝতে পারছিল। আদিত্যর সন্দেহ নেই, তুষার আর পাঁচটা মেয়ের মতন ন্যাকামি করছে। তুষারের দিকে তাকিয়ে তিক্ত গলায়

আদিত্য বলল, 'আপনার অত ভয় কিসের। সত্যি কথা বলতে আটকাচ্ছে কেন ?'

তুষার অসন্তুষ্ট। তার রাগ হচ্ছিল। এই মানুষটা কি ভাবে তাকে ? ভদ্রতাকে সে ভয় ভাবে, শিষ্টতাকে ন্যাকামি ? তুমি কে, কি তোমার ব্যক্তিত্ব যে তুষার তোমায় ভয় পাবে !

আজ একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া হয়ে যাওয়া ভাল। রোজ ওর গায়ে পড়া ঘনিষ্ঠতা তুষারের ভাল লাগে না, ভাল লাগে না জোর জবরদস্তি, ইচ্ছাকৃত অবিবেচনা।

'মানুষকে বিরক্ত করা, উত্যক্ত করা আপনার স্বভাব।' তুষার চাপা রাগে বলল।

'আপনাকে আমি উত্যক্ত করি ?'

'করেন কি না-করেন আপনি জানেন '

'না। আমি জানি, আপনাকে আমার ভাল লাগে।'

রাগে তুষারের কপালের শিরা টাটিয়ে উঠল। কেমন করে কথা বলছে ও ? তুষার কি তার

'আমাকে, আপনি সহ্য করতে পারেন না, কিন্তু আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে।' আদিত্য আবার বলল। কোনো সঙ্কোচ নেই, স্বরে একটু সুরও নেই।

'কি লাগে না লাগে আমার শুনে লাভ নেই। আপনি যদি ঠিক মতন কথা বলতে না পারেন কথা বলবেন না।' তুষারের গলায় যেন কেউ শান দিয়ে মরচে তুলে ক্রমশ ধার ফুটিয়ে আনছে।

'আপনি এত অসহিষ্ণু কেন ?'

'সহিষ্ণু হবার কোন দরকার নেই আমার।'

'তা হলে এবার স্পষ্ট করেই বললেন— আদিত্য মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তুষারের দিকে তাকাল। 'ইউ হেট মি · ঘেন্না করেন!'

তুষার নীরব। তার ইচ্ছে হচ্ছিল, সোজা ঘরে চলে যায়। যাচ্ছিল না, যদি এখানে আজ একটা নিষ্পত্তি ঘটে যায়—যাক। প্রত্যহ এই পীড়ন তার ভাল লাগে না।

সামান্য অপেক্ষা করে আদিত্য দু পা এগিয়ে এল। সিঁড়ির প্রথম ধাপে তার একটা পা রাখল। 'আমাকে আপনি কি ভাবেন বাঁদর না হনুমান?'

তুষার নীরব। কথা বলতেও ইচ্ছে করছিল না।

'আপনাকে উত্যক্ত করা আমার চাকরি নয়।...ভাল লাগত বলে আসতাম।' তুমুহূর্ত থেকে আদিত্য হাত তুলিয়ে কেমন এমন একটা ভঙ্গি করল, বলল, 'হ্যাকাবোকা ছেলেদের মতন আমি মেয়েদের কাছে আসতে শিখিনি।...দূরে দূরে থাকলে. আপনার ছায়ার দিকে তাকিয়ে হু হা করলে আপনি ভাবতেন আহা, বড় ভালবাসে আমায় ও।' আদিত্য পাগলের মতন বলছিল, বলার সময় তার গলার স্বর প্রচণ্ড লাগছিল এবং মনে হচ্ছিল সে এক একটা শব্দকে বিকৃত করে ঠাট্টা করে আরও হাস্যকর করে তুলছে। 'আমি এই ধরনের সাবুবার্লি খাওয়া প্রেম করতে দেখেছি। আই হেট ইট। আমার কিছু আসে যায় না। হ্যাঁ, আপনার মতন আমারও কিছু যায় আসে না। আপনি ভাবছেন, আমায় খুব ঠোক্কর দিলেন! খুব শিক্ষা দিলেন আমায়! আমি গ্রাহ্য করি না। পরোয়া করি না। বুঝলেন তুষারদিদিমণি, আমার চরিত্র আলাদা। ভালবাসা না পেলে আমি মরে যাই না।' বলতে বলতে আদিত্য সিঁড়ির ওপর তুষারের গায়ের কাছে এসে পড়ল। এবং পরক্ষণেই হাত ধরে ফেলল, তুষার বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে, আদিত্য বলল, 'আমার ভালবাসা ওয়েল ড্রেসড্ নয়, সিভিলাইজড্ নয়, কিন্তু সেটা বাঁদর হনুমানের মতনও নয়। আপনি যেমন ভাবে দেখলে আহ্লাদিত হতেন—বিহ্বল হয়ে পড়তেন তেমন করে আসতে পারি নি।...কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমার ভাল লাগে।'

তুষার জোর করে হাত টেনে নিল। সর্বাঙ্গ তার জ্বালা করছে। রাগ ক্ষোভ লজ্জা ঘৃণায় তুষারের মনে হচ্ছিল, লোকটার গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বলে, চলে যান এখান থেকে। অভদ্র ইতর কোথাকার!

আদিত্যর কি হয়েছিল কে জানে, তুষার হাত টেনে নিলে সে হাসল, হো হো করে হাসতে লাগল, অপ্রকৃতিস্থের মতন। হাসি থামলে দেখল তুষার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ বলল 'বাড়ির ভেতর চিরকাল থাকতে পারবেন না দিদিমণি, একদিন বাইরে আসতে হবে। তখন দেখবেন আমি নেই।'

তুষার কথাগুলো শুনল কি শুনল না—বোঝা গেল না। ঘরে চলে গেল। দরজা বন্ধ করল।

আদিত্য দাঁড়িয়ে থাকল অল্পক্ষণ। সিঁড়ি থেকে নামল, ওপাশে যাতায়াতের কাছে গিয়ে সাইকেলটা নিল। তারপর সাইকেল ঠেলে বাগান পেরিয়ে যেতে যেতে তার দীর্ঘশ্বাস সে নিজের কানে শুনল। দাঁড়াল। আবার দীর্ঘ করে শ্বাস ফেলল। আবার কান পেতে শুনল। আপন মনে বলল, সো সিল এ হার্ট, নেভার নোজ লাভ্, লাভ দ্যাট ইজ অ্যান আর্ট।

বারো

আদিত্যর স্বভাব দেখে তুষার কয়েক দিন পরে আবার মনে মনে হাসল। নিতান্ত অবোধ হলে কি এই রকম হয়। যখন রাগল তখন সে-রাগ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, কোনো মাত্রা মানল না, এলোমেলো বাতাস পাওয়া শিখা ওঠা আগুনের হলকার মতন তার ক্রোধের হলকা চারপাশে যা পারল তার গায়ে ছোবল দিল, তারপর কখন সব আবার শান্ত হয়ে গেল। আঁচ বা আগুন আছে তাও মনে হবে না। অবোধে এই ভাবে রাগ করে, দপ্ করে জ্বলে ওঠে, খানিক পরেই আবার নিভে যায়।

ছেলে মানুষের রাগ। তার জ্বলতে যতক্ষণ নিবতেও ততক্ষণ। তুষার ভেবেছিল, আদিত্যর শিক্ষা হয়ে গেছে, মানুষটা আহত ক্ষুব্ধ

অপমানিত হয়ে আক্রোশে রাগে যা বলার সব বলেছে, এবার নিজেকে সরিয়ে ফেলবে. তুষারকে আর উত্যক্ত করতে আসবে না।

দু তিনটে দিন ওই রকম হয়েছিল। শিশুতীর্থে ওরা সামনা-সামনি পড়ে গেছে, প্রায়ই, খাবার ঘরে নিয়মিত মুখোমুখি বসে দু দলকেই খেতে হয়েছে, আদিত্য কোনো রকম অশোভনতা করে নি। বরং তুষার লক্ষ্য করেছে, তার মনে চাপা রাগও যে আছে আদিত্য তাও প্রকাশ করত না। মুখ বুজে থাকার পাত্র আদিত্য নয়, মুখ বুজে থাকেও নি, তবু তার অতিরিক্ত চঞ্চলতাও যেন এ কদিন কোনো অসুখে ভুগছিল, তেমন করে প্রকট হত না।

এরই মধ্যে তুষার কখনও দেখেছে আদিত্য আর মলিনা গল্প করছে গাছতলায় দাঁড়িয়ে, কখনও দেখেছে জ্যোতিবাবু একা কোথাও বসে আছেন, কখনও বা তুষার কান পেতে শুনে নিয়েছে, মলিনা আদিত্যর কাছে থেকে গান শিখে দুপুরে স্নান করতে এসে নিজের ঘরে চুল খুলতে খুলতে সেই গান গাইছে। মলিনার ওই গানের গলায় 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি',—শুনে তুষারের হাসি পেয়েছে। ভেবেছে, যেমন মাস্টার তেমনি ছাত্রী। কিন্তু এও ঠিক, তুষার আদিত্যর গলায় আচমকা যতটুকু শুনেছিল গানটা, তাতে মনে হয় নি আদিত্যর গলার স্বর খারাপ। মলিনার গলায় কিন্তু সত্যিই বিশ্রী শুনিয়েছিল, অত্যন্ত বিশ্রী।

এমনি করে কয়েকটা দিন কাটল। শরতের যাওয়া পথে মেঘ আবার দল জুটিয়ে দুটো দিন তুমুল বর্ষা নামাল। শিশুতীর্থ বন্ধ থাকল, স্কুটর গাড়ি পাঁচ মাইল পথ এই আসা যাওয়ার ধকল সইতে পারল না। তারপর আবার রোদ উঠল, মেঘের সমস্ত ময়লা যেন কেউ আকাশ থেকে ঝাঁট দিয়ে নিয়ে গেছে, তকতকে পরিষ্কার আকাশটা আর নীল, রোদের আভায় অপরূপ উজ্জ্বল।

পরশু মহালয়া। শিশুতীর্থ এখন শিশুস্বর্গ। ছেলেমেয়েগুলো বই খাতা পত্র আর ছোঁবে না, ঘরেও ঢুকবে না। সমস্ত মাঠ ভরে শুধু তাদের কলরব আর ছোটাছুটি, খেলা আর চাঞ্চল্য।

প্রতিবার মহালয়ার দিন এই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে কাছাকাছি একটা জায়গায় গিয়ে চড়ুইভাতি করতে হয়। এখন একটা আর শীতে আর একটা।

জ্যোতিবাবু আর আশাদি চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করতে মত্ত। সাহেবদাত্থর শরীর আজ ক'দিন সামান্য ভাল যাচ্ছে বলে তিনি ইতির হাত ধরে বাড়ির সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন. ছেলেমেয়েদের ডেকে নিজেই এক একটা অবাক খেলার নিয়ম শিখিয়ে দিচ্ছেন, ওপাশেই যেন বাচ্ছাকাচ্চাদের ভিড় বেশী, প্রফুল্ল নুটুর গাড়ি নিয়ে বাজার হাট করতে ছুটছে শহরে, আর মলিনা আদিত্যর ছায়ায় ছায়ায় ঘুরছে।

তুষারের কিছু অন্য কাজ ছিল। এ-কাজ খানিকটা অফিসের কাজও, মাসখানেকেরও বেশী বন্ধ থাকবে শিশুতীর্থ। এই বন্ধের মধ্যে ক্লাস ঘরগুলোর তদারকির ব্যবস্থা, জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা। টাকা পত্র দেওয়া থোওয়া, কয়েকটা ছোটখাটো হিসেব—এই রকম আরও কিছু।

কাগজপত্র নিয়ে কাজ করতে বসে তুষার দেখল, আদিত্য তার দু মাসের পাওয়া সরকারী মাইনের প্রায় সবটাই এখানে জমা রেখে দিয়েছে। টাকাটা তার আজ কালের মধ্যে নিয়ে নেওয়া উচিত, মহালয়ার পরও অবশ্য দুচার দিনের মধ্যে নিতে পারে, না নিলে এই হিসেব পত্রর খাতা বন্ধ হয়ে যাবে, ছুটির মধ্যে কে আবার হাঙ্গামা করবে!

তুষার আরও দেখল, জ্যোতিবাবুর সই করা চিট-এ মলিনা তার মাইনের অতিরিক্ত শ দেড়েক টাকা আগাম নিয়েছে। দেখল, আদিত্যর নামে-আসা একটা চিঠি, তার জবাবও। আদিত্য পুজোর ছুটির আগে চলে যাচ্ছে, তার এখানের কাজ শেষ।

একটানা ঘণ্টা দুই কাজ করে তুষার উঠে পড়ল। বেলা হয়েছে। এগারোটা বাজে প্রায়।

সাহেবদাত্থ বারান্দায় বসে বিশ্রাম করছেন। স্নান করতে যাবেন। ইতি কাঠের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার বুঝি স্নান সারা হয়ে

গেছে, মাথার চুল এলো। ঘন বেগুনি রঙের শাড়ি পরেছে ইতি। কেমন বড় বড় লাগছিল দেখতে। তুষার আসতে গিয়ে কি ভেবে সাহেবদাদুর দিকে এগিয়ে গেল।

বারান্দায় উঠতে গিয়ে ইতির সঙ্গে চোখাচুখি। তুষার হাসল 'কি রে! তোকে বড্ড বড় দেখাচ্ছে'

ইতি লজ্জায় হাসল। 'রঙটা ভাল না তুষারদি?'

'খুব সুন্দর।'

'তোমার মতন ফরসা রঙ হলে আরও মানাত।'

'তুই কি কালো নাকি?'

'শাড়িটা আমায় আশাদি কিনে দিয়েছে।' ইতি বলল, 'পুজোর জন্যে।'

তুষারের খেয়াল হল, ইতির জন্য তাকেও একটা শাড়ি কিনতে হবে। আগে আগে তুষার জামা করে দিত, আজকাল ইতি বেশীর ভাগ শাড়ি পরে, শাড়িই কিনতে হবে এবার।

ইতিকে ওরা সবাই দেয়, জ্যোতিবাবু, আশাদি, তুষার, প্রফুল্ল মলিনা নয়। মলিনাটা যেন কি! কাণ্ডজ্ঞান নেই।

বারান্দায় উঠে সাহেবদাদুর মুখোমুখি দাঁড়াল তুষার।

'কি খবর? কাজ হল?' সাহেবদাদু প্রশান্ত মুখ তাকালেন।

'হ্যাঁ, অনেকটা।' তুষার সাহেবদাদুর চোখে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। দু মুহূর্ত নীরব থাকল, সাহেবদাদুর কপালে ঘাম ফুটে আছে, তুষার বিনীত গলায় বলল, 'ওই টাকাটার কি হবে?'

'কোন টাকা?'

'আদিত্যবাবুর! উনি তুলে না নিলে হিসেব গোলমাল হবে।'

'নেয় নি টাকাটা? আমি ত আগেও বলেছি ওকে।' সাহেব-দাদু যেন সামান্য চিন্তিত হলেন, কি ভাবলেন অল্প সময়, বললেন, 'টাকাটা সরাসরি ওকে পাঠালেই পারে, আমাদের হাত দিয়ে ঘুরে যাবার যে কী দরকার আমি জানি না।...টাকাটা ওকে ডেকে দিয়ে

যাও।'

তুষার ঘাড় কাত করল। দিয়ে দেবে।

'তুষার—'

'আজ্ঞে।'

'আমার চিঠিপত্রের মধ্যে একটা ড্রাফট পাবে। ব্যাংক ড্রাফট। জ্যোতিকে বলো ছুটির আগেই যাতে ভাঙিয়ে আনে। তোমাদের হাতে এখন কিছু না দিলে আমার খারাপ লাগবে।'

মলিন করে হাসল তুষার। 'আমায় দিতে হবে না।'

'কেন? তোমার কি জমিদারী আছে?' সাহেবদাদু তাকিয়ে থাকলেন।

'আমার দরকার হলে আমি নিই।'

'এবারে না হয় এমনিই নাও।···সবাই মিলে তোমরা নাও, ওই ছেলেটিকেও দিয়ো।···'

তুষার কোনো কথা বলল না। বলার প্রয়োজন ছিল না। সাহেবদাদু এমনি মানুষ। পুজোর আগে সবাইকে কিছু কিছু টাকা দিতে না পারলে তাঁর শান্তি নেই। এই টাকাটা হয়ত কর্জ করে এনেছেন, হয়ত তাঁর কোনো পুরোনো সম্পত্তি বেচেছেন—কি করেছেন কোনদিন জানতে পারবে না। তবু তিনি দেবেন, না দিয়ে স্বস্তি পাবেন না।

;ষার চলে আসার জন্যে ফিরে দাঁড়াল। হাত নেমে রোদে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহেবদাদু আচমকা বললেন, 'তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব, তুষার। ক'দিনই ভাবছি।' তুষার দাঁড়াল।

ইশারায় তুষারকে আরও একটু কাছে ডাকলেন সাহেবদাদু, তুষার পাশে এসে দাঁড়াল। খানিকটা সময় পরিপূর্ণ নীরব থাকলেন সাহেবদাদু, খুব যেন আত্মমগ্ন। শেষে মৃদুস্বরে বললেন, 'আমার আয়ু আর বেশী দিন নয়; আজকাল প্রায়ই রাত্রে দিকে বুকের মধ্যে কেমন করে। এমনিতেও বুঝতে পারছি, যাওয়ার দিন এল।'

এমন শারদ দিনে, এই পুঞ্জিত রৌদ্র আর উদ্ভাসিত পূর্ব মধ্যাহ্নে

সাহেবদাদুর শান্ত অথচ বিষন্ন আলাপ তুষারের ভাল লাগছিল না। তুষার বিষণ্ণ বোধ করল। সাহেবদাদুর চোখের দিকে তাকাতে পারল না। মনে হল, হয়ত সেই আসন্ন দুঃখকে সাহেবদাদুর মুখে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে।

অস্বস্তি বোধ করে তুষার বলল, 'আপনি যত অমঙ্গল ভাবেন।'

'অমঙ্গল ভাবি! যা সত্যি তাই ভাবা কি অমঙ্গল?' সুন্দর একটু হাসি সাহেবদাদুর ঠোঁটে, যেন এই হাসি তুষারকে বলছে, ওরে এমনি করেই ত যেতে হয়।

তুষার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাক টানল, গায়ের আঁচল অকারণে নাড়ল, তারপর কয়েক পলকের জন্যে সাহেবদাদুর মুখ দেখল।

'আমার ভাবনা ইতিকে নিয়ে;' সাহেবদাদুর বললেন নিশ্বাস ফেলে, 'ও আর ওর মাসির কাছে যাবে না। এই শিশুতীর্থের বাইরে ওকে পাঠানো মুশকিল। আমি বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছি, তুষার। ওর একটা ব্যবস্থা করে যেতে পারলে শান্তি পেতাম!'

'আর একটু বড় হোক, আমাদের সঙ্গে কাজ করবে।' তুষার সহজ সাধারণভাবে বলল, সরল পথ দেখিয়ে দিল।

'তোমরা কি চিরটা কাল এখানে কাটাবে, তুষার—!' সাহেব-দাদু চোখ স্থির রেখে তাকিয়ে থাকলেন, মুহূর্ত কয় পরে বললেন, 'আমি তোমাদের জীবনের সব নিতে পারি না। জ্যোতি হয়ত পারবে, আশাও পারতে পারে—কিন্তু তোমরা পারবে না।··· তোমাদের নিজেদেরও একটা জীবন আছে, শুধু শিশুতীর্থে পড়ে থাকলে চলবে কেন!'

'আমরা ত ভালই আছি।' তুষার আড়ষ্ট গলায় বলল। সাহেবদাদুর কথা সে বুঝতে পেরেছে।

'মেয়েদের ভাল সব দিক তাকিয়ে ভাবতে হয়···' সাহেবদাদু বললেন, জ্যোতির কথা ধরো; সে পুরুষমানুষ। এই শিশুতীর্থের দায় নিয়ে তার আজীবন কেটে যেতে পারে। তার যদি সংসার করতে ইচ্ছে হয়, আটকাবে না কোথাও; কাজের সঙ্গে সংসারের

বিরোধ হবে না। কিন্তু মেয়ে হলে কি পারত?'

আশাদির কথা তুষারের মনে হল। ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে আশাদি ত মেয়ে, সেও কি পারবে না! কথাটা তুষার বলল না; সাহেবদাদু আশাদিকে বোধ হয় সংসারের সাধারণ পথ থেকে পাশে সরিয়ে রেখেছেন। কেন? আশাদির একটু বয়স হয়ে গেছে বলে। বয়স হয়ে গেলে কি মেয়েরা বিধবার মতন হয়ে যায়। মেয়েদের বয়সও কি এক ধরনের বৈধব্য। তুষারের চোখে আশাদির রঙীন শাড়ি-পরা সেদিনের চেহারাটা ভাসছিল। দুঃখ হচ্ছিল তুষারের। দুঃখ হচ্ছিল, আশাদি নিজেকে বুড়ি সাজিয়ে রেখেছে বলে।

সাহেবদাদু বললেন, 'ইতির জন্যে আমার বড় ভাবনা, তুষার তোমাদের ভরসা ছাড়া ওকে আর কোথায় বা রাখব, অথচ তোমাদের ঘাড়ে এই দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে যেতেও ইচ্ছে করে না।'

তুষার নীরব থাকল। সাহেবদাদুর দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা সে অগ্রাহ্য করতে পারল না। সাহেবদাদুর অবর্তমানে ইতির দায় দায়িত্ব কে নেবে? জ্যোতিবাবু? জ্যোতিবাবু কি পারবেন? আশাদিও কি ওই মেয়ের সব ভাল মন্দের ভার আজীবন বইতে পারবে?...তুষারের কেমন আচমকা মনে হল, মেয়েদের দায় বয়ে নিয়ে যাওয়া বড় কঠিন। অকূল নদীতে যাত্রী চাপিয়ে নৌকা বয়ে যাওয়ার মতন। কোনো স্থিরতা নেই, নির্দিষ্ট চিহ্ন নেই যে ততটুকুই পৌঁছে দেবে। এই সমস্যা তুষারকে এখন কেমন বিহ্বল করল।

'একটি অল্প বয়সী ভাল ছেলে পেলে আমি ইতির বিয়ে দিয়ে দিতাম।' সাহেবদাদু বললেন হঠাৎ।

তুষার চমকে উঠল। 'এত অল্প বয়সে!'

'যোলো বছর। খুব কম আর কোথায়!' সাহেবদাদু চিন্তিত মুখে বললেন, ইতি বলে এটাই ভাল হত, তুষার।......যাক্ তোমায় বলা থাকল। তেমন কোনো খবর পেলে আমায় একটু জানিয়ো।'

বেলা বাড়ছে। তুষার অল্প সময় দাঁড়িয়ে থেকে মাঠে নামল
তি তখনও রোদে। মাথার চুল শুকিয়ে নিচ্ছে। তুষার দাঁড়িয়ে
াল করে আরও একবার দেখল ইতিকে। বেশ বাড়ন্ত দেখায়।
বু মুখের আদলে সেই কচি ভাবটা রয়ে গেছে ইতির। ওকে
ায়ে দিলে কেমন দেখাবে, ভাবতে তুষারের সকৌতুক হাসি
পল।

তুষারদি—'ইতি কাছে এসে দাঁড়াল তুষারকে দেখতে পেয়ে।

তুষার স্নেহের চোখে দেখছিল। ইতির গায়ের রঙ যেমনই হোক,
খ বড় মিষ্টি। নাক লম্বা পাতলা, ভুরু সরু, ঠোঁট পাতলা। এক
'খা চুল। তুষারের বড় ভাল লাগছিল দেখতে।

'আজ তুমি যখন বাড়ি যাবে আমি একটু কাপড় দিয়ে দেব।'
তি বলল।

'কিসের কাপড় ?'

'জামার। তুমি কেটে এনে দিয়ো, আমি সেলাই করে নেব।'

'আমি সেলাই করতে পারি না ?' তুষার হাসিমুখে বলল।

'তুমি ত কত ভাল পার! না, অত কাজের মধ্যে আব সেলাই
রে দিতে হবে না তোমায়। আমি হাতে সেলাই করে নেব।'

'কাপড়টা তা হলে যাবার সময় দিয়ে দিস।"

মাথা নাড়ল ইতি, দিয়ে দেবে কাপড়টা।

তুষার আশাদির বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

সাহেবদাত্বর কথা ভাবছিল তুষার। ভেবে অবাক হচ্ছিল। যে-
াক পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় এসে, কোন পাহাড়ের কোলে, বুড়ো
যসে একটা স্কুল খুলে বসতে সাহস পেলেন, তিনি আজ একফোঁটা
ায়ের জন্যে কোনো ভরসা খুঁজে পাচ্ছেন না। ইতির বিয়ে দেওয়ার
ন্যে সাহেবদাত্বর এত দুশ্চিন্তা কেন। শিশুতীর্থ যতকাল আছে
তদিন ইতির আশ্রয় আছে, ভাল মন্দ দেখার লোকও আছে। তবু
াহেবদাত্ব কেন এত ভাবছেন ?

শিশুগাছের ছায়ায় তুষার একটু দাঁড়াল অনেকটা দূরে

আদিত্য। তুষার আদিত্যের টাকাটার কথা ভাবল। আজ আদিত্যকে বলতে হবে, টাকাটা আপনি তুলে নিন, আমার হিসেব রাখতে গোলমাল হচ্ছে।

আঁচলের আগায় গলা কপাল আলতো করে মুছে তুষার হাঁটতে লাগল।

ইতির জন্যে সাহেবদাদুর ভাবনা যেন বেশী বেশী। এই বয়সে একটা বিয়ে দিয়ে দিলেই কি সব সমস্যা ঘুচে যাবে। সাহেবদাদুর মনের অন্য দিকের জানলাগুলো যতই খোলা থাক—এ-দিকে, তুষারের মনে হল, এদিকের জানলাটা কিন্তু বন্ধ। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়াকেই তিনি নিরাপদ বলে ভেবে নিয়েছেন। একটি পুরুষের হাতে একটি মেয়েকে সমর্পণ করলেই কি মেয়ের জীবনের সব সমস্যা মিটে যায়! তুষার স্বীকার করল, এতে মেয়েদের একটা আশ্রয় জোটে, বল-ভরসাও, কিন্তু সংসারে কি ইতির মাত্র সেইটুকুই প্রয়োজন? যদি তাই হয়, তবে ইতির আশ্রয়ের অভাব ত শিশুতীর্থে নেই, ইতির সুখ দুঃখের ভাবনা ভাববার লোক ত রয়েছে শিশুতীর্থে—জ্যোতিবাবু, আশাদি, তুষার নিজেই। তবে?

এ-সব ভাঙা যুক্তি, সাধারণ কথাবার্তা তুষারের পছন্দ হল না। সাহেবদাদু অত সামান্য বুদ্ধির মানুষ নন। ইতির মাথায় যে ছাদ থাকবে, ইতির দেখাশোনা করার লোক যে আছে তিনি নিশ্চয় জানেন। তবু বিয়ের কথা ভাবেন যে, তার কারণ আছে। কারণটা তুষার অস্পষ্টভাবে অনুমান করতে পারছিল।

তুষার ভাবছিল, যাকে সোজা কথায় আশ্রয় বলা হয়—, যাকে দায় দায়িত্ব ভার বলা হয়, তেমন আশ্রয় বা দায় দায়িত্ব বয়ে বেড়ানোর লোক মেয়েদের জীবনে অন্য ভাবেও জুটতে পারে কিন্তু কোনো মেয়ের জীবন হয়ত এতে সম্পূর্ণভাবে আশ্রিত বা নিরাপদ, নিশ্চিন্ত অথবা নিরুদ্বিগ্ন থাকে না। ঘরবাড়ি খাওয়া পরার ভাবনা আপদ বিপদে দেখার লোক—এ-সব সাংসারিক প্রয়োজনের পরও নিশ্চয় মেয়েদের জীবনে অন্য প্রয়োজনও আছে। সেটা

কি ?

সেটা কি, তুষার ভাল করে ভাবতে পারছিল না। তবে অনুভব করতে পারছিল, ইতির যদি আজ বিয়ে হয়ে যায়. ইতি শুধু তার স্বামীর বাড়িতে থাকার, স্বামীর ছায়ায় নিশ্চিন্ত হবার, তাহার বিহারের সুযোগ পাবে না -- তার বেশী—অনেক কিছু বেশী— হয়ত সেই জিনসই পাবে, যাকে আমরা নিজের সুখ বলি। বা, তুষার ভাবল, হয়ত এই পাওয়াতে মেয়েদের এমন কোনো প্রাপ্তি আছে যা গভীর, যা পূর্ণ। হয়ত ইতিকে সাহেবদাদু এমন কোনো মানুষের হাতে দিয়ে যেতে চান - যার চেয়ে ঘনিষ্ঠ, যার চেয়ে অধিক আত্মীয়, যায় চেয়ে ইতির সমস্ত মন প্রাণ সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্খার বেশী অন্য কেউ হতে পারবে না। সমস্ত জীবনের মতন ইতি তাকে পাবে , পাবে মৃত্যু পর্যন্ত।

ভাবনাটা তুষারের অনুভূতিকে কেমন রোমাঞ্চিত করল। যেন এই ভাবনার অজ্ঞেয় তাপ হৃদয়কে উষ্ণ ও কামনার্ত করল।

তুষার থমকে দাঁড়াল। সামনে আদিত্য। চোখ তুলে আদিত্যকে দেখল তুষার। এ ক'দিন তুষার আদিত্যর পাশ কাটিয়েছে। আদিত্যও তাকে উত্যক্ত করতে আসে নি। আজ তুষার কি মনে করে সৌজন্যোচিত হাসি আনল মুখে।

আদিত্য হাসল না। তাকিয়ে থাকল।

'আপনার টাকাটা নিয়ে নেবেন আজ।' তুষার বলল।

'টাকা। কিসের টাকা ?'

'খেয়ালও নেই আপনার !' তুষার চোখ ভরে আদিত্যকে দেখল, 'আপনার মাইনের টাকা। আমাদের কাছে পড়ে আছে।'

'কত টাকা ?'

'আপনার হিসেব নেই !'

'না। কিছু টাকা আমি নিয়েছিলাম।'

'চারশো প্রায়।'

'শ খানেক আমায় দিয়ে দেবেন।'

'মানে—!' তুষার বিস্মিত হয়ে চোখ তুলল। 'সবটাই ত আপনার টাকা।'

'জানি। আমার শ খানেক হলেই চলবে। পুজোর পর রাঁচির দিকে একটা স্কুলে যাব। মিশনারি স্কুল। কোনো খরচা নেই।' আদিত্য ধাঁধার মতন বলছিল, 'আমায় একশোটা টাকা দিয়ে দেবেন।'

তুষার কিছু বুঝতে পারছিল না। মানুষটা পাগলামি করছে। বাকি টাকা কি ওর জন্যে জমা করে নিয়ে বসে থাকবে তুষার! 'বাকি টাকা?' তুষার প্রশ্ন করল।

'দান করে দিলাম।' অবহেলার গলায় বলল আদিত্য।

'দা-ন!'

'ডোনেশান।···দুতিনটে গরু কিনে নেবেন টাকাটায়।'

'গরু!' তুষার বিস্মিত।

'গরু ভাল জিনিস। একটা গোয়ালঘর করে রেখে দেবেন। দুধ টুধ হবে—বাচ্চাদের খাওয়াবেন।' আদিত্য ঠাট্টা করছিল না, নাকি বিদ্রূপ, অথবা সত্যিই সে গরু কেনার প্রস্তাব দিচ্ছিল, তুষার কিছু বুঝতে পারল না। আদিত্য আবার বলল, 'মিলক্ ইজ গুড্ ফর হেল্থ।' বলে হাসতে লাগল।

তুষার বুঝতে পারল সমস্তটাই বিদ্রূপ। রাগ হল তুষারের। বলল, 'এখানে কি ব্যবস্থা করা হবে তার ভাবনা আমরা ভাবব।'

আদিত্য কথাটা শুনল, গ্রাহ্য করল না। বলল, 'টাকাটা সত্যিই আমি আপনাদের ফাণ্ডে দিলাম। আমার এখন প্রয়োজন নেই।··· গরু না কিনতে চান কিনবেন না, যা খুশি করবেন।'

আদিত্য দু হাত মাথার ওপর তুলে আলস্য ভাঙল। হাই তুলল। 'কাল একেবারে ঘুম হয় নি। আজ দুপুরে একটু ঘুমোতে হবে। চলি।'

চলে গেল আদিত্য। তুষার দাঁড়িয়ে থাকল। লোকটা কি সত্যিই তিনশো টাকা দান করে দিল! খেয়াল না কি? লোক

দেখানো দম্ভ। দম্ভ হলে এতদিন কেন টাকাটা দেয় নি!

তুষার আবার আশাদির বাড়ির দিকে হাঁটতে সুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে মনে হল, মানুষটা বোধ হয় কিছুটা ছেলেমানুষ, কিছুটা খেয়ালী। না, ওর কোনো দম্ভ নেই। অথচ দম্ভ দেখালে বেমানান হত না। যতই তুমি অপছন্দ কর, তবু এ-কথা স্বীকার না করে উপায় নেই, ও বিদেশ ঘুরেছে এই শিক্ষাপদ্ধতি দেখে বেড়াতে ও না জানে এমন বিষয় বোধ হয় শিশুশিক্ষার মধ্যে নেই। লোকটাকে অশিক্ষিত বলা চলে না।

কয়েক পা এগিয়ে এসে তুষারের হঠাৎ মনে হল আচ্ছা—আদিত্য, সাহেবদাদু যদি আদিত্যের সঙ্গে ইতির বিয়ে দেন, কেমন হয়! বয়সে একটু যেন বেমানান, কিন্তু স্বভাবে কি খুব বেমানান হবে! দুজনেই ছেলেমানুষ।

কথাটা ভাবতে তুষারের কেমন ভীষণ হাসি পেল। আদিত্য ইতির স্বামী ইতি আদিত্যের স্ত্রী। আর তখন, আদিত্য শিশু তীর্থ-র সর্বেসর্বা। তার ধমকে, তার কথা মতন তুষারদের চলতে হবে।

আদিত্য তখন নিশ্চয় তুষারকে আর কাজ করতে দেবে না। তাড়িয়ে দেবে। তুষারের ওপর গায়ের জ্বালা কি তখন না মিটিয়ে পারবে আদিত্য!

এই কাল্পনিক অকারণ চিন্তা তুষারকে কেমন ম্রিয়মাণ করল। তার ভাল লাগল না ভাবতে। আদিত্যকে ইতির স্বামী হিসেবে যেন তুষার পছন্দ করতে পারল না।

তেরো

শিশুতীর্থ বন্ধ হয়েছে। পূজোর ছুটির বন্ধ। জ্যোতিবাবু আর আশাদির এখনও ছুটি হয় নি। যে ছেলেগুলো শিশুতীর্থ-র মধ্যে থাকে তাদের বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছে ওরা।

কাছাকাছি জায়গার ছেলে ওরা—বিশ পঁচিশ মাইলের মধ্যে বাড়ি; এক একটা দল করে ট্রেনে রোড বাসে পৌঁছে দিতে হচ্ছে কচি-গুলোকে। দু'তিনদিনের মধ্যে শিশুতীর্থ খালি হয়ে যাবে, থাকার মধ্যে সাহেবদাদু, ইতি, আশাদি আর দু একজন ঝি চাকর আর মুটু।

ছুটি সুরু হবার পর চারটে দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। এবার আশ্বিন শেষ করে পূজো। অর্থাৎ এই পূজো কেটে গেলেই কার্তিকের গোড়ায় হেমন্তকাল শীতের ছোঁয়া দিতে আসবে।

তুষার কটা দিন ঘরবাড়ি প রষ্কার করল। পূজোর আগে প্রতিবার তার এই এক খাটুনি। সমস্ত বাড়ি, প্রতিটি জিনিস নিজের হাতে পরিচ্ছন্ন করবে। শিশির বলছিল বলে, এই ঘরদোর ধোওয়া মোছার সঙ্গে অন্য খাটুনিও জুটল চুনকাম করানোর হাঙ্গামা।

বা ড় ঘর তকতকে করিয়ে তুষার যখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, তখন বোধনের বাজনা বেজে উঠেছে।

সকালে চা খেতে খেতে শিশির বলল, 'তুই না তোদের শিশুতীর্থতে যাবি বলছিলি একবার।'

'হ্যা রে, একবার যেতে হবে। আজ ষষ্ঠি হয়ে গেল। ইতিকে কাপড়টা দিয়ে আসতে হবে পূজোর।'

'যাবি কি করে?' শিশির শুধলো।

'তাইত ভাবছি।'

'কালও মুটু এসেছিল, ওর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই পারতিস।'

মুটু এত দিন তার গাড়ি নিয়ে রোজই এসেছে। জ্যোতিবাবু আর আশাদি ছেলেদের পৌঁছতে যাচ্ছে, ফিরছে; মুটুর গাড়িও তাই যাচ্ছে আসছে। কাল শেষবারের মতন এসে গেছে মুটুর গাড়ি; আজ আসবে কি না কে জানে। তুষারের খেয়াল ছিল কালকেও কিন্তু মুটুর হাত দিয়ে ইতিকে পূজোর শাড়ি পাঠাতে তার মন চায় নি। তা ছাড়া তুষার সাহেবদাদুর জন্যে একজোড়া কার্পেটের চটি বুনেছে অনেকদিন থেকে, ইচ্ছে ছিল এবারে নিজে

গিয়ে সাহেবদ.ত্বকে দিয়ে আসবে।

মুট্টর গাড়ি অবশ্য শহরে আবার আসবে। ইতিকে আশাদিকে মুট শহরের ঠাকুর দেখাতে নিয়ে আসবে। কিন্তু সে কি আর আজ আসবে ? এলেও তখন ইতিকে কিছু দেওয়া ভাল দেখাবে না।

'কবে কিনেছি—' তুষার আপন মনে বলল, 'নিয়ে যাব যাব করে ভুলে গেলাম।'

শিশির হাসল বলল, 'তোর দেওয়ার ইচ্ছে নেই বলেই অত ভুল।'

'বাজে কথা বলিস না।

'বাজে কথা কেন ? শাড়ি তোবও খুব পছন্দ ছিল রে !' শিশির হাসছিল।

'তাতে কি, পছন্দ হতেই পারে। তা বলে ইতির নাম করে কিনে আমি নিজে নেব।'

'আমি তার কি জানি ! তুই-ই বলছিলি।'

'হ্যাঁ বলছিলাম। তোর মুণ্ডু।'

কথাটা খুব অসত্য নয়। মেতিপাতা বাটলে যেমন রঙ হয়, তেমনি লাল রঙের লম্বা ডুরে দেওয়া একটা শাড়ি ইতির জন্যে কিনেছিল তুষার। কিন্তু শাড়িটা তার নিজেরই পছন্দ ছিল। শিশিরকে দেখাবার সময় বলেছিল, 'শাড়িটা আমায় কেমন মানাবে বলত। শিশির রঙ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, দিদির গায়ের রঙের সঙ্গে যে চমৎকার মানাবে তাতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না; শিশির বলেছিল, 'তোকে ওয়াণ্ডারফুল মানাবে।'

তুষারের মন দীন নয়, তবু আশ্চর্য যে, তুষার সহসা যেন এই সুন্দর শাড়িটা নিজের জন্যে রাখার লোভ করেছিল। বলেছিল, 'ইতির জন্যে তবে অন্য একটা আনতে হয়।'

মনে মনে তুষার কি এই দ্বিধাবশত শাড়িটা ইতির জন্যে নিয়ে যেতে ভুলে যাচ্ছিল ! তুষার কি অকস্মাৎ কোনো কারণে নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়েছে ? না। তুষার পরে মাথা

নেড়েছে, এবং তার এই ছেলেমানুষি লোভ ও চিত্ত দীনতাকে শাস
করে নিয়েছে।

'একটা উপায় বল ত।' তুষার ভাইয়ের কাছে পরামর্শ চাইল

শিশির ভাবল। বলল, তুই না ছেলেবেলায় একবার সাইকেল
চড়া শিখেছিলি।'

'ইয়ার্কি করিস না—' তুষার রাগ করে বলল।

'তবে হেঁটে যা।'

'খুব বললি'।

শিশির নীরব হল। তার মাথায় এমন কোনো বুদ্ধি এল না
যাতে দিদিকে নিশ্চিন্ত করতে পারে।

তুষার ভাইয়ের ঘাড়ে যেন সব দোষটা চাপাবার চেষ্টা করে বলল
'তোর জন্যেই এ রকম হল।'

'আমার জন্যে!'

'না ত কি! একদিন শুধু ঘর দোর পরিষ্কার, চুনকাম করানো
—এ সব দেখতে গিয়ে আর সময় পেলাম কই। নয়ত নুটুর সঙ্গে
গিয়ে কাজটা সেরে আসতাম।' তুষার কিছুটা ক্ষুণ্ণ যেন।

শিশির বলল, 'দেখ দিদি, তুই এক কাজ কর। পোষ্ট অফিসের
কাছে যতীনের বাড়ি। যতীনকে গিয়ে বল, ব্যবস্থা করে দেবে।'

তুষার যতীনকে চেনে। শিশিরের বন্ধু যতীন। কাঠগোলার
মালিকের ছেলে। মাঝে মাঝে তাদের জিপ গাড়ি বন জঙ্গলে যায়
কাট কাটা তদারক করতে। তুষার বললে যতীন যে একটা ব্যবস্থা
করে দেবে তাতে সন্দেহ নেই। সামন্য নিশ্চিন্ত হল তুষার।

আরও একটু বেলায় তুষার যতীনদের কাঠগোলায় গেল
যতীন নেই কাজে বেরিয়েছে, ফিরতে দুপুর হবে। তুষার ফিরে
এল।

নুটুর গাড়ি আজ আসবে না। যদি আসার হত সকালেই
আসত। বিকেলে কি আর আসবে। জ্যোতিবাবু বাড়ি আসবেন
আজ বিকেলেই হয়ত, কিন্তু তিনি সাইকেল নিয়ে আসবেন, গাড়ি

নিয়ে নিশ্চয় নয়। তুষার ভেবে দেখল, তার পক্ষে অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই। যদি কোনো কাজে কর্মে নুটু এসে পড়ে গাড়িটা নিয়ে ভাল, নয়ত কাল যখন ইতি আর আশাদিকে নিয়ে নুটু ঠাকুর দেখাতে আসবে তখনই যাবে তুষার। উপায় কি!

আজ দুপুরটা অজস্র সময় আর কর্মহীন অবসর নিয়ে এসেছিল। তুষার অনুভব করল তার চারপাশে অফুরন্ত আলস্য দীঘির মতন বিবাজ করছে। এখানে শরৎ কাল বাঙলা দেশের মতন নয়, কিন্তু এই শরৎ আরও শুষ্ক, শীতের মিশেল দেওয়া। রোদ ঠিক্‌রে আছে, আকাশ সুনীল, বাতাস মৃদু ও শীতল। বাগানে কয়েকটা প্রজাপতি আপন মনে উড়ছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ তুষার এই দুপুরকে অনুভব করল। আজ অনেকটা বেলায় সে মাথা ঘষেছে, চুলগুলে এখনও সামান্য ভিজে। রোদে দাঁড়িয়ে তুষার চুল শুকিয়েছে যতট পেরেছে, তারপর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি, রোদটা কপালে লাগছিল। তা ছাড়া, আরও কিছু যেন লাগছিল।

তুষার দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে কেমন বিষণ্ণ মনে করেছিল। কোনো কারণ নেই, তবু শান্ত নিবিড় দুপুরে, তখন আকাশের তলায় কয়েকটা চিল ডানা মেলে উড়ছে, পাকা হরিতকী মতন রঙ ধরা শূন্যতা চারপাশে, অলস কাক কোথাও বসে ভাবছে এবং শিউলি গাছটার তলা থেকে কদাচিত বাতাসে গন্ধ ভেসে আসছে—তখন তুষার অনুভব করল তার কোথাও যেন ফাঁকা ফাঁক লাগছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুষার সাহেবদাদু, ইতি, আশাদি জ্যোতিবাবুর কথা ভাবনা। মলিনার কথাও। কিন্তু এদের ভাবনা মধ্যে তুষার নিজের মনকে ডুবিয়ে রাখতে পারল না। আদিত্য কথা তার বার বার মনে পড়ছিল।

আদিত্য এখনও যায়নি। তার যাবার কথা তুষার শুনছে গতকালই তার চলে যাওয়া উচিত ছিল। যায় নি। গেলে দেখা হত, আদিত্য দেখা করত। কেননা নুটুর গাড়ি ছাড়া উপায় নে

যাবার। আর মুটর গাড়ি কালও এসেছে তুষারের বাড়িতে। আদিত্যর যাওয়ার কথা কেউ বলে নি।

আদিত্যর কথা ভাবতে ভাবতেই তুষার ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। শিশিরটা ঘুমোচ্ছে। বিছানায় শুয়ে তুষারেরও ঘুমোতে ইচ্ছে করল। কিন্তু সাহস হল না। অতক্ষণ মাথা ঘষার পর দুপুরে ঘুমোতে ভরসা পাচ্ছিল না, বিকেলে মাথা তার হবে সর্দিও হয়ে যেতে পারে। তুষার না ঘুমিয়ে শিশিরের ঘর থেকে একটা মাসিক পত্রিকা এনে শুয়ে পড়ল।

একটা গল্প পড়ল তুষার। ভাল লাগল না। পাতা ওলটানো এ লেখা সে-লেখায়, মন বসল না। পাতা উলটে উলটে বিজ্ঞাপন দেখল। তারপর পত্রিকাটা রেখে দিল।

অবশেষে জানলা দিয়ে মরে আসা দুপুর দেখতে লাগল। দুপুর ফুরিয়ে আসছে দেখলে কেমন মায়া হয়; মনে হয় যে সকালটি সুশোভিত হয়ে দেখা দিয়েছিল, তার যাবার বেলা হয়ে এল। আর এ-সব কথা মনে পড়লেই কেন যেন অলস মন যত অদ্ভুত চিন্তা করে। চিন্তা করে যে, সব জিনিসই ফুরিয়ে আসে, সব জিনিসেরই পরিণাম আছে। যেমন করে সকাল ফুরোলে, এমনি করেই শরৎ ফুরিয়ে আসছে, শীত আসবে তাও ফুরোবে। তুষারও ফুরিয়ে আসছে। আশাদির মতন।

সব শুরুই কেমন সুখের, সব ফুরিয়ে যাওয়াও কেমন দুঃখের। তুষার সাহেবদাদুর কথা ভাবল। সাহেবদাদু একেবারে শেষ বেলায় এসে পড়েছেন। এবার ডুবে যাবেন। কি হবে তখন শিশুতীর্থর? জ্যোতিবাবু কর্তা হবেন। জ্যোতিবাবু দায় দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে সাহেবদাদুর অত সাধের শিশুতীর্থকে চালাবেন। পারবেন কি? হয়ত পারবেন। জ্যোতিবাবুর না পারার কারণ নেই। তিনি জীবনে অন্য কিছু কামনা করেন না। আর করলেও সেই কামনা বড় কিছু নয়। হয়ত মলিনাকে বিয়ে করলেই সে কামনাও মিটবে।

আশাদি কথাটা বলেছে তুষারকে। বলেছে, মলিনার ওপর

জ্যোতিবাবুর যেমন টান তুষার, তাতে মনে হয় মেয়েটাকে জ্যোতিবাবুই বিয়ে থা করবেন।

কথাটা তুষার বিশ্বাস করতে চায় না। আবার পুরোপুরি অবিশ্বাসও নয়। মলিনাই বা কেমন? আদিত্যর সঙ্গে তার মেশামেশিতে আটকায় না, আবার জ্যোতিবাবুর মায়া মমতাটুকুও সুযোগ বুঝে নেওয়া চাই। ওই মেয়েটাকে তুষারের কোনো দিনই ভাল লাগে না। নামই মলিনা নয়, ওর মনও বড় মলিন।

ভাবতে ভাবতে তুষারের চোখে তন্দ্রা জমেছিল। কয়েকবার চোখের পাতা খুলে সে দুপুরের দিকে চেয়ে থাকল, সতর্ক হল, ঘুমোতে চাইল না। তবু কখন তন্দ্রা এসে তার চোখের পাতা জুড়ে দিল তুষার বালিশের কোলে মাথা মুখ চেপে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল বিকেলে। রোদ পালিয়েছে। বিকেলের রঙ ঘন হয়েছে, বাগানের চেহারা নিরুজ্জ্বল। রোদের কিরণ কোথাও দেখা যাচ্ছে না ছায়ার আঙুলগুলো যেন ঘরের জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছে, এবার ঘরে ঢুকবে। তুষার ধড়মড় করে উঠে বসল। শিশিরের ঘরে কার যেন গলার শব্দ।

বাইরে এসে তুষার কলঘরে গেল। বেরিয়ে এসে আকাশ দেখল, রোদের ঈষৎ আভা আকাশের তলায় লেগে আছে। একটা পেঁজা তুলোর মত মেঘ নীচু দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। চোখ মুখের জল আঁচলে মুছতে মুছতে রান্না ঘরের দিকে তাকাল তুষার বাইরে কুয়াতলার কাছে ঝিয়ের গলা শোনা যাচ্ছে। অবেলার ঘুমের জন্যে হাই উঠছিল তুষারের। ইস, সেই ঘুমিয়ে পড়েছিল তুষার। মাথাটা অবশ্য এখনও ভার লাগছে না।

শিশিরের ঘরের কাছে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে শেষে তুষার ঘরে ঢুকল। যতীন।

তুষারকে দেখে যতীন বলল, 'এই যে দিদি, আপনি গিয়েছিলেন শুনলাম। আমি ছুটোর পর ফিরেছি। স্নান খাওয়া করে এলাম।' বলে যতীন একটু লজ্জার হাসি হাসল, বলল, 'শিশিরের কাছে

শুনলাম। আমার জিপ অচল। কাল সকালে আপনাকে গাড়ির ব্যবস্থা করে দেব।'

কাল।'

খুব সকালেই পাবেন। জিপটার ব্রেক ধরছে না ঠিক মতন। সারতে লাগিয়ে দিয়েছি।'

'তবে তাই। সকালেই পাঠিয়ে দিয়ো। আমার বেশী দেবী হবে না।' তুষার হাসল।

'যতক্ষণ খুশি আপনি আটকে রাখবেন। কাল থেকে আমার চার পাঁচটা দিন নো-ওয়ার্ক।' যতীন হাসল।

যতীনের বয়স বেশী নয়। চেহারাও ভাল। কাঠগোলার ব্যবসায় দু পয়সা মন্দ করছে না। ছেলেটি ভাল, ভদ্র, বিনীত। তুষারের হঠাৎ ইতির কথা মনে পড়ল। যতীনের কথা সাহেবদাদুকে বললে হয়।

'চা খেয়েছে?' তুষার শুধলো।

'খেয়েছি।'

'কী ঘুম ঘুমোলি তুই।' শিশির বলল তুষারের দিকে তাকিয়ে, 'এই রেটে গোটা ছুটি ঘুমোলে মোটা হয়ে যাবি।'

তুষার ভাইকে দেখল। শিশির তাকে ডেকে দিতে পারত। ডাকে নি। দিদির ওপর কত মায়া! হাই আসছিল তুষারের আবার, মুখে হাত আড়াল দিয়ে তুষার হাই তুলল, বলল, 'সারা বছর কাজ করি, ছুটিতে একটু ঘুমবো না?··· যাক গে, চা খাবে আর একটু যতীন?'

'খাবে। তুই তৈরী করে নিয়ে আয় ত!' শিশিরই জবাব দিল।

রান্নাঘরে চলে গেল তুষার। স্টোভ ধরিয়ে চা করল। অবেলার ঘুম বড় আলসামি মাখিয়ে দেয় সারা গায়ে। তুষারের সর্বাঙ্গে সেই আলস্য, যেন তুলোর মতন কোমল, মনে হয় আবার গিয়ে বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকি। শুয়ে থেকে থেকে সন্ধ্যাকে দেখি,

দেখি রাত কেমন করে আসে, কেমন করে সেই রাতের
যাই।

শিশিরদের চা দিয়ে, নিজে চা খেয়ে তুষার যখন রুম
বসেছে, তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। আর ঠিক সন্ধ্যের
এল। ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে।

তুষার অবাক। মানুষটা এ-ভাবে এসেছে কেন? সে
যাবে না? ব্যাপার কি?

শিশিরের ঘরেই বসেছিল আদিত্য। কথা হচ্ছিল শিশিরের সঙ্গে। তুষার বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি চলে গেছেন।'

'কাল যাব।'···আদিত্য বলল, 'আজ একবার লাস্ট্ ডিজিট সেরে নিচ্ছি।'

শহরে আর কার সঙ্গে দেখা করতে আসবে আদিত্য। তুষারের ইচ্ছে হল পরিহাস করে বলে, মলিনার সঙ্গে দেখা হল? অথচ মনে মনে কোনো সাড়া পেল না তুষার। বলল না। মলিনাকে শেষ দেখা করার লোক বলে ভাবতেও পারল না।

কথাটা শিশিরই পাড়ল হঠাৎ। বলল, 'দিদি তুই ত সঙ্গী পেয়ে গেলি।'

সঙ্গী! তুষার ভাইয়ের দিকে তাকাল অবাক চোখে। 'আদিত্যবাবু তাঁর রথ নিয়ে এসেছেন।' শিশির হাসিমুখে ব্যাখ্যা করল। আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দিদি শিশুতীর্থে যাবার জন্যে সকাল থেকে জ্বালাচ্ছে। আপনিই নিয়ে যেতে পারেন।'

তুষারের ইচ্ছে হল শিশিরের মুখের কথা কেড়ে নেব, থামিয়ে দেয়। কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই না কি ওর! অত দরদ দেখাবার কি দরকার পড়ল শিশিরের! তুষার বিরক্ত বোধ করে শিশিরের দিকে ভর্ৎসনার চোখে তাকাল। তুষার পাগল হয় নি। ওই মানুষের সঙ্গে পথে বেরিয়ে কি সে আরেক জ্বালার মধ্যে পড়বে না কি! না। শিশিরের কথার পর-পরই তুষার আপত্তি জানাতে গেল, 'না না, এখন নয়। সকালে যাবার দরকার হয়েছিল একটু!'

শুনলাম। ৎ
তুষারের দিকে প্রত্যাশার চোখে তাকাল। 'আমি
ব্যবস্থা করে ে
টা এনেছি চলুন।'
কাল।'
তুষার মাথা নাড়ল।
খুব সকালে
।' শিশির বলল, 'চলে যা না। তোর অসুবিধে
সারতে লাগিয়ে
গুলো দয়ে আসবি, বেড়ানোও হয়ে যাবে।'
'তবে তাই
র মূর্খতায় তুষার রাগ না করে পারল না। কে
না।' ত
বলেছে ঘরের কথা ঢাক পিটিয়ে বাইরের লোকের কাছে
বলতে? তোর অত মাথা ব্যথার দরকার কি? য করার তুষার
করবে। এমন অসভ্য আর মোড়ল হয়েছে শিশির-! তুষার
ভাইয়ের ওপর বিরূপ বিরক্ত হল।

আদিত্য কি এই অপ্রত্যাশিত সুযোগই খুঁজছিল। তুষার দেখল আদিত্য যেন উৎসাহের আবেগে প্রদীপ্ত। আতিশয্য প্রকাশ করে বলল, 'না কেন, চলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব আবার।'

'এখন থাক; এমন কিছু জরুরী ব্যাপার নয়।'

'নাই বা হল! এমনি বেড়িয়ে আসবেন।··· ঘোড়াটা ভাল ছুটছে খুব মজা পাবেন হউ উইল এনজয় দি রাইড।'

তুষার মাথা নাড়ল। না, এখন সে যাবে না

আদিত্য অনুমান করতে পারল তুষারের আপত্তি কোথায়, কেন তুষার যেতে চাইছে না। আহত এবং ক্ষুব্ধ দেখাল তাকে। মুখ ম্লান আদিত্যের দৃষ্টি যেন বলছিল, আমায় অতটা অবুঝ ভাবার কি আছে? আমি কি তোমার কোনো ক্ষতি করব?

শিশির দিদির এই হেঁয়ালি বুঝতে পারছিল না। যাবার দরকার যখন তখন ঘুরে আসুক না কেন। কালকের অপেক্ষায় বসে থেকে কি লাভ! যতীনের গাড়ি যদি ঠিক না হয়! যন্ত্রের কথা কে বলতে পারে। শিশির বলল, 'কাল সকালে যতীনের, গাড়ি ঠিক না হলে আবার সেই গজ গজ করবি। হাতের সুযোগ পায়ে ঠেলে ফেলছিল তখন জ্বলে পড়বি।'

আদিত্য তুষারকে যেন ভাল করে লক্ষ্য করে নিল। গলায় সামান্য জ্বালা, বলল, 'বেশী বুদ্ধিমানরাও মাঝে মাঝে বোকামি করে।'

আবহাওয়া কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল। তুষার বুঝতে পারল, ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে। আদিত্য স্পষ্ট বুঝতে পারছে, তুষার তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে, তার সঙ্গে পথে বেরোতে রাজী হচ্ছে না। স্বভাবতই নিজেকে অপমানিত বোধ করছে আদিত্য, ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ হচ্ছে। শিশিরই বা কি ভাবছে কে জানে। দিদির এই হঠাৎ আপত্তির কারণও কি সে অনুমান করতে পারছে। তুষারের মনে হল, শিশির বরাবরই যেন এই জিনিসটা লক্ষ্য করছে, আদিত্যের সম্পর্কে তুষারের কেমন যেন একটা সঙ্কোচ, এড়িয়ে থাকার চেষ্টা। কেন? শিশির কি এই কেন-র দিকে তাকিয়ে কিছু ভাববার চেষ্টাও করছে! বলা যায় না। সেদিন আদিত্যর আসার কথা শুনে তুষার যে পালিয়ে গিয়ে বসেছিল শিশির পরে তা বেশ বুঝতে পেরেছে। বুঝে বলেছিল, 'ভদ্রলোককে তুই অত ভয় পাস কেন।' কেন ভয় পায় শিশির কেমন করে জানবে।

তুষার অস্বস্তি বোধ করছিল। হঠাৎ বলল, 'এখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এ-সময় লাভ কি গিয়ে।'

ওর এই কারণ দেখানো এখন যেন খুব জলো, ছেলেমানুষির মতন শোনাল। মনে হল, নিতান্ত একটা ছুতো দেখাবার জন্যেই কথাটা বলল তুষার। শিশির আদিত্যর চোখে চোখে তাকাল, তারপর দিদিকে দেখল। 'যাবি ত চার পাঁচ মাইল রাস্তা, তাও গাড়িতে, তায় আবার সন্ধ্যে।'

আদিত্য হাসল, হাসিটা ব্যঙ্গের। 'সন্ধ্যে হয়ে গেলে পথে বোধ হয় ভূত বেরোয়।'

তুষার বিদ্রূপ গায়ে মাখল না। মাখলে অন্য জালে জড়িয়ে পড়তে হবে। বরং সাধারণ ভাবে হেসে বলল, 'আপনার ভরসায় বেরিয়ে তারপর গাড়ি উলটে মরি।'

'কেন ?' আদিত্য তাকাল।

'আপনাকে ভরসা কি! যদি লাগাম সামলাতে না পারেন, তবেই মরেছি।'

কথাটার কি কোনো সূক্ষ্ম অর্থ ছিল। হয়ত, হয়ত নয়। আদিত্য দু মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'লাগাম ধরতে পারি কি পারি না একবার ট্রায়াল দিয়েই দেখুন।...অত সহজে মানুষ মরে না—গাড়ি উলটে গেলেও নয়।'

তুষার তবু হাসল। যেন হাসিতেই তার শেষ বক্তব্য লুকোনো আছে। 'হাত পা ভাঙে ত!'

'হাত পা ভাঙা এমন কিছু নয় আবার জুড়ে যায়।'

শিশির অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'তোর খালি কথা। যাবি ত যা, না হয় যাস না। অত হ্যাঁ না করার কি আছে।'

আদিত্য পকেট থেকে সিগারেট বার করল। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, 'সাহস না পেলেই কিন্তু থাকে। কি বলুন!'

তুষার যেন কি ভাবছিল। হঠাৎ বলল, 'বেশ চলুন। আমি কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরব।'

আদিত্যর মুখ দেখে মনে হল সে সন্তুষ্ট হয়েছে। এক মুখ ধোঁয়া জানলার দিকে উড়িয়ে দিয়ে ও বলল, 'তা হলে তাড়াতাড়ি বেরুতে হয়।'

তুষার দ্বিতীয় কোনো কথা বলল না। বাইরে চলে গেল। ত্বরিতেই সে তৈরী হয়ে নেবে। চুল আর বাঁধবে না, রুক্ষ চুল জড়িয়ে এলো খোঁপা করে নেবে, আর গায়ের শাড়িটা পালটে নেবে। কতক্ষণ আর লাগবে তার সামান্যক্ষণ। ততক্ষণে সন্ধ্যে আরও ঘন হয়ে আসবে। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে তুষার আকাশের দিকে তাকাল। তারা ফুটেছে।

চৌদ্দ

আকাশের তলায় অন্ধকার। যেন কালো মোম দিয়ে সমস্ত আকাশটা কেউ ঘষে দিয়েছে। তারাগুলো সেই অন্ধকারে রচিত হয়ে আছে। এখন অনেকটা রাত। কত রাত কেউ জানে না। প্রসারিত অরণ্য ওদের চক্ষু থেকে সমস্ত সংসার আবৃত করে রেখেছে। তুষার একটা বড় পাথরের ওপর বসে, আদিত্য পাশের ছোট পাথরটার ওপর দাঁড়িয়ে। ঘোড়ার গাড়ীটা সামান্য তফাতে তার গায়ে টিমটিমে দুটো বাতি জ্বলছে। মাঝে মাঝে ঘোড়াটা পা ঠুকছিল, কদাচিত ঊর্ধ্বে মুখ তুলে অরণ্যকে তার সম্ভাষণ জানাচ্ছিল।

তুষার নীরব। শিশুতীর্থ সে অনেকক্ষণ আগে ফেলে এসেছে। ফেলে আসাই। এখন সেই রকম মনে হচ্ছে। যেন কোন সন্ধ্যা-কালে একবার সেখানে গিয়েছিল, সাহেবদাদুর পায়ে পশমের চটিটা পরিয়ে প্রণাম করেছে, ইতিকে দিয়ে দিয়েছে তুষারের সেই ভালো-লেগে-যাওয়া শাড়িটা, আশাদির সঙ্গে দেখা করে নি আর, আদিত্যর গাড়িতে চেপে বসেছে আবার। আর আদিত্য তাকে কেমন অদ্ভুত যাদুমন্ত্র বলে যেন নিয়ে এসেছে এই পাহাড় সন্নিকট অরণ্যে।

সেও যেন কতক্ষণ, মনে হয় সময়ের হিসেব পাওয়া যাবে না : প্রতিটি মুহূর্ত যেখানে মাসান্ত বলে মনে হয় সেখানে এই দীর্ঘ সময় একটি যুগও মনে হতে পারে। কিন্তু তা নয়। কেননা ওই আকাশের এই অন্ধকার অচিরে হালকা হয়ে আসবে, আর তারপর একটি শীর্ণ চাঁদ দেখা দেবে, ষষ্ঠীর চাঁদ।

আদিত্যকে দেখা যাচ্ছে না। বৃক্ষছায়ার মতন অন্ধকারে সে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছে।

তুষার হাঁটু ভেঙ্গে বসেছিল। হাঁটুর ওপর চিবুক। তার দৃষ্টি আকাশ অথবা নক্ষত্রের শোভা দেখছে না। সামনের কয়েকটা পাথর, দুএকটি বন্য চারা আর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে সে বসেছিল। প্রত্যহের স্বাভাবিক চেতনা থেকে সে ছিন্ন। যেন এই প্রকাশ্য চেতনা তার মনের অন্য কোথাও হারিয়ে গেছে, তুষার তাকে খুঁজে পাচ্ছিল না। তার যেন সে আগ্রহও ছিল না। হয়ত এই পরিত্যক্ত নির্জন নিস্তব্ধ জগতের মধ্যে নিজেকে সমর্পন করে সে তৃপ্ত। হয়ত এই নিভৃতি এবং অন্তরাল তাকে মোহাচ্ছন্ন করেছে।

আদিত্য আজ সত্যই তুষারকে মোহাচ্ছন্ন করেছে। তুষার নিজের বোধ ও জ্ঞান ওই মানুষটির কাছে কেমন করে বিসর্জন দিতে পারল সে জানে না। অথচ আদিত্য যে ক্রমশ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তুষারের স্বাভাবিক চেতনাকে অপহরণ করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সামান্য আগে কোনো বাক্যালাপ উভয়কে অকস্মাৎ এমন এক বেদনা দিয়েছিল যারপর স্তব্ধতা ভিন্ন উপায় ছিল না। আদিত্য তুষারের কাছ থেকে উঠে গিয়েছিল, তুষার অর্ধ-আনত চোখে সামনের অন্ধকার দেখছিল।

অবশেষে তুষার নিশ্বাস ফেলল। নিশ্বাস ফেলে মুখ তুলল। সন্নিকট অরণ্যের অন্ধকরে যবনিকার মতন দাঁড়িয়ে আছে। সেই যবনিকার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে তুষারের মনে হল, জীবনের এই অপ্রকাশ্য রূপটি কেন স্থায়ী নয়! কেন? কেন এই রাত্রি, এই বিচ্ছিন্নতা, এমন মুক্তি সম্ভব হয় না?

আদিত্য আবার সামনে এল। কাছে। তুষারের পাশে নিচু পাথরটায় বসে পড়ল।

'সমস্যার শেষ হয় না।' আদিত্য বলল আচমকা, যেন তার ভাবনার একটি অসম্পূর্ণ অংশ ব্যক্ত করল। 'আমরা বড় মূর্খ, সব সময় সমস্যাটাকে বড় করে দেখি।'

তুষার কোনো জবাব দিল না। বাতাস তার কপালের রুক্ষ চুলের গুচ্ছ চোখে ফেলছিল। কপাল থেকে চুল সরাল নিঃশব্দে।

'আমি হিসেব করতে শিখি নি।' আদিত্য বলল।

আদিত্যর মুখ দেখল তুষার। দেখা যায় না। অন্ধকারে ছায়ার মতন হয়ে আছে।

'ছেলেবেলায় একটি মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল।' আদিত্য কি ভেবে বলল, 'সে খুব হিসেবী ছিল। আমায় হিসেব করে দেখিয়েছিল আমার বয়স যখন বাইশ হবে, তার আঠারো—তখন আমাদের কোথাও কোনো বাধা থাকবে না। হিসেবটা ভুল হবার কথা নয়; তবু তার ষোলো বছরে বিয়ে হয়ে গেল এক জুয়েলারের সঙ্গে।'

আদিত্যর বাল্য-প্রণয় তুষারকে উৎসাহী করল না। সেই মেয়েটি যে বয়সে হিসেব শিখেছিল, হয়ত সে-বয়সে ভাল করে কিছু শেখা যায় না।

'আমরা কি নিজের গড়া জগতে বাস করি?' আদিত্য আগের প্রসঙ্গের সংগে যুক্ত করল কথাটা।

'করি না?' তুষার মুখ ফেরাল আবার।

'না, করি না।'

'তবে?'

'জানি না। আমার কোনো ইচ্ছে নেই জানার। আমি এই বাঁচাটুকু বিশ্বাস করি। যা আমার চোখের সামনে আমার হাতের কাছে, আমার প্রার্থনা সেখানে। এর বেশী জেনে আমার কি লাভ!'

'কি জানি!' তুষার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

অল্প সময় আবার নীরবতা। আদিত্য যেন আরও ঘন হয়ে এল তুষারের কাছে। কোনও মুহূর্তে প্রেমিকের মিনতির মতন তুষারের একটি হাত তুলে নিল। তুষার বাধা দিল না।

'তুষার!'

তুষার কথা বলল না। তার হৃদয় যেন আবার কেমন আশ্চর্য কুহকে আচ্ছন্ন হচ্ছিল।

'আমার সমস্ত কিছুই ছেলেমানুষী নয়।' আদিত্য তুষারের হাঁটুর এত কাছে মুখ এনেছিল যে, তুষার উষ্ণ নিঃশ্বাস পাচ্ছিল। 'তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পার।'

'কে অবিশ্বাস করেছে'!

'তুমি।'

'না।'

'তা হলে—?'

তা হলে কি? কেন তুষার স্বীকার করছে না, আদিত্যর ভালবাসা সে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করছে। আমি তোমার এই প্রেম আমার প্রাণকে নিতে দেযেছি আদিত্য, আমার কোনো কুণ্ঠা নেই, আমি সুখী। তুষার যদি অবিশ্বাস না করবে তবে আদিত্যর প্রেমকে উদ্দেশ্য করে অনুচ্চারিত ভাবে এই কথাগুলো বলতে পারত। পারা উচিত ছিল। তুষার তা পারছে না। এই প্রেম তার কাছে মধুর এর স্বাদ তাকে বহুক্ষণ পুর্ব থেকেই রোমাঞ্চিত করছিল, আদিত্যর হাতের তালুর মধ্যে কিছুক্ষণ আগে সে আরও একবার এখনকার মতন নিজেকে সমর্পন করে বসেছিল। তখন যেন তুষার এই মুহূর্তেরও অধিক আনন্দ পেয়েছিল। এখন যেন সেই আনন্দ ঈষৎ হ্রাস পেয়েছে।

'রাত হযেছে অনেক।' তুষার বলল।

আদিত্য তুষারের হাত নরম করে নিজের দিকে আকর্ষণ করল, মুখের পাশে রাখল। তুষার তার সমস্ত মমতা হাতে নির্ভর করতে চাইল। তার বুকের তলায় এখন যেন একটি তুলোর হৃদয় সমস্ত অনুভূতিকে স্নিগ্ধ কোমল করতে চাইছিল।

তুষারের নরম হাত নিজের মুখ গাল কপাল এবং চোখে রাখছিল আদিত্য। বুলিয়ে নিচ্ছিল। আহত কাতর ব্যক্তি যেমন করে স্বস্তি

ও শান্তির স্পর্শ পেতে চায়, আদিত্য সেই ভাবে তুষারের করতল নিজের উষ্ণ মুখে রাখছিল।

তুষারের অঙ্গে শিহরণ ছিল। কিন্তু ক্রমশ তার স্নায়ু শিহরণকে সহনশীল করে তুলেছে।

'ফিরতে হবে।' তুষার বলল চাপা গলায়।

'না।' আদিত্য ছেলেমানুষের গলায় জবাব দিল।

'না ফিরে তারপর—?'

'কিছু না। আমরা বসে থাকব।'

'পাগলামি।' তুষার বিষন্ন মধুর করে হাসল।

আদিত্য তুষারের আঙ্গুল নিজের ঠোঁটে রাখল! ফুলের পাপড়ির মতন আলগা করে বুলোতে লাগল।

'তুমি ওই গানটা কেন গাইলে, তুষার।' আদিত্য কাতর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, যেন অভিমানের পর এখন সে আঘাত প্রকাশ করছে। 'এই মণিহার তোমায় কেন সাজবে না?'

তুষার আজ ওই গানটা গেয়েছিল। আদিত্য তাকে দিয়ে গাইয়েছিল। তুষার জানত না কি গান গাইবে। গাইতে সুরু করে তার কণ্ঠ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই ওই গানের কলিটা এসে গিয়েছিল। কেন এসেছিল তুষার জানে না।

'তুমি ভীতু।' আদিত্য বলল, 'তোমার মনে সাহস নেই।'

'নেই।'

'কেন নেই?'

'কি করে জানব।'

'তুমি সমস্ত জান। তুমি জান একে ছেঁড়া কষ্টের।'

'একে পরাও যায় না, কষ্ট হয়।'

'ওটা ত গানের কথা'

'আমার কথাও।'

'তুষার—'আদিত্য পাগলের মতন মাথা নাড়ল। 'না, না; গানের কথাকে তুমি তোমার কথা বলো না।' আদিত্য তুষারের

করতল চুম্বন করল, তুষারের হাত দিয়ে নিজের চোখ ঢাকল। মনে হচ্ছিল এই প্রত্যাখ্যান আদিত্য স্বীকার করবে না। 'তুষার তুমি আমার কষ্ট দেখছ না।'

'কষ্ট!'

'আমি তোমায় কি করে বোঝাব…'

'আমি বুঝি।' তুষার এবার হাত টেনে নিল। বলল, 'আর দেরী করা যায় না। ফিরতে হয়।'

আদিত্য উঠল না। তার স্বাভাবিক উত্তেজনাও এত প্রখর নয়। এখন সে আরও ব্যাকুল, উদভ্রান্ত, অস্থিরচিত্ত। জ্ঞানহীনের মতন আদিত্য তুষারের পায়ে—জানুর ওপর মুখ রাখল। 'ফিরে গেলে তুমি আবার বদলে যাবে।'

'শিশিব ভাবছে। অনেক রাত হয়ে গেল।' তুষার আদিত্যের মাথা সরাতে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত তার চুলে হাত রাখল। কষ্ট হচ্ছিল তুষারের। এই স্পর্শ আর কোনোদিন অনুভব করবে না তুষার।

আদিত্য শিশুর মতন তুষারের জানুতে মুখ রেখে যেন কাঁদছিল। তুষার নিঃসাড় হয়ে বসে। ঘোড়াটা অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। তার পা ঠুকছিল। এই নিস্তব্ধ আবহাওয়ায় পশুটার কর্কশ ডাক বন্যজন্তুর কান্নার মতন শোনাল।

'ওঠো!' তুষার নিবিড় করে ডাকল, আদিত্যর মাথা সরিয়ে দিল কোমল করে, 'আর রাত করা উচিত না।'

আদিত্য উঠল। ঘোড়াটা বড় অস্থির হয়ে পড়েছে। একেবারে বুনো ঘোড়া। এত অন্ধকার আর রাত্রে ওই ঘোড়াটাকে সামলে নিয়ে যাওয়া খুব মুসকিল।

আদিত্য উঠে দাঁড়িয়েছে দেখে তুষারও উঠে দাঁড়াল। পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার দরুন তুষার নিজেকে আদিত্যর চেয়ে অনেক দীর্ঘ মনে করল। তার মনে হল, এই উচ্চতা তাকে রক্ষা করেছে।

সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে দুটি মানুষ গাড়িতে এসে বসল। আদিত্য

সামনে, তুষার পিছনে। গাড়িটা ছোট। পিছনের দিক নীচু হয়ে আছে। পাদানে পা রেখে তুষার সামনের কাঠে হাত রেখে হেলে বসল। আদিত্য ঘোড়ার লাগাম ধরে। ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে নিল আদিত্য।

জঙ্গলের পথ ; গাড়িটা উঁচু নীচু রুক্ষ অসমতল পথ দিয়ে যাবার সময় লাফিয়ে উঠছিল, কাত হয়ে যাচ্ছিল। তুষার সেই ঝাঁকুনিতে গড়িয়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিচ্ছিল।

'এই রাস্তাটা তুমি জানো?' আদিত্য বলল।

'না।'

'কখনো আস নি আগে?'

'কই আর এসেছি—'

'ডান দিকে গেলে আমরা পাহাড়ে গিয়ে পড়ব।'

'আমরা ত বাঁদিকে যাচ্ছি।'

'তোমার শিশুতীর্থের দিকে।'

সামান্য সময় আর কথা হল না। ঘোড়াটা বোধ হয় তার চেনা পথের গন্ধ পেয়েছে বলে এখন খানিকটা শান্ত হয়ে পথ চলছিল। বাতির আলো এত অনুজ্জ্বল যে পথ ভাল করে দেখা যায় না। আদিত্য হাত বাড়িয়ে গাড়ির গায়ে ঝুলোনো বাতির শিখা আরও উজ্জ্বল করে দিল।

'আমার ভাগ্য খুব খারাপ, তুষার।' আদিত্য বলল 'আমার মার ভাগ্য নিয়ে আমি জন্মেছি।'

'উনি না আত্মহত্যা করেছিলেন?'

'সম্মানে লেগেছিল বলে।'

'আত্মহত্যায় কোনো লাভ নেই।'

'আমি বোকা নয়। মরব না।'

'আমার কেমন মনে হয়—'

'কি?'

'তুমি পাহাড়ের খারাপ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ। ভয় করে।'

'আমি ইচ্ছে করলে অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে পারি। কিন্তু দেব না।

'এত বেপরোয়া, অবুঝ হলে চলে না। সংসার কেবল খরচ করার জায়গা নয়। তুমি কেন নিজেকে খরচ করে ফুরিয়ে যাচ্ছ?'

'আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি কিনা জানি না। একটা কিছু হয়ে ওঠার জন্যে আমি পাগল। আমার কিছু হচ্ছে না।'

'হবে। আরও পরে। তোমার এই অস্থির স্বভাব একদিন শান্ত হয়ে এলে তুমি নিজেকে বুঝতে পারবে।'

আদিত্য কথা বলল না। ঘোড়ার খুরের শব্দ এবার কানে যাচ্ছিল, সামনের পথ অনেকটা সমতল। তুষার আদিত্যর শক্ত কালো পিঠের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকল।

খানিকটা পথ শেষ হল। এবার রাস্তা পাওয়া যাবে। আদিত্য ঘোড়াটার লাগাম আলগা করে দিল।

'আমি তোমার কথা ভুলব না।' আদিত্য বলল।

'জোর করে কিছু বলা ঠিক না।' তুষার মৃদু গলায় বলল।

আদিত্য কথাটা শুনল কিনা বোঝা গেল না। ঘোড়ার পিঠে আলগা করে চাবুক কশাল।

'এই শিশুতীর্থ তোমায় কতকাল ধরে রাখবে, আমার জানতে সাধ হয়। একদিন তোমার কাছে এর দাম থাকবে না।' আদিত্য মুখ ফেরাল না, সামনের দিকে তাকিয়েই বলল।

'আমি জানি।'

'জান! আগে ত বলো নি?'

'আগে জানতাম না, এখন জানতে পেরেছি।' তুষার নিজের মনের সঙ্গে কথা বলার মতন করে বলল। 'আমার ভাগ্যও খুব সুখের নয়, আমার চারপাশে দায়। দয়িত্বও কম নয়।'

'তুমি খুব সাবধানী।'

'কে জানে!'...

ঘোড়াটা রাস্তা পেয়ে গেছে। আদিত্য অনুভব করল তার হাতের লাগামটা আলগা, ঘোড়াটা কদমের জোর বাড়িয়েছে।

তুষার কপাল থেকে চুলের গুচ্ছ সরাল। ভাল করে গুছিয়ে বসল। গাড়িটা আর তাকে অস্বস্তি দিচ্ছে না। অন্ধকারের মোম ঘষা পৃথিবী কেমন নরম হয়ে এসেছে।

'এবার চাঁদ উঠবে।' আদিত্য বলল।

'আজ ষষ্ঠী, এতক্ষণে ওঠা উচিত।' তুষার আকাশের দিকে তাকাল।

চাঁদ ওঠে নি এখনও, উঠবে বলে আকাশের একদিকে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে।

'তোমাদের শিশুতীর্থ—' আদিত্য হাত বাড়িয়ে অদূরের দু একটি মৃদু আলো দেখলো।

তুষার বুঝতে পারল, সাহেবদাদুর ঘরে বাতি জ্বলছে, বাতি জ্বলছে আশাদির ঘরে, আরও কোথাও কোথাও। জোনাকির আলোর মতন বিন্দু বিন্দু আলোগুলো দেখে তুষার অনুভব করল, সে আর-এক জগত পেরিয়ে নিজের জগতে এসে পড়েছে।

ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে হঠাৎ ডেকে উঠল। আর তখনি তুষার দেখল, আকাশে চাঁদ উঠেছে, শীর্ণ চাঁদ।

শিশুতীর্থ পেরিয়ে এল গাড়িটা। চাঁদ ম্লান আলো এনে ওদের গাড়িকে পথ দেখাল এতক্ষণে। আদিত্য ঘোড়ার পিঠে আবার চাবুক মারল। ঘোড়াটা একবার পিছু দিকে লাফিয়ে উঠে হঠাৎ দ্রুততা আনল তার ছোটার বেগে।

তুষার অবলম্বনটা আঁকড়ে ধরল।

'তোমার দুঃখ হচ্ছে না, তুষার?' আদিত্য শুধলো।

'হচ্ছে।' মাথা হেলিয়ে তুষার বলল।

'কিসের দুঃখ ?'

কিসের দুঃখ তুষার কেমন করে বোঝাবে। হয়ত সে নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেই এই দুঃখ লাভ করল। সুখ পাবার লোভে সে গিয়েছিল, সুখ পেয়ে আবার সে সুখকে হারিয়ে এল, কেননা এই দুঃখ তাকে প্রলুব্ধ করেছিল।

'বললে না!' আদিত্য আবার শুধলো।

তুষার অস্বস্তি বোধ করল। সে কিছু বলতে চায়, পারছে না। আদিত্যকে নিজের হিসেবটা দেখাতে বিব্রত বোধ করছিল তুষার।

বাড়ি আরও এগিয়ে এল। তুষার বলল নীচু গলায়, 'বুঝতে পারছি না।'

তুমি কিছুই বুঝতে পার না।'

সত্যিই তুষার কিছু বুঝতে পারে না। সে বুঝতে পারছে না, কেন সে আদিত্যর সঙ্গে এই অভিসারে এসেছিল। সে জানত, তার অভিসার সত্য নয়, সে আদিত্যকে গ্রহণ করতে পারবে না, সে এই ছেলেমানুষীর খেলায় নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারবে না, তবু সে এসেছিল। কেন ?

হয়ত তুষার তার মহিমা দেখতে চেয়েছিল, হয়ত তুষার জানতে চেয়েছিল, সে মলিনার ঊর্ধ্বে কি না, হয়ত তার ইচ্ছা হয়েছিল এই খেলায় সুখ কেমন তা অনুভব করবে।

আদিত্য পথে আলো পেয়ে ঘোড়াটাকে চাবুক কশাচ্ছিল। পর পর। আর বন্য ঘোড়াটা দুরন্ত হয়ে উঠেছিল, সে যেন হিংস্র উন্মত্ত। তার গতিতে কোনো সংযম ছিল না, সাবধানতা ছিল না।

'ঘোড়াটা বড় খারাপ ছুটছে। তুষার বললে শঙ্কিত গলায়।

'আর সামান্য পথ।' আদিত্য জবাব দিল।

এই ভয়ে কি তুষার এতক্ষণ পরে নিজের চেতনাকে আবিষ্কার করল! অকস্মাৎ তুষারের কাছে এই রাত্রির রহস্য মরে গেল।

যে জগত তুষারকে মোহাচ্ছন্ন আবৃত ও পৃথক করেছিল, এখন সেই জগত স্বপ্নের জগতের মতন দূরে পড়ে থাকল। খেলার জগৎ থেকে ফিরে এল তুষার, ফিরে এসে দেখল, পথের ধুলোয় চাঁদের আলো মেটে রঙ ধরে আছে, মাঠ ঘাট তার চেনা, দেখল, ট্রেন লাইনটা সামনে।

নিজের প্রাত্যহিক জগতের দিকে তাকিয়ে তুষারের মনে হল যে জগত থেকে সে ফিরে এল তার সবটাই সোনার ছিল, স্বর্গের। তার খেলনাগুলো কেবল দ্যুতি ঠিকরে দেয়, তারা চোখকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে, সেই মণিমাণিক্য বিহ্বল হয়ে দেখার মতন, কিন্তু তাকে ব্যবহার করা যায় না।

তুষার এমন খেলনা নিয়ে কিছু করতে পারত না। তার ব্যবহার যোগ্য জিনিস ওটা নয়।

গাড়িটাকে আদিত্য আরও বেপরোয়া ভাবে ছোটাচ্ছিল। যেন তার কোনো দিকে গ্রাহ্য নেই, মমতা নেই। দুরন্ত কোনো নেশা তাকে ছোটাচ্ছে, কিসের আক্রোশ তাকে উন্মত্ত করে রেখেছে।

ধাবমান গাড়িতে বসে তুষার অনুভব করতে পারল, আদিত্যের প্রেম এই রকম, অসাবধান অসতর্ক, দুঃসাহসী ও দুরন্ত; অতি দ্রুততায় তার সমস্ত উত্তেজনা প্রখর পৌরুষের মতন দেখায়, অথচ এমন অনিশ্চয় যে, যেকোনো সময় তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে পারে।

তুষার স্বীকার করল, জীবনকে এমন করে সে অনিশ্চয়ের মধ্যে ফেলে দিতে পারত না। হয়ত স্তিমিত শান্ত সুস্থির কোনো ভালবাসা সে কামনা করেছিল। হয়ত মলিনা তা পাবে। পাক। তুষার জ্যোতিবাবুর জন্যে আন্তরিক কষ্ট পেল। অনুভব করল, তার হৃদয়ে শূন্যতা বিচরণ করছে।

রেল লাইনের লোহায় অশ্বখুরের স্ফুলিঙ্গ তুলে গাড়িটা লাফ মেরে অন্য পারে চলে গেল।

ভীত কণ্ঠে তুষার বলল, 'আমায় নামিয়ে দিন।'

আদিত্য তুষারকে নামাল না।

বাড়ির কাছে এসে আদিত্য গাড়ি থামাল। তুষার নামল। তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। এই ভ্রমণ যে কী ভয়ঙ্কর তুষার যেন এখন তা সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারছিল।

———

অবগুণ্ঠন

॥ এক ॥

এই নিয়ে তিনবার। আজও ঠিক তাই হল। নিচে কলঘর। গা ধুয়ে বাসনা উঠছিল। গা-মুখ ভিজে-ভিজে, ঠাণ্ডা। বাঁ-হাতে কাচা শাড়ি, সেমিজ, গামছা, সাবান-কেস। মাঝ-সিঁড়িতে আসতেই শুনল, কমলার ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে আটটা বাজছে।

থমকে দাঁড়ালো বাসনা। মুখ তুলল এবং কান পাতল। থেমে থেমে রেশ ছড়িয়ে, মিলিয়ে যাই-যাই করেও একটা ধাতব সুরেলা শব্দ বেজে যাচ্ছিল। আর বাসনা সেই ঈষৎ-ভারি ভাঙা প্রতিটি ঢং-ঢং শুনতে শুনতে এবং শুনতে গিয়ে হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। যেন ধক্ করে এক দমকা ঝাঁঝালো কটুগন্ধ হাওয়া এসে সজাগ চেতনাকে আবিল করে তুলল। দৃষ্টিকেও। সিঁড়ির আলো নিবু-নিবু হয়ে আসছিল। দোতলার মুখে খানিকটা অন্ধকার বাতাসে-দোলা পর্দার মতন দুলতে লাগল। একবার আলো দেখল বাসনা, নড়ে উঠে সেই আলো মুছল এবং অন্ধকার নামল। আবার আবছা আলো।

বাসনার বুকে নিশ্বাস আসছে না, প্রশ্বাস স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। মাথাটা ঘুরে আসছে; ভীষণ হালকা লাগছে হঠাৎ। একটা অদ্ভুত ভার দেহটাকে ঠেলে দিচ্ছে একপাশে।

বাসনা একটিবার ভেবেছিল, সিঁড়িটুকু সে কোনোরকমে উঠে যাবে। কিন্তু ওঠবার চেষ্টাই করে নি, করতে পারল না। ঝুপ্ করে বসে পড়ল সিঁড়িতে।

তারপর খুব আবছাভাবে বাসনা শুনতে পেয়েছে, কেউ যেন চিৎকার করে ডেকে উঠল; হুড়মুড় করে ছুটে এল কমলা, বীথি। মাথায় জল ঢালল। পাখা দিয়ে হাওয়াও করল বুঝি। হুটোপাটি ছুটোছুটি। শেষ পর্যন্ত ওকে কে যেন পাঁজকোলা করে তুলে নিয়ে চলল। কে? কী শক্ত হাত! যেন আঁকড়ে ধরে বুকের কাছে উঠিয়ে নিয়েছে।

অল্প ক'দিন হল এই বিশ্রী রোগটা দেখা দিয়েছে বাসনার। ফিট হচ্ছে আচমকা। দিন পনেরো আগে প্রথম। সেদিনও ঠিক এমনি গা ধুয়ে আসছে কলতলা থেকে, সিঁড়ির কাছে আসতেই টলে পড়ল। ভাগ্যিস অমলেন্দু ছিল ধারে-কাছেই। ছুটে এসে ধরে ফেলেছিল, নয়তো মাথা ফাটত, কি হাত-টাত ভেঙে এক কাণ্ডই করে বসত বাসনা। বাড়িতে তখন সুধাময় ছিল না। মেয়েরা ভয় পেয়ে ছুটো-পাটিই করলে শুধু। জল ঢালল ঘটি ঘটি, মাথায় মুখে, আর হাওয়া করল। জলে ভিজে একশা হয়ে পড়ে থাকল বাসনা সিঁড়ির গোড়ায়, পথের মাঝখানে। কতক্ষণ আর যাওয়া-আসার পথে, ধুলোয়-নোংরায় ফেলে রাখা যায়। মূর্ছা যে কখন ছাড়বে তারই বা ঠিক কি? গা-হাত শক্ত করে তখনও পড়ে আছে বাসনা। চোখ বুজে।

মেয়েরা কি পারে, না সে শক্তি আছে। কাজেই ওই সব তুচ্ছ লজ্জা বাদ-বিচারের কথাই ওঠে না। অমলেন্দুকেই বাসনার ভিজে ভারি শরীরটা পাঁজাকোলা করে আনতে হয়েছে সিঁড়ি বয়ে দোতলায়। বাসনার ঘরে এনে শুইয়েও দিয়েছে।

স্মেলিং সল্ট ছিল না, ব্লটিং পুড়িয়ে একটু ধোঁয়া নাকের মধ্যে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে অমলেন্দু। বাসনা মাথা সরাবার চেষ্টা করছে প্রথমে। মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। তারপর চোখ খুলেছে। আলগা, স্তিমিত, ঘোলাটে দৃষ্টি। যেন জ্বর এই ছাড়ল।

ক'দিন পরে আবার। ঠিক এই আটটা বাজ-বাজ সময়ে। কমলার ঘরে ঘড়িতে সবে ঘণ্টার প্রথম শব্দ উঠেছে। বাসনা গা ধুয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল, মাথা টলে ছিটকে পড়ল। মুখ গুঁজে, আর মাথা এক সিঁড়িতে, পা নিচে অন্য সিঁড়িতে। সে এক বিশ্রী বেকায়দাভাবে। হ্যাঁ, সেদিন বেশ লেগেছিল বাসনার। কপালের একটা পাশ কেটে গিয়েছিল, পায়ের গোড়ালি মচকে ফুলে উঠেছিল। সেবারও অমলেন্দু তুলে আনল। ব্লটিং-পেপারের ধোঁয়া শুঁকিয়ে ফিট ছাড়ল।

হঠাৎ একবার কোনো কারণে ফিট হয়, হতে পারে হয়তো, হওয়া এমন কিছু আশ্চর্যের নয়। বাসনার হয়েছিল। তা বলে আবার, ক'দিন

যেতে না যেতেই ফিট হবে একথা কেউ ভাবে নি। দুর্ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক। কমলা সুধাময়কে বলল। সুধাময় জবাব দিল, বড় খাটাখুটি করেন ছোড়দি। শরীর দুর্বল হলে অমন হয়। আগেও নিশ্চয় ফিটের ব্যায়রাম ছিল ওঁর।

না, ছিল না। কোনোকালেই দিদিকে ফিট হতে দেখে নি কমলা। এমন কি জামাইবাবু যখন মারা গেলেন, তখনও দিদি জ্ঞান হারায় নি, শুধু পাথরের মতন বসেছিল। অদ্ভুত, দুর্বোধ্য চোখ নিয়ে, ঠোঁট কামড়ে।

উপসর্গটা নতুনই। একেবারেই কাল-পরশুর। তবে হ্যাঁ, দিদির শরীর আজকাল যেন একটু খারাপই যাচ্ছে। এ-মাসে ক'টা যেন উপোসও করল পর-পর। কমলা কত বারণ করেছে। বাসনা শোনে নি।

তবু একটা স্মেলিং সল্ট কমলা আনিয়ে রেখে দিল দ্বিতীয়বারের পর। থাক একটা। দরকার লাগতে পারে।

লাগলও কাজে। আবার ফিট হল বাসনা আজ। সেই আটটার সময়ই। কী আশ্চর্য! আর কপাল ভাল যে এই সময়টাতেই হয়, যখন সুধাময় বাড়িতে না থাকলেও অমলেন্দু অন্তত থাকে, বীথিকে পড়ায়। আর খানিক পরে হলে সেও থাকত না, চলে যেত।

ক'বারই অমলেন্দু এই দুঃসময়ে বাড়িতে থেকে, বলতে নেই, কমলাদের উদ্বেগ আশঙ্কাকে যথেষ্ট হালকা করেছে।

আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিটের ঘোর কেটে গেল। আস্তে করে চোখ মেলে প্রথমে কী যেন দেখল বাসনা। চোখ বুজল আবার। সজ্ঞানে ক'বার নিশ্বাস নিল। যদিও আর তেমন কষ্ট হচ্ছে না, তবু কেমন এক গাঢ় অবসাদ রয়েছে। ভার-ভার ব্যথা। কপালে সামান্য একটু যন্ত্রণা। ঠোঁট শুকিয়ে তেষ্টা।

ঘরের বাতিটা নিবনোই ছিল। জানলার বাইরে ম্লান জ্যোৎস্না, মাথার ওপর পাখাটা বাতাস কেটে যাচ্ছে, একটানা মৃদু একটা শব্দ।

খাট ছেড়ে উঠল বাসনা। ভাবল, একবার বাতিটা জ্বালে। কিন্তু

জ্বালাল না। নিজের ঘরের খুঁটিনাটি এখন আর অচেনা ঠেকছে না।

জল গড়িয়ে খেল বাসনা। বিছানায় এসে ধীরে ধীরে বসল আবার। রাত কি অনেক হয়ে গেছে নাকি? কমলাদের কারুর সাড়া-শব্দ শোনা যাচ্ছে না! বারান্দার বাতিটা অথচ জ্বলছে। ঘরে বসেই সে-আলো দেখতে পাচ্ছে বাসনা।

আঁচলে মুখ মুছে, পা গুটিয়ে বসতে গিয়ে হঠাৎ বাসনা ঘাড়ের কাছে বেশ একটু ব্যথা অনুভব করলে। হাত দিয়ে আলতোভাবে জায়গাটা স্পর্শ করতে আচমকা যেন অন্য কিসের ছোঁয়া লেগে গেল। গা শিউরে একটু একটু কাঁটা দিল কোথাও। আর হঠাৎ অদ্ভুত এক লজ্জায় কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে থাকল। বাসনার মনে হচ্ছিল, অত্যন্ত সবল সুস্থ এক পুরুষের কঠিন হাতের স্পর্শ যেন ঘাড়ের কাছে এখনও লেগে রয়েছে।

অস্বস্তির চেয়ে রাগ হচ্ছিল বেশি। কমলাদের ওপরই। কোনো একটা কাণ্ডকাণ্ডি জ্ঞান নেই। যে-সে বাইরের একটা লোক গায়ে হাত দেবে তার, তা বলে! না হয় ফিটই হয়েছিল বাসনার, যেখানে-সেখানে লুটিয়ে পড়েছিল অজ্ঞান হয়ে। তাতে কি? তোমরা কি ধরাধরি করে একটু সরিয়ে দিতে পারতে না! থাকতই বা পড়ে বারান্দায়, দালানে, সিঁড়ির একপাশে বাসনা। কতক্ষণই বা আর। কী-ই বা ক্ষতি হত তাতে? তা বলে ওই অমলেন্দু, যার সঙ্গে বাসনার কোনো সম্পর্ক নেই, কমলাদের একটা দূর-সম্পর্ক থাকলেও থাকুক, সে কোন অধিকারে ওর গা ছোঁবে। আর এমন নয় যে, একবার হঠাৎ একবার এমনটা হল। এই নিয়ে তিন-তিনবার।···প্রথমবার: প্রথম-বারের কথাটা মনে পড়লে এখনও সারা গা কুঁকড়ে জড়সড় হয়ে আসে। সবই শুনেছে বাসনা বীথি-কমলার মুখে। ছি ছি ছি। জল ঢেলে ঢেলে একেবারে নাইয়ে দিয়েছিল কমলারা। মাথা দিয়ে জল গড়াচ্ছিল; গা কাপড় জামা সব ভিজে সপসপে। সেই অবস্থায় অমলেন্দু তাকে তুলে নিয়ে এসেছে। কী বিশ্রী কাণ্ড!

লোকটাকে, মানে এই অমলেন্দুকে বাসনার মোটে পছন্দ হয় না:

া হবার কারণ আছে। চেহারাটা অবশ্য শক্তসমর্থ পুরুষের মতনই,
কিন্তু মুখের কোথাও যদি একটু বুদ্ধির কি ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে?
গাল, নিস্তেজ, হাবা-গোবা গোছের মুখ। বসা নাক, পুরু ঠোঁট, ফুলো-
ফুলো গাল, ছোট কপাল। কোথাও ছিটে-ফোঁটা ধার নেই, উজ্জ্বলতা
না। নির্বোধ, অতি সাধারণ সেই মুখের দিকে তাকালে মনেই হয় না,
লোকটার কোথাও এক বিন্দু ব্যক্তিত্ব আছে। নেই। কিন্তু অন্য
এক জিনিস আছে, যা কদর্য। বাসনা তা জানে, জানতে পেরেছিল।
লোকটা লোভী। তার চোখে সেই লোভ নোংরা খানা ডোবার
টপচানো জলের মতন বুড়বুড়ি কাটে। তাকানো যায় না, গা ঘিনঘিন
করে ওঠে।

বাসনা ক্রমে এসব জানতে পেরেছিল। হ্যাঁ, তখন কিছুদিন, মাস
কয়েক হবে অমলেন্দু এ-বাড়িতে ছিল। সবেই এসেছে কলকাতায়,
এ-বাড়িতে। বীথির ঘরটা ছেড়ে দিতে হয়েছিল তাকে। তাতে
যদিও শোওয়া-বসার অসুবিধে হয় নি বীথির কিন্তু পড়াশোনার আর
অন্য-অন্য অনেক অসুবিধে হচ্ছিল। বীথি বাসনার ঘরেই ছিল সেই
দু'মাস। এক বিছানায় শুতে হত দু'জনকে।

শুয়ে গল্প হত রাত্রে। অমলেন্দুর কথা উঠত, কেন না অমলেন্দু
ঘর আগলে রাখার জন্যে বীথির অসুবিধেই ছিল সবচেয়ে বেশি। আর
রোজই একটা না একটা অসুবিধে দেখা দিত বীথির। কথাও উঠত
সেই ছুঁতোয়।

তার ঘর দখলের জন্যে যদিও অমলেন্দুর ওপর খানিক বিরূপই ছিল
বীথি প্রথম প্রথম—অন্তত মুখে তাই দেখাত, কিন্তু মাঝে-মধ্যে অন্য
সুরেও কথা বলে ফেলত। একদিন বললে, 'বুঝলে ছোড়দি, যত বোকা
দেখায় আসলে লোকটা অত বোকা নয়।'

'কি করে বুঝলি?' বাসনা শুধালো।

'কি করে আবার, ভাল করে দেখলেই বোঝা যায়।' বীথি বেয়াড়া
রকম প্রশ্নের এলোমেলো উত্তর দিয়ে পার পেতে চায়।

আর একদিন বীথি বললে, 'শুনেছ ছোড়দি, আমাদের ওই বোকা-

রাম মশাই শেষ পর্যন্ত চাকরি পেয়েছে।'

'কোথায় ?'

'কলেজে। আমি তো ভেবেই পাই না কি পড়াবে ও ? কে বা ওকে মানবে ?'

'কেন ?'

'যা বাঁটকুলে দেখতে। তার ওপর কথাই বলতে পারে না ভাল করে। তোতলায়। যাই বলো ওকে বাপু প্রফেসার-ট্রফেসার মানায় না।'

'হ্যাঁ, এক তোর পাশেই যা তবু একটু-আধটু মানাবে জোড় পরে দাঁড়ালে—!' বাসনা অন্ধকারেই কেমন করে যেন হাসে। আর যদিও মুখ দেখতে পায় না বীথির, তবু মনে মনে অনুমান করবার চেষ্টা করে কতটা খুশী সেখানে জ্বলে উঠল। 'এই ছোড়দি—।' বীথি অন্ধকারেই খপ্ করে বাসনার মুখ চেপে ধরে। তার গায়ে মাথা রগড়ে, হাত থামচে, ছটফটে ভঙ্গি করে বলে, 'বয়ে গেছে আমার। কখ্খনো না। তুমি কী অসভ্য। কিচ্ছু আটকায় না মুখে!'

'বাসনা আস্তে আস্তে মুখ সরিয়ে নেয়। বীথির সোহাগের আলিঙ্গনও। কিছুই বলে না আর। অন্ধকারে চোখ বুজে শুয়ে থাকে।

কথাটা খুব স্পষ্টভাবে না হলেও, কমলার মুখে এ-রকম একটা আভাষ পেয়েছে বাসনা। সুধাময়ের ইচ্ছে, বন্ধুর সঙ্গেই বোনের বিয়েটা দেয়। কমলারও আপত্তি নেই। বীথিও অরাজী নয়। অবশ্য রাজী না হওয়ার কোনো কারণ নেই। শিক্ষিত, নীরোগ, সুস্থ ছেলে, অবস্থাও খারাপ নয়। এক বয়সে একটু বেমানান হচ্ছে। অমলেন্দুর বয়েস বছর তেত্রিশ, বীথির কুড়ি। বয়সের তফাৎ নিয়ে আজকাল লোকে খুঁতখুঁত করে। আগে করত না। কমলার সঙ্গে সুধাময়ের বয়সের তফাৎও তো প্রায় বছর আষ্টেকের। তা নিয়ে কেই বা কথা উঠিয়েছিল। কী ক্ষতিই বা হয়েছে তাতে। সুখের সংসার কমলার। দু'টি ছেলেমেয়ে।

নিজের তুলনাও বাসনা দিতে পারে। তার আর স্বামীর মধ্যে বয়সের খুব একটা তফাৎ ছিল না। বছর চারেকের। কিন্তু কী লাভ হয়েছে তাতে! সিঁদুর যখন মোছবার, মোছেই; বয়স গুনে মোছে না। নয়তো দু'বছরের ছোট বড় দুই বোনের একজনের কেন মুছল? এ সব ভাগ্য! কপাল!

কাজেই বয়সের কথাটা কিছু নয়, সে বাধাও সত্যি কোনো বাধা নয়। রাজী অরাজীর প্রশ্নে কমলারা রাজী আছেই, বরাবরই থাকবে। এখন অমলেন্দুর ইচ্ছেটা কি, সেটাই জানা দরকার। ওইটেই আসল।

বাসনার ধারণা, অমলেন্দুর ইচ্ছেটা অন্যরকম। বীথি সম্পর্কে তার তেমন কোনো আকর্ষণ বোধহয় নেই। থাকার কথাও নয়। বীথি সুন্দরী নয়, মোটামুটি দেখতে চলনসই। রঙটাও ময়লা। এমনিতেও রোগা।

বরং অমলেন্দুর আকর্ষণ কার ওপর, তার চোখ কার ছায়াটুকু পর্যন্ত লোভীর মতন চুরি করে কৃতার্থ হয়, বাসনা তা জানে। আর হ্যাঁ, বাসনা একাই, আর কারুর জানার কথা নয়। কেউ জানে না।

এ-বাড়িতে থাকার সময় অমলেন্দু বাসনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চেয়েছিল। উন্মুখ হয়ে থাকত। সুযোগ খুঁজত, সুবিধের সদ্ব্যবহার করত। আর যদিও মুখে সেটা প্রকাশ করত না, কিন্তু তার হাবভাব, আচরণে বাসনা ধরতে পেরেছিল।

প্রথমটায় অবশ্য একটু ভুল হয়েছিল। অতটা বুঝতে পারে নি বাসনা। কেই বা পারে! নতুন এল এ-বাড়িতে। সুধাময় খাতির-যত্ন করলে। কমলাও আদর-আপ্যায়নে খুঁত রাখল না। যাদের বাড়ি তারাই যদি মাথায় করে নেয়, তবে বাসনা—এ-বাড়িতে শুধুই যে আশ্রিত, তার মুখ ফিরিয়ে থাকা শোভা পায় না। হয়তো তাতে সুধাময় ক্ষুণ্ণ হত, কমলাও অসন্তুষ্ট হত। হওয়া আশ্চর্য ছিল না।

বীথি যতই বলুক অমলেন্দু কথা বলতে পারে না, তোতলা—বাসনা নিজে জানে এর কোনোটাই নয়. অমলেন্দু। বীথির যত বাড়াবাড়ি। এক রকম ঢঙই। ন্যাকামো। পেটে খিদে, মনে খাই-খাই ভাব,

মুখে জোর করে ঢেকুর তোলা। বাসনা কি আর তা জানে না, না বুঝতে পারে না!

অন্যের বেলায় যাই হোক, বাসনার বেলায় অন্তত অমলেন্দু নিজেই এগিয়ে এসেছিল। আলাপ-সালাপ করতে চেয়েছে। গল্প-গুজব জমাবার চেষ্টা করেছে।

বাসনা এই মাননীয় অতিথিটিকে সরাসরি উপেক্ষা করতে পারে নি। অকারণে রূঢ় হবার উপায় ছিল না এ-ক্ষেত্রে। তাছাড়া তখন কি বাসনা স্বপ্নেও ধারণা করতে পেরেছিল লোকটার আসল রূপ কী কদর্য। না, পারে নি। যদি সে সন্দেহ জাগত, কোনোরকম প্রশ্রয়ই অমলেন্দু পেত না। যেমন পায় নি আরও কয়েকজন, যারা বাসনার আটাশ-বসন্তের অসহায় সৌন্দর্যকে সহানুভূতি জানাবার জন্যে নানাভাবে এগিয়ে এসেছিল। তাদের সমস্ত ছলাকলা অত্যন্ত অনায়াসে এবং অতি নির্মমভাবেই ব্যর্থ করে দিয়েছে বাসনা।

আশ্চর্য, এরা ভেবে নিয়েছিল, বাসনা তার বৈধব্যের ক্লান্তি, শূন্যতার অসহভাব আর বইতে পারছে না। এক কণ্ঠরোধ দুর্বিষহ যন্ত্রণায়, জ্বালায় ছটফট করছে; মাথা খুঁড়ছে। এই বাধা-বন্ধন থেকে মুক্তির লোভ দেখালেই নির্বোধ হরিণী ছুটে আসবে।

ওরা জানত না, কী নিরপেক্ষ মন নিয়ে বাসনা তার বৈধব্যকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং কত সংযত, সুস্থিত চিত্তে। পরম সহ্যগুণে। না, বাসনার মনে কোনো চঞ্চলতা ছিল না, কোথাও কোনো আবিলতা অথবা ব্যর্থতার হাহাকার।

যদিও তিনি নেই, তবু তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার নিষ্ঠা ও একাগ্রতা আছে, বাসনা ভাবতো। আর ভেবে খুশী হত যে, নিষ্কলঙ্ক আত্মনিবেদন এবং পবিত্রতার মধ্যে যে স্নিগ্ধতা আছে, আর শান্তি—বাসনা তা একান্তভাবেই উপভোগ করছে। সমস্ত শূন্যতা এতে ভরে গেছে। অনবয়ব উপস্থিতি নিয়ে স্বামী তাকে ঘিরে রেখেছেন, রাখবেন।

শুচিতার এক আশ্চর্য বিভায় বাসনা একটি প্রদীপের মত জ্বলছিল এবং লোভী পতঙ্গদের সাধ্য ছিল না সে বিভা অতিক্রম করে।

অমলেন্দু সেই সীমা অতিক্রম করতে চেষ্টা করেছে তখন। এ-
াড়িতে যখন ছিল।

প্রথমে একদিন কিছু ফুল কিনে এনেছিল অমলেন্দু। বারান্দায়
দেখা। পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে বাসনা তাকে দেখল।

'বাঃ, সুন্দর ফুল তো!' নরম করে হেসে বাসনা বলেছিল। আর
লে দাঁড়ায় নি, তার নিজের ঘরেই আসছিল। পিছনে পায়ের শব্দও
থামে নি, এগিয়ে এসেছে।

ঘরে ঢুকে বাসনা আবার ফিরে তাকালো। অমলেন্দু এসে
াড়িয়েছে। বাসনা কথা না বললেও একটা প্রশ্ন তুলেছিল চোখে।

ফুলগুলো এগিয়ে দিয়ে অমলেন্দু বলল, 'কাল যে বলছিলেন, নিয়ে
এলাম।'

বাসনা অবাক। কাল সে কী বলেছে? ও, হ্যাঁ—মনে পড়েছে।
ক প্রসঙ্গে ফুলের কথা ওঠায় কাল বলেছিল বটে বাসনা সকলের
ামনেই। অমলেন্দুর হাত থেকে ফুল নিয়ে বাসনা বলল, 'আমি তো
আপনাকে ফুল আনতে বলি নি, বলেছিলাম এ-সময়ে চাঁপাফুল পাওয়া
যায় না।'

'দেখছেন তো পাওয়া গেল।' অমলেন্দু হেসে বলল, 'চেষ্টা করলে
কি না পাওয়া যায়।' 'কি-না' শব্দটার ওপর কেমন এক ঝোঁক দিল।
বাসনার অন্তত তাই মনে হয়েছিল।

আর একদিন।

স্নানে যাবার আগে অমলেন্দু ঘরে এসে দাড়ি কামাচ্ছে। টেবিলের
মুখের সামনে ছোট আয়না, সাবান, ব্রাশ, জল, ক্ষুরের খোলা বাক্স।
সরসর করে অক্লেশে অমলেন্দু গালের ওপর দিয়ে ক্ষুর চালিয়ে, থুতনি
তুলে গলার কাছে হাত এনেছিল। বাসনা চায়ের পেয়ালা হাতে এসে
দাঁড়িয়েছে। অমলেন্দু অতি মসৃণ গতিতে গলার আশে পাশে ক্ষুর
চালিয়ে যাচ্ছে। দেখে, কে জানে কেন, বাসনার হঠাৎ কেমন গা
শিউরে উঠল। অস্ফুট একটা শব্দ করতেই অমলেন্দু মুখ ফেরাতে গেল।
গলার একটু ওপরেই ক্ষুরের ধার বসে ফিনকি দিয়ে রক্ত। বাসনা সেই

রক্ত দেখে চমকে উঠেছে। অমলেন্দু তোয়ালেটা বুঝি খুঁজছিল। বাসনা কি করবে বুঝতে না পেরে হঠাৎ তার আঁচল দিয়ে চেপে ধরল জায়গাটা। রক্তে থানের খানিকটা টকটকে লাল হয়ে ভিজে উঠল।

'ইস্, কী করলেন, কাপড়টা নষ্ট করলেন যে!' বলল অমলেন্দু। আর বলে কেমন এক চোখ নিয়ে তাকালো।

হুঁশ আসতে সটান ঘরে ফিরে গেল বাসনা। সাদা ধবধবে থানের একটা পাশের একটি জায়গা লাল হয়ে গেছে। কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে। বাসনার বুক কাঁপছিল। শাড়িটা লুকিয়ে রেখে দিতে হয়েছে বাসনাকে। সকলের চোখের সামনে ওটা বের করতে পারে নি। পরে কখন যেন সবার আড়ালে লুকিয়ে কলঘরে নিয়ে গিয়ে কেচে এনেছে। রক্তটা তখন শুকিয়ে কেমন যেন দাগ ধরেছিল। আর বাসনার চোখে বিশ্রী লাগছিল সেই দাগ।

অমলেন্দু ঘটনাটা ভুলতে পারে নি। সন্ধ্যেবেলা দেখা হতে বলল, 'আপনি তো বড় ভীতু!'

'কেন?'

'তাই দেখলাম।'

'আপনিও বড় অসাবধানী।' পালটা জবাব দিল বাসনা।

কিন্তু অমলেন্দুর চেয়েও বাসনা যে অনেক বেশি অসাবধানী একথা কি বাসনা জানত!

টুক করে আলো জ্বলে উঠল বাসনার ঘরে। চমকে উঠে বাসনা চাইল। অমলেন্দু নয়, কমলা।

বাসনার ফিট ছেড়েছে, জেগে শুয়ে আছে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কমলা পাশে এসে দাঁড়ল।

'কেমন আছ এখন, ছোড়দি?'

'ভালো।' নড়েচড়ে পাশ ফিরলো বাসনা।

বিছানায় বসল কমলা। বাসনার কপাল থেকে ক'টা চুল সরিয়ে

আর ভিজে চুলগুলো আঙুল দিয়ে ফাঁক করে দিতে দিতে বলল, 'খুব দুর্বল লাগছে, না?'

'একটু—' অন্য দিকে তাকিয়ে জবাব দিল বাসনা।

'বীথি দুধ গরম করে আনছে, আর কিছু খাবে?'

'না।'

'সারা রাত খালি পেটে থাকবে দুর্বল শরীরে? কিছু সামান্য মুখে দাও।'

হাত নাড়ল বাসনা। বলল, 'খেলেই বমি হবে।'

একটুক্ষণ চুপচাপ। কমলা বলল, 'তোমার শরীরটা কিছুদিন ধরে বড় ভেঙে পড়েছে, ছোড়দি। কি হয়েছে তোমার কিছু বলো না। একটা রোগ-টোগ বাঁধালে নাকি।' একটু থেমে বলল আবার, 'তোমার কি হজম-টজম হচ্ছে না, অম্বল হয়?'

'কেন?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। নিশ্চয় অম্বল-টম্বল হয় তোমার। চোরা অম্বল, কি ওই রকম কিছু। পেট-টেট জ্বালা করে, বুক?'

বাসনা হঠাৎ যেন বড় বেশি চমকে উঠল। ফ্যাকাশে মুখে বলল, 'কে বলল তোকে! না, আমার কিছু হয় নি।'

'হয় নি বলো, ওদিকে ফিট হলে এমনভাবে পেট গুটিয়ে হাত দিয়ে মুচড়ে থাক, দেখলেই মনে হয় যন্ত্রণা পাচ্ছ খুব।' কমলা বোনের মুখের দিকে অল্পক্ষণ চেয়ে আরও অন্তরঙ্গ সুরে বলল, 'এত অত্যাচার তুমি করো। কথায় কথায় উপোস। অত বেলায় খাওয়া। শরীরে সইবে কেন! ওরা বলছিল, পেটের জন্যেই এসব হচ্ছে। ঘা-টা হচ্ছে হয়তো কিছু, খুব যন্ত্রণা যখন হয় সহ্য করতে পার না, ফিট হয়ে পড়।'

'ওরা বলছিল বলেই তাই হবে?' বাসনা একটু রুক্ষস্বরে বলল।

'না হলেই ভাল। কাল একবার ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই।'

'না।' কঠিন স্বরে বাধা দিল বাসনা।

'কেন?' কমলা অবাক।

'অযথা আমি ডাক্তারই বা দেখাবো কেন ? মিছিমিছি আমাকে কতকগুলো ওষুধ-বিষুধ গেলাতে চাস ?'

'কী মুশকিল, তোমার কি হয়েছে সেটা তো জানতে হবে ?'

'কিছু হয় নি আমার !'

'না হলে হঠাৎ ফিটের ব্যায়রাম ধরবে কেন ?'

বাসনা চুপ। জবাব খুঁজে পাচ্ছিল না।

।। দুই ।।

পরের দিনই সুধাময় ডাক্তার এনে হাজির করল। বাসনার মুখ গম্ভীর হল। অদ্ভুত একটা ভয়ে তার শরীর অবশ হয়ে আসছিল। কিন্তু উপায় ছিল না কিছু। বাড়ির মধ্যে একটা বিশ্রী কাণ্ড করাও যায় না। বিছানায় এসে চাদর ঢাকা দিয়ে শুতেই হল বাসনাকে সমস্ত উদ্বেগ বিবক্তি ভয় কোনোরকমে চাপা রেখে।

ডাক্তার মানুষটি ভালই বলতে হবে। একবার বুক দেখলেন চোখের তলা আর জিভ, পেট টিপলেন আলগা হাতে।

কি হয়, ফিট ! আর কিছু না। যন্ত্রণা হয় বুকে ? হয় না, ভাল। পেটে যন্ত্রণা, কি রকম যন্ত্রণা, জ্বালা করে, না কনকন—? করে না। একটু-আধটু চিনচিন। দ্যাটস্ নাথিং। আমাদের বাঙালী পরিবারের বিধবা মেয়েদের যা খাওয়া-দাওয়া তাতে পেট চিনচিন বা একটু-আধটু ব্যথা, জ্বালা—ওসব করবেই। অন্য কোনোরকম গোলমাল, কষ্ট-টষ্ট ব্যথা-ট্যথা ? ভাববেন না। কিছু হয় নি। নো আলসার। নাথিং এলস্। শরীরটা দুর্বল। খাওয়া-দাওয়া, রেস্ট, অ্যাম্পল রেস্ট, মনের ফুর্তি। মাস খানেকের মধ্যে সব সেরে যাবে।

বাসনা বলল কমলাকে, 'কি, স্বস্তি হল তো তোর। বলেছিলাম আগেই কিছু হয় নি আমার।

'তবু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। যাকগে, এখন কিছুদিন তোমার অযথা

গাধার খাটুনি আর পাঁজি খুঁজে খুঁজে রাজ্যের উপোস-টুপোস একটু কমাও তো।'

'হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব সারাদিন! কি যে বলিস তুই, কমলা।'

'থাকলেই বা হাত-পা গুটিয়ে বসে। আমরা তু'টো মেয়েমানুষ আছি বাড়িতে। ঝি-চাকর আছে।'

'তা আছে। তবু—!'

'দেখ ছোড়দি, আগে শরীর, তারপর সংসার-ধর্ম!' কমলা বলল গম্ভীর মুখে।

বাসনা হাসল। 'চুপচাপ শুয়ে থাকলে আমি মরে যাব।'

'তা যাও!' কমলা অক্লেশে বলল।

সেদিন সন্ধ্যের পর ছাদে পায়চারি করছিল বাসনা। বেশ হাওয়া। ফুরফুর করে বয়ে যাচ্ছে। একটু চাঁদ উঠে এসেছে এরই মধ্যে। একরাশ তারা জ্বলজ্বল করছে। এ-বাড়ি থেকে ট্রাম দেখা যায় না, তার শব্দটা শোনা যায়। আরও কত বিচিত্র শব্দ। কেউ গলা সাধছে, কারুর বাড়িতে রেডিও বাজছে। একটা ট্যাক্সি হর্ন বাজিয়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল, রিক্সা যাচ্ছে ঠুং ঠুং। তাড়া খেয়ে একটা কুকুর কেঁউ-কেঁউ করে পালালো।

বাসনা আলসের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ সব শুনছিল। তার চোখে এইসব বিচিত্র ছেঁড়া-খোঁড়া নকশা ভেসে উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ চোখের সামনে সেই ম্লান জ্যোৎস্নায় যেন কাকে দেখে চমকে উঠল বাসনা। অমলেন্দু।

এগিয়ে এসে অমলেন্দু বলল, 'আপনি ছাদে? কী আশ্চর্য?'

বাসনা সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

'পড়ানো হয়ে গেল?' চোখ নামিয়ে বলল বাসনা মৃদু গলায়।

'কই আর। বীথি ফেরে নি এখনো বন্ধুর বাড়ি থেকে।'

একটু চুপ। অমলেন্দু বলল তারপর, 'আজ বেশ ভালোই আছেন তাহলে। শুনলাম ডাক্তারও এসেছিলেন।'

'কিছু হয় নি আমার।' হঠাৎ কেমন যেন অযথা জোর দিয়ে বলল বাসনা কথাটা, অহেতুক।

'হয়তো হয় নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ!'

'কেন?'

'যা সব লক্ষণ দেখছি!' অমলেন্দু একটু হাসল।

সমস্ত শরীরটা বিশ্রী এক ভয়ে শিউরে উঠে কাঁটা দিল। বাসনা চুপ। 'লক্ষণ' শব্দটা কানের কাছে বাজছে তখনও।

'আমি নিচে যাচ্ছি।' বাসনা বলল হঠাৎ, অস্বাভাবিক রুক্ষস্বরে।

'নিচে কেন, এই তো বেশ ফাঁকায় ছিলেন।' সরলভাবে বলল অমলেন্দু খানিক অবাক হয়েই।

'ভাল লাগছে না।' বাসনা কী ভাবে যে বলল জড়িয়ে মিশিয়ে, অমলেন্দু হয়তো বুঝতেই পারল না পরিষ্কার করে।

অমলেন্দুর একটু ভয়ই হল। হঠাৎ শরীর খারাপ হল নাকি আবার। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে যদি আবার মাথা ঘুরে টলে পড়ে যায় বাসনা। পিছন পিছন এল অমলেন্দু।

না, বাসনা মাথা ঘুরে পড়ল না, দোতলায় নেমে সটান ঘরে গিয়ে ঢুকল।

অমলেন্দু অবাক হচ্ছিল। অদ্ভুত মেয়ে এই বাসনা। যেন কিসের এক ঘোরে রয়েছে। কোনো প্রাণ নেই আচার-ব্যবহারে। কেমন যেন!

রাত্রে আর ঘুম আসছিল না বাসনার। জানলা খোলা, চাঁদের আলো এসে খাটের পায়ের কাছে পড়েছে। হাওয়াও দিচ্ছে, ফ্যানটাও চলছে আস্তে, তবু কেমন এক গুমোট, অস্বস্তি বাসনার। পেটের সেই ব্যথাটা আবার কনকন করে উঠেছে। কেমন যেন গা বমি-বমি করছে। খানিকটা বাতাস গলার মধ্যে এসে গুটলি পাকিয়ে রয়েছে। আর কোমর থেকে পা দু'টো যেন টাটিয়ে উঠেছে।

বিছানার মধ্যে ছটফট করছিল বাসনা। এ-পাশ ও-পাশ। দু'দু'টো বালিশ পেটের মধ্যে চেপে ধরেছিল।

আবার জল খেয়ে বমি-বমি ভাবটা অনেক কষ্টে চাপল বাসনা।

আর, এইবার, এই অন্ধকারে, একা—বাসনা তার মনের লুকনো ঝাঁপি থেকে অত্যন্ত সন্তর্পণে কী যেন তুলে নিল। হ্যাঁ, তুলে নিল, আর তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ দেখল।

সন্দেহটা চাপা পড়েছিল খানিকক্ষণের জন্যে। অন্তত মন থেকে সারা বেলাটা সেই বিশ্রী সন্দেহ ও সরাতে পেরেছিল ডাক্তার দেখে যাবার পর। যদিও বাসনা জানত এবং বিশ্বাস করে নি, এখন, এই সময় ডাক্তার কিছু বুঝতে পারবে। এসব ক্ষেত্রে প্রথমটায় কিছু বোঝা মুশকিল অন্যের। তবু ভয় ছিল বইকি বাসনার। কারণ তার এই অভিজ্ঞতা প্রথম! যাক, সে ফাঁড়া তখন কোনোরকমে পার হয়ে গেছে ও।

কিন্তু নিজের কাছে ফাঁকি দেওয়া কঠিন, বড় কঠিন। আরও কঠিন মনে হচ্ছে এখন, অমলেন্দুর সেই কুৎসিত হাসি-জড়ানো কথাটা শোনার পর: যা সব লক্ষণ দেখছি!

অমলেন্দু কি কিছু বুঝতে পেরেছে নাকি?

বাসনা একটু একটু করে এবং তন্নতন্ন করে সমস্ত মন হাতড়ানোর পর এক জায়গায়, একটি বিশেষ দিনে এসে হঠাৎ হারিয়ে যাচ্ছে। শুধু এই একটি দিনের হিসেবে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। বাসনা তার বৈধব্যজীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে খুঁজে পায়, প্রত্যেকটি রাত্রিকে এবং সেই সব মুহূর্ত ও রাত্রির শুচিতা সম্পর্কে ও নিঃসন্দেহ। কোনো কলঙ্ক এই দীর্ঘ দিনের কোথাও স্পর্শ করে নি। শুধু একটি দিন ··

বাসনা সেই দিনটিকে মনে করতে পারছে। তখন অমলেন্দু এ-বাড়িতে। বীথি ছিল না সেদিন। তার কাকার বাড়ি গিয়েছিল বালিগঞ্জে। তখন কত রাত হবে? বোধহয় বারোটা বেজে গিয়েছিল। ঘুম আসছিল না বাসনার। সাধারণ একটা ব্যথা সেবারে যেন একটু

বেশিই কষ্ট দিচ্ছিল। যদিও তখন তা হওয়ার কোনো কারণ ছিল না তবু। মাথাটাও ধরেছিল এবং বাঁ-বুকের তলায় খানিকটা জায়গা জুড়ে টনটনে ব্যথা আর ফোলা। বাসনা ঘুমোতে পারছিল না, যন্ত্রণায়, কষ্টে। হ্যাঁ, আর এই অস্বস্তি কাটাবার জন্যে বাইরে এসেছিল বাসনা। ফাঁকা উঠোনের বেঞ্চিতে এসে বসেছিল খানিকক্ষণ ঠাণ্ডা হাওয়ায়। হঠাৎ একটা ছায়া দেখে চমকে উঠল বাসনা। মুখ তুলে দেখে, অমলেন্দু।

'কী ব্যাপার, এত রাত পর্যন্ত বাইরে বসে আছেন?' অমলেন্দু প্রশ্ন করল।

'বড় মাথা ধরেছে।' অস্ফুট স্বরে বলল বাসনা, যন্ত্রণায় তার স্বর বুঝি-বা অন্য রকম শোনাচ্ছিল। মুখটাও বিকৃত হয়েছিল হয়তো।

'কষ্ট হচ্ছে খুব?'

'হ্যাঁ।'

কী ভাবল অমলেন্দু। বলল, 'আচ্ছা, দাঁড়ান আনছি একটা জিনিস।'

'কি?'

'চমৎকার একটা ওষুধ। এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বেন, ব্যথা-ট্যথা আর বুঝতেই পারবেন না।'

'ওষুধ?'

'হ্যাঁ, আমারও ওই রোগ আছে কি না! মাঝে মাঝে মাথা গরম হয়ে রাত্রে আর ঘুম আসে না কিছুতেই। তখন খেয়ে নি।' অমলেন্দু আর দাঁড়ালো না। চলে গেল। বাসনা ভাবলে, ভালই হল। একটু ঘুমিয়ে বাঁচব তবু।

অমলেন্দু এল ঘর থেকে। হাতে কাচের গ্লাস। বললে, 'নিন, খেয়ে ফেলুন।'

বাসনা খেয়ে ফেলল ঢক্ করে। কেমন এক কটু স্বাদ। নাক-মুখ কুঁচকে বলল, 'ইস্।'

'বিশ্রী লাগছে?'

'লাগছে বইকি!'

'আর একটু জল খেয়ে নিন তবে।'

বাসনা ঘরে এল জল খেতে।

জল খেয়ে বিছানায় বসল বাসনা। কী শুধুই যে খাওয়ালে। গলার কাছটায় এখনো বিশ্রী লাগছে।

বিছানার ওপর একটু এ-পাশ ও-পাশ করল বাসনা। অপেক্ষা করল যেন ঘুমের। আর হ্যাঁ, খানিক পরেই তন্দ্রা আসছিল, ঝিমুনি ধরছিল।

তারপর কখন যে অসাড়ে ঘুম এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, বাসনা বুঝতেই পারল না। কোনো সাড় ছিল না, সামান্য মাত্র সম্বিত। অচেতন একটা বস্তুর মতন পড়েছিল বাসনা সারা রাত।

গভীর ঘুমের অতল অজ্ঞানতা থেকে জেগে উঠে বাসনা যখন চোখ মেলল, দেখে দরজা খোলা, রোদ এসে ঘর ভরে গেছে।

ইস্, দরজাটা বন্ধ করতে পর্যন্ত খেয়াল ছিল না। কী অকাতরেই ঘুমিয়েছে সারা রাত।

আজ, সেই রাতের কথা ভাবতে গিয়ে বাসনা এখন নিথর হয়ে গেল। সত্যি, তার কোনো জ্ঞান ছিল না শুধু সেই ক'টি ঘণ্টা। আর দরজাও খোলা ছিল। কেউ এসে যদি বাসনাকে উঠিয়ে নিয়ে যেত, তবু জানতে পারত না ও।

জীবনে সেই একবার অসতর্ক হয়ে পড়েছিল বাসনা, স্বেচ্ছায় নয়; তবু। অনিচ্ছায়, সম্পূর্ণ নিজের অজ্ঞাতে। আর সেই অসতর্কতার, ক্ষণিক-মৃত্যুর সুযোগ নিয়েছে, যদি কেউ নিয়ে থাকে তবে ওই অমলেন্দু।

শয়তান, শয়তান কোথাকার! পশু! গা ঘিনঘিন করে ওঠে বাসনার। এত নোংরা, কদর্য হবে ওই বোকা-বোকা মানুষটা কে ভেবেছিল। মনে মনে তার এমন হীন পাশবিক অভিসন্ধি থাকবে, কে জানত!

আর ঈশ্বর, ঈশ্বর কী নিষ্ঠুর, বাসনার ক'টি মুহূর্তের অসতর্কতাও ক্ষমা করতে পারলেন না। করলেন না। কলঙ্কের একটি কীট দংশন

করে চলে গেল। বিষ মিশে গেল রক্তে। বাসনার শিরা উপশিরায় সেই বিষ আজ ছড়িয়ে পড়েছে। চেতনাতেও।

কাঁদছিল বাসনা। গুমরে গুমরে। ফুঁপিয়ে, ছেলেমানুষের মতন।

সকালে চোখ খুলতেই বাসনা দেখল সমস্ত আকাশ ধুয়ে স্বচ্ছ রোদ নেমে এসেছে।

বিছানা ছেড়ে উঠল বাসনা। ভালই লাগছিল মনটা। বাইরে ক'টা কাক ডাকছে। চড়ুই এসে বসেছে জানলায়। শরতের হাওয়া দিয়েছে।

নিয়মিত অভ্যাস। ঘুম-চোখের কোল মুছে ধীরে ধীরে বাসনা এসে দাঁড়ালো টেবিলটার কাছে। থানের আঁচলটা গলায় জড়িয়ে চোখ তুলল। স্বামী। মুখে তার স্মিত হাসি। প্রাণ নেই, ছবি হয়ে আছেন। এই ছবিতে তবু প্রাণ আছে কোথাও। বাসনা সেই প্রাণকে অনুভব করে। সমস্ত শূন্যতা তাতে ভরে যায়; এতকাল গেছে।

আজ আর গলায় কাপড় জড়িয়ে দু'হাত জোড় করে প্রণাম করেও সাধ মিটছিল না। বাসনা ডান হাতটা আস্তে আস্তে বাড়িয়ে ছবিটা তুলে নিচ্ছিল দেওয়ালের পেরেক থেকে। মাথায় ঠেকাবে, বুকে ধরবে, মুখের কাছে, ঠোঁটে ছুইয়ে নেবে। গভীর করে স্পর্শ করবে। আবার। আজ।

খুলে নিয়েছে সবে, হঠাৎ মুখের ওপর ফট্ করে কী যেন ছিটকে পড়ল। পড়েই হাতে শিরশির করে, কিলবিল করে, আবার ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

বাসনা চমকে উঠে হাত ঝেড়ে বুঝি টিকটিকিটাকে ফেলতে গিয়েছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য, ঝন্-ন্-ন করে কাচ ভাঙার আওয়াজ। শব্দটা যেন সমস্ত স্নায়ুতে বেজে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

বাসনা দেখল, শরতের সেই আশ্চর্য নীল মেঘ-গলানো সোনার মত স্বচ্ছ রোদ্দুরে তার স্বামী, স্বামীর ছবি পাপোশের ওপর অসাড়ের মত পড়ে রয়েছে। কাচ-ভাঙা ছড়িয়ে গেছে ঘরের চারপাশে।

॥ তিন ॥

একটা সন্দেহ যদিও কাঁটার মত খচখচ করছিল সর্বক্ষণ, তবু নিঃসন্দেহ হতে পারে নি বাসনা। অন্তত চায় নি। মাঝে মাঝে ও ভাবত, ভাবতে চাইত, এ সন্দেহ মিথ্যে হয়ে যাবে। মনে মনে রোজই ভগবানকে জানাতো; বলত, বাঁচাও ভগবান, এই কলঙ্ক থেকে, এত বড় গ্লানি থেকে।

আর আশ্চর্য, যখন জোর করে ভাবত, ওর মনের ভাব খানিকটা হালকা হত। অবিশ্বাস করার মতন কারণও কিছু কম ছিল না। হয়তো বেশিই ছিল। সেই সব একে একে সাজিয়ে, বিচার-বিবেচনা করে দেখলে, বাসনা উদ্বিগ্ন হওয়ার মতন সত্যিই কোনো কারণ খুঁজে পেত না। সমস্ত বিষয়টাই ওর কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হত। আবার সম্ভাবনার সূত্র দিয়ে বিচার করত যখন, তখন এমন কতকগুলো স্থূল স্পষ্ট কারণ দেখতে পেত, যাতে সন্দেহ আরও গভীর হওয়াই স্বাভাবিক। তবু সমস্ত ব্যাপারটাই যখন সন্দেহ এবং সম্ভাবনা, হয়তো আর হয়তো-নার মধ্যে দুলছে তখন আশা-নিরাশা, হ্যাঁ-না এই দু'য়ের টানা-পোড়েনের মধ্যে বিমূঢ় হয়ে বসে থাকা ছাড়া পথ ছিল না। আর বাসনা, যা স্বাভাবিক, এই মানসিক দ্বন্দ্বের সমাধানের জন্যে শুধু সময়ের মুখ চেয়ে বসেছিল। আরও কিছু সময়, ক্যালেণ্ডারের লাল কালো তারিখ পুরনো না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত কিছুই যেন নিশ্চিন্ত হয়ে উঠছে না।

সংসারের কাজে-অকাজে এই সময় নিজেকে সর্বক্ষণ ব্যস্ত রাখতে চাইত বাসনা। একা থাকতে, একা বসতে চুপচাপ শুয়ে সময় কাটাতে ওর ভয় হত; নিঃসঙ্গ এবং নিষ্কর্ম হলেই মন শুধু ওই এক অপ্রতিরোধ্য আবর্তে এসে পড়ত। কাজের মধ্যে তবু যতটুকু ভুলে থাকা যায়। যদিও বাসনা দেখত, ও-চিন্তা সরাবার নয়, ধিকি-ধিকি জ্বলছে সর্বক্ষণই।

তাছাড়া আর একটা কারণ ছিল। কমলার চোখকে ফাঁকি দেওয়া। সারাদিন বিছানায় গড়াগড়ি করলে বা আর যে উপসর্গ দেখা দিচ্ছে, সেগুলো প্রকাশ করলে যদি কমলা কিছু সন্দেহ করে বসে, তবে ?

অথচ সামনা-সামনি, মুখোমুখি বসে থাকলেও বোনের কাছে সব সময় যেন নিজেকে আড়াল দিয়ে রাখত বাসনা। এমন কি বীথির কাছেও। আর মাঝে মাঝে হঠাৎ চুরি করে ওদের কথা শুনত, ওদের চোখ মুখ দেখত, বোঝবার চেষ্টা করত কমলা বা বীথি ওকে নিয়ে কোনো সন্দিগ্ধ আলোচনা করছে কি না।

সংসারের জন্যে বাসনার অকারণ শরীরপাত কমলার ভাল লাগত না। ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলেছিল, খাওয়া-দাওয়ার যত্ন নিতে। বাসনা তা গ্রাহ্যও করল না, এতে কমলা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। বোনে বোনে এই নিয়ে কয়েকবার রাগারাগি মান-অভিমানের পালা সাঙ্গ হয়েছে, তবু বাসনাকে সংসারের ঘানিটানা থেকে সরিয়ে রাখতে পারে নি কমলা। হতাশ হয়ে সব আশা ছেড়ে দিয়েছে, আর কিছু বলে না। বলবে না, ঠিক করেছে।

আরও যত সময়ের অপেক্ষায় বাসনা ব্যাকুল হয়ে দিন গুনছিল, তেমন সময় এল গেল। আরও দিন, আরও সময়, কী সহজেই এসে শরতের রোদের জলে আকাশে মিলে গেল, হারিয়ে গেল। যদি বা আশা ছিল, কিছু না-র হিসেব—একে একে শুকনো পাতার মত সব ঝরে গেল। বাসনা এইবার, হয়তো এই প্রথম, নিরন্ধ্র এক ভয়ানক অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলল।

বাসনা এবার বেশ বুঝতে পারছিল, অনুভব করতে পারছিল একটা ভার আর যন্ত্রণা পেটের তলায় নেমে এসেছে। উবু হয়ে বসতে পারে না, অসহ্য যন্ত্রণায় যেন মনে হয় কতকগুলো শিরা ছিঁড়ে যাবে।

যদি বিষ জুটত, তাই বুঝি খায় এখন—ভাবত বাসনা। এও ভেবে দেখত, মৃত্যু ছাড়া পথ নেই। কিন্তু বাসনা দেখেছে সব কলঙ্ক মৃত্যু দিয়ে ঢাকা যায় না। বাসনা যদি মরেও যায়, তবু কেউ কিছু

জানতে পারবে না, জানবে না— তা নাও হতে পারে। যেমন যায় নি মাধবী বউদির। মাধবী বউদি তবু তো কত আগেই বিষ খেয়েছিল। মারা গেল বটে, কিন্তু কলঙ্কটা রটে গেল সর্বত্র। পরেই।

মৃত্যু চিন্তাকে একটা লোভনীয় মনে হল না বাসনার। বরং অন্য কোনো পথ…

একদিন মনে মনে যখন এই পথের কথাই ভাবছে বাসনা এক ম্লান বিকেলে, বীথি এসে বসল কাছে।

'চুলটা বেঁধে দাও তো, ছোড়দি।'

চুল বাঁধতে বসে বলল বীথি, দাঁতে ফিতে চেপে, একটা নতুন রকম বিনুনি বাঁধ তো দেখি, কী রোজ একখেয়ে চুল বাঁধা তোমার!'

'আমি কি ফ্যাসান-ট্যাশান জানি, কি করে বাঁধব বল!'

'বা, তা বুঝি আমি বলব!'

'তা কি আমি জানব!'

যত্ন করে নতুন রকমের এক বিনুনি জড়াতে জড়াতে বাসনা বলল, 'হঠাৎ নতুন বিনুনি বাঁধার এত ঘটা কেন!'

'বা, যাব যে এক জায়গায়।'

'কোথায়!'

'জান না তুমি।' বীথি ঘাড় ঘোরাবার চেষ্টা করল, 'থিয়েটার দেখতে।'

'নাকি, কমলাও যাবে?'

'না। আমি আর ' আর যে কে সে-কথাটা বীথি স্পষ্ট না বলে থেমে গেল।

বিনুনি জড়াতে গিয়ে আঙুলগুলো হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। বীথির নাড়াতে চমকে উঠে আবার আঙুলগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল বাসনার। 'আমায় নিয়ে যাবি!' একটু হেসে বলল বাসনা।

'তুমি!' বীথির অবাক-গলার সুর শোনা গেল।

'কেন, আমি যেতে পারি না!'

'বাব্বা, তুমি যাবে বাড়ির বাইরে তাও বেড়াতে, থিয়েটার সিনেমা

দেখতে! এর চেয়ে যদি বলতে ভর-সন্ধ্যায় গঙ্গায় চান করতে যাবে—বীথি হাসল।

'অত কথা কেন, বলছি যাব। নিয়ে যেতে চাস তো বল।'

'আজকে তো হয় না ছোড়দি। টিকিট মাত্র দু'টো।'

'তোর আর অমলেন্দুর।' ঠোঁটে বাঁকানো হাসি বাসনার।

বীথি জবাব দিল না।

'ভয় নেই, তোর মুখের খাবার আমি কেড়ে খাচ্ছি না।'

কথাটা এমন বিশ্রী আর নোংরা-নোংরা শোনালো যে, বীথি মাথা টেনে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে চাইল বাসনার দিকে। আর তাকিয়ে অবাক হল। বাসনার অমন সুন্দর ধবধবে মুখে চামড়া কুঁচকে কেমন এক কালিমা লেগেছে। বীথির কাছে এই দুইই অপ্রত্যাশিত। অমন ইতর রসিকতা ছোড়দি করতে পারে, এও যেমন ভাবা যায় না, তেমনি হঠাৎ অকারণে এত রাগ, এমন বিশ্রী মুখ চোখ হতে পারে বীথি ভাবতে পারে না।

চুপ করে থাকাই উচিত ছিল বীথির। কিন্তু অবস্থাটা হঠাৎ এমন গুমোট আর বিশ্রী হয়ে উঠেছিল যে, কথা না বলেও থাকতে পারছিল না।

'হঠাৎ তোমার রাগের কি হল, ছোড়দি!' বীথি শুধালো।

'রাগ-টাগ আমার হয় নি। ঘুরে বসো। চুলটা শেষ করে দি।'

বীথি ঘুরে বসল না। বলল, 'থাক। ওটুকু আমি ঠিক করে নিতে পারব। কিন্তু কি হয়েছে তোমার, শরীর খারাপ!'

'না!'

'তবে?'

সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে বাসনা উঠল।

'আমার টিকিটটা নিয়ে তুমিই যাও তবে।' বীথি বলল, 'আমি বলে দেব অমলদাকে।'

'তোমার টিকিট না নিয়েও আমি যেতে পারি, বীথি। আর তোমার অমলদার সঙ্গেই।' বাসনা আর দাঁড়াতে পারছিল না বীথির

মুখোমুখি। জানলার কাছে সরে গিয়ে কঠিন হাতে গরাদ ধরে চুপ করে দাঁড়ালো।

বীথি চলে গেল আরও খানিক দাঁড়িয়ে থেকে।

আর সেই ম্লান বিকেল ঘন হয়ে যখন জলকালি অন্ধকার নামছিল, বাসনা তখন ভাবছিল, বীথির অত কৃপণতা এবং গর্ব সে এক নিমেষে ছিনিয়ে নিতে পারে। হ্যাঁ, পারে। অমলেন্দুকে একটু ইসারা করলে কুকুরের মতন তার পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে। বাসনা জানে। আব এও জানে বাসনা—তার চোখ, মুখ, চুল, হাত, শরীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আজও যত সুন্দর, এত সৌন্দর্যের ছিটেফোঁটাও বীথির সমস্ত শরীরেব কোথাও লুকিয়ে নেই। অমলেন্দুব চোখে বীথি একটা বিস্বাদ অভ্যাস। আর বাসনা এক দু'রন্ত লোভ।

হঠাৎ বাসনার মনে হল, অমলেন্দুকে এ-সময় তাব চাই। হাতের কাছে, নাগালের মধ্যে। এই লোকটাকে তার আজ সত্যি সত্যিই প্রয়োজন। একা বাসনা এই নির্যাতন সইবে কেন, অমলেন্দুকেও পাশে থাকতে হবে, আসতে হবে. তার দায়িত্ব তাকেও বইতে হবে।

বাসনা ঠিক করে ফেলল, আজ, আজই অমলেন্দু এলে ও তাকে ডেকে পাঠাবে, এই ঘরে।

॥ চার ॥

অমলেন্দু এল। সুধাময় তখন অফিস থেকে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছে। কমলা কলঘরে। বাসনা চা জলখাবার তৈরি করছে সুধাময়ের। রান্নাঘরে। সাজগোজ শেষ করে বীথি যাবার পথে উঁকি দিল। 'বউদি বেরোয় নি এখনো' আমি যাচ্ছি ছোড়দি!' রান্নাঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পায়ের কাপড়টা একটু টেনে, বিনুনি-জড়ানো খোঁপাটা বাঁ-হাতে ঘাড়ের কাছে ঠিক করতে করতে, এদিক-ওদিক একটু তাকিয়ে বীথি চলে গেল।

বাসনা এক পলক তাকিয়ে বীথির সাজের ঘটাটা দেখে নিয়েছিল।

যাবার সময় বীথি হেজলিন আর সেন্টের উগ্র খানিক গন্ধ ছড়িয়ে গেল। রান্নাঘরের বাতাসে সেই গন্ধ থাকল একটুক্ষণ। বীথির কথার জবাব দেয় নি বাসনা, মাথাও নাড়ে নি। যেন শুনতেই পায় নি কথাটা।

বীথি চলে যেতে বাসনা মুখ তুলল। যদিও বীথি নেই তবু তার শাড়ির খসখস্, গরবিণীর খুশির ভঙ্গিগুলো গা থেকে এখনো ঝড়ে পড়ছে চৌকাঠটার সামনে। আর গন্ধ। বাসনা যেন দেখতে পাচ্ছে —শূন্য চোখে তেমনিভাবে তাকিয়ে থাকল।

বাসনার মনে হচ্ছিল, বীথি যেন ইচ্ছে করেই কথাটা তাকে শুনিয়ে গেল। নিজেকেও সেই সঙ্গে দেখিয়ে গেল। অবশ্য বীথির সাজগোজের দিকে তাকিয়ে বাসনা মনে মনে হেসেছে। দাঁড়কাকের গায়ে ময়ূরের পালক গোঁজার মত দেখাচ্ছিল বীথিকে। ওই তো কালো রঙ, অথচ গায়ে টান-টান করে জাপটেছে মুর্শিদাবাদী জবজবে-রঙ লতাপাতার কাজ করা শাড়ি। মুখে গুচ্ছের স্নো পাউডার। কপালে এক বাহারী টিপ। সব জড়িয়ে মিশিয়ে রূপ যা খুলেছে বীথির, রাস্তায় নেমে অমলেন্দুই না লজ্জায় দু'হাত সরে সরে থাকে।

রূপ যার নেই তার কেন যে অত ঘষামাজা, পেখম-তোলা সাজ বাসনা বুঝতে পারে না। যতই সাজ, বাসনা সুধাময়ের চা ঢালতে ঢালতে ঠোঁট উলটে হাসছিল, ওই রূপ দিয়ে কোনো ছেলেকে ভোলানো যায় না। শুধু কতকগুলো খটখটে হাড়, গালভাঙা চিবুক, ছোট্ট বুক আর ডবল সায়া পরে শরীর ফুলানো—এসব এমন কিছু নয়, যা দিয়ে বেশি দিন ঠকানো চলে। বুঝলে বীথি, বাসনা বীথিকে মনে মনে উদ্দেশ্য করে যেন বলছিল, হাড় নয় মাংসও চাই, ছাঁদ চাই, গড়ন, গঠন। চোখ, নাক, মুখ, ঠোঁট, চুল, বুক, হাত—প্রতিটি অঙ্গ ভরাট হওয়া চাই, সুন্দর আর নরম নধর। তবে!

চা আর জলখাবার নিয়ে বাসনা উঠব উঠব করছে, কমলা এসে পড়ল। গা ধুয়ে কোনো রকমে শাড়ি-জামাটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। এখানো মুখ চুল পরিষ্কার করে নি, জামা-কাপড় পরতে পারে নি গুছিয়ে।

'বীথিরা চলে গেছে ?' কমলা শুধালো।

'কখন !' নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল বাসনা।

কমলা স্বামীর জলখাবারের প্লেট, চায়ের কাপ তুলে নিতে নিতে বলল, 'তোমার চা ঢেলে নাও ছোড়দি। আমি আসছি।'

কমলা চলে গেল। বাসনা নিজের জন্যে চা ঢেলে নিয়ে বসল একটু তফাতে। আঁচ থেকে সরে।

উনুনটা জ্বলছে। অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি চাপানো। ভাতের জল বসেছে। পাশ থেকে গনগনে আঁচের একটু আধটু দেখা যায়। ঘরের মধ্যে কেমন এক হলুদ আলো। বিবর্ণ। জানলার নেটে ঝুল জড়িয়ে অদ্ভুত এক রঙ ধরে গেছে। ফাঁকগুলো পর্যন্ত কালো, চিটচিটে। একটা টিকটিকি জানলার মাথার কাছা-কাছি নেমে এসে যেন বাসনার দিকে চেয়ে লেজ বেঁকিয়ে বসে। ক'টা আরশোলা ফরফর করে উড়ছে। গুমোট গরম উঠছে। হাওয়া নেই।

অন্যমনস্ক মনে বাসনা দেখছিল। আজকাল মাঝে মাঝে বাসনার চোখে রান্নাঘরের এই হলুদ দেওয়াল, মিটমিটে আলো, ঝুল, টিকটিকিটার ক্বচিৎ টিক্‌টিক্ কেমন যেন অন্যরকম মনে হয়। কোথাও কী একটা মিল খুঁজে পেয়েছে বাসনা এই রান্নাঘর আর তার মধ্যে. হয়তো। কেননা আজ বাসনার মনে হচ্ছিল, ওর শরীর মন সমস্তই ওই রকম বিবর্ণ, কালি ধোঁয়ায় মাখামাখি, রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠেছে। কোথাও একটু রঙ নেই, হাওয়া নেই, উজ্জ্বলতা বা বাইরের বাতাস-আলোর সহজ ছোঁয়া। চারপাশ থেকে ও চাপা পড়ে গেছে, অন্ধকারে ডুবে গেছে।

এর জন্যে অবশ্য কাউকে দায়ী করা যায় না। কেউ ওকে বলে নি, তুমি রান্নাঘর ভাঁড়ার আর কমলার ছেলেমেয়ের বায়না আদর আব্দার নিয়ে অন্তঃপুরের আড়াল থেকে আরও আড়ালে সরে যাও। বরং বাসনাকে বাইরের আলো-হাওয়ায় টেনে আনার কম চেষ্টা করে নি কমলা। সুধাময়ও কত বলেছে কতবার। বাসনা সে-সব কথায় কান দেয় নি।

আজকেও, সত্যি সত্যি বাসনা যদি চাইত, অমলেন্দুদের সঙ্গে

অনায়াসেই থিয়েটারে যেতে পারত। কিন্তু বাসনা গেল না। অমলেন্দু-কেও ডেকে পাঠালো না।

বিকেলের ঘটনার পর ওর বিশ্রী লাগছিল। বীথির ওপর মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। মেয়েটা অসম্ভব লোভী, হ্যাংলা স্বভাবের, বাসনা ভাবছিল, বীথির নানা আচরণে খুঁত ধরতে ধরতে। বিয়ে হবে কী না হবে তার ঠিক নেই, অথচ অমলেন্দুর সম্পর্কে এমন সুরে কথা বলে, এমন সব হাবভাব তার, যেন বিয়ে হয়েই গেছে। অমলেন্দুর ওপর ওর কতখানি আধিপত্য আর অধিকার বীথি যেন সব সময় সেটা বোঝাবার চেষ্টা করছে! আর সেই গর্বে গটগট করছে। এইসব মেয়েদের, এই হয়। বিয়ের আগে থাকতেই তাদের বেহায়া রকম গিন্নীপনা। যা দেখলে ঘেন্না ধরে, গা জ্বালা করে।

যদিও অমলেন্দু পড়াবার জন্যে রোজ আসে, আর বীথি বই খাতা-পত্র খুলে বসে তবু পড়াশোনা যে কী হয়, কতটুকু, বাসনা তা জানে। পড়াশোনার এই ভানটা ওপর, আসলে বেহায়া মেয়েটা নির্বোধ এক পুরুষের চোখের সামনে প্রজাপতির মত ফরফর করে উড়ছে, পাখা খুলছে, ছুঁই-ছুঁই খেলা খেলছে। কমলারা যে তা না জানে তা নয়। জানে, বুঝতে পারে সবই। কিছু বলে না। মেলামেশার সুযোগটাই তো তারা দিতে চায় দু'জনকে কাজেই আপত্তি করবে কেন।

আর কারুর না হোক, বাসনার চোখে এ-সব বিশ্রীই লাগে। কমলাদের এই হালফ্যাশানের কায়দা-কানুন তার পছন্দ হয় না। হোক না কেন মেয়ে বড়, অমলেন্দুর সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তাও চলছে - তবু ব্যাপারটা সেই টোপ ফেলে মাছ ধরা ছাড়া আর কী, অন্য কী হতে পারে।

এই যে দু'জনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সন্ধ্যেবেলা, ফিরতে হয়তো রাত দশটা এগারোটা হবে। এতখানি সময় সেয়ানা-বয়সী দু'টি ছেলে-মেয়ে কোথায় গেল, কি করল, কে তার হিসেব রাখছে। একটা কেলেঙ্কারী হতেই বা কী! যা স্বভাব দু'টির, অন্তত, একজনের।

বীথি এত মেতে উঠছে অমলেন্দুকে নিয়ে যে তার নিজের ভালমন্দ

বিচারের জ্ঞানও আর নেই, বাসনা ভাবছিল এবার বীথির কথা। বীথি জানে না। জানা সম্ভবও নয় তার পক্ষে, অমলেন্দু বাস্তবিক কী ধরনের পুরুষ। বীথি কি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারছে, যে-লোকের ওপর ও বিশ্বাস রাখছে—অসহায়তার সুযোগ নিতে তার বাধবে না, বাধে না। আর এই লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত, বদমাশ—একটা পশুই বলতে হবে। তার-চেয়েও যদি কিছু হীন থাকে তবে তাই। বিবেক, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য কোনো কিছুরই মূল্য যার কাছে নেই। বীথি ঠকবে, তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে এক-দিন, যেমন হয়েছে বাসনার।

বীথির ওপর এতক্ষণ পরে বাসনার ধীরে ধীরে একটু যেন সহানুভূতি হচ্ছিল। বাসনা ভাবছিল, এই বোকা, বেহায়া মেয়েটাকে তার সাবধান করে দেওয়া কি উচিত। কমলা'দের কথা ভেবে, সুধাময়ের সংসারের মান-সম্মানের কথা ভেবে, হ্যাঁ, এটা তার কর্তব্য।

বিকেলের প্রসাধন সেরে কমলা এল। বাসনা চমক ভেঙে চাইল।

চা ঢালতে ঢালতে কমলা বলল, ওমা তুমি যে চা খেলে না, ছোড়দি?

নিজের চায়ের কাপটার দিকে চোখ পড়তে একটু যেন বিব্রত হল বাসনা। ভর্তি কাপটা তেমনিই পড়ে আছে, জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে কখন।

উঠল বাসনা। ভাঁড়ার ঘর থেকে তরি-তরকারির ঝুড়িটা নিয়ে এসে কুটনো কুটতে বসল।

কথা হচ্ছিল টুকটাক। কখনো রান্নার, কখনো সংসারের।

কমলা হঠাৎ বলল, 'সেই ওষুধটা তুমি ঠিক মতন খাচ্ছ তো, ছোড়দি, তোমার ভগ্নিপতি জিগ্যেস করছিল।'

'খাচ্ছি।' বাসনা মাথা নাড়ল। তারপর আচমকা বলল, 'পরশু-দিন একটু দক্ষিণেশ্বর যাব ভাবছি, যদি সময় হয় তবে ওই সঙ্গে একবার বেলুড়। অমলেন্দুকে বলব নাকি সঙ্গে যেতে? সময় হবে ওর!'

'তা বল না। সময় ঠিক করে নেবে।' কমলা সহজভাবেই জবাব দিল।

বাসনা খুব খেয়াল করে জবাবটা শুনল। না, কমলা কিছু মনে করে নি। অবাক হয়েছে বলেও মনে হল না। অবশ্য এই প্রথম মুখ ফুটে অনাত্মীয় কারুর সঙ্গে বাইরে যাবার কথা বলল। ওর মনে হয়েছিল, কমলা এ-রকম প্রস্তাবে খুবই অবাক হবে। দেখা গেল, কমলা অমলেন্দুকে অনাত্মীয় পুরুষ বলে মনে করতেই যেন পারল না।

'বীথিদের বিয়ের কি হল?' বাসনা মুখ আড়াল রেখে শুধালো।

'কই, কিছুই না'। কমলা একটু বুঝি হতাশ গলায় বলল।

'কি বলে অমলেন্দু?' বাসনা মুখ ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিল কমলাকে।

'পরিষ্কার করে কেউ তো জিগ্যেস করে নি, ওই বা নিজের থেকে কি বলবে।'

একটু চুপ। বাসনা কী ভেবে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'তোর কী মনে হয় কমলা?'

'কিসের?'

'বীথিকে অমলেন্দুর পছন্দ?'

'মনে তো হয়।'

হয়! বাসনার বুকের কোথা থেকে যেন একটা সতেজ শিরা কট্ করে সাঁড়াসি দিয়ে টেনে ছিঁড়ে দিল কেউ। উনুনের আঁচের আভা না পড়লে মনে হত ওর মুখের সমস্ত রক্ত হঠাৎ যেন শুষে নিয়েছে কেউ, এমনি ফ্যাকাশে, বরফ-সাদা আর ঠাণ্ডা।

কথাটা ভুলতে পারে নি বাসনা। কাঁটার মত বিঁধে খচ্ খচ করছিল। সংসারের কাজকর্ম সারা হলে গা ধুয়ে একটু ছাদেই গেল বাসনা। আর নিরিবিলি, ফাঁকায়, আকাশের দিকে চোখ তুলে ভাবল।

কমলা হয়তো অনুমানেই কথাটা বলেছে। কিংবা হয়তো কিছু তার চোখে পড়ে থাকবে যাতে মনে হয়েছে বীথিকে অমলেন্দুর পছন্দ। বলতে কি বাসনার চেয়ে কমলাই ওদের খোঁজ বেশি রাখে, রাখতে

হয় তাকে। হয়তো বীথিই বলেছে নিজের মুখে। কিছু বলা যায় না. যা বেহায়া মেয়ে।

অসম্ভব নয়। সবই সম্ভব। এত মেলামেশা, পাশাপাশি মুখোমুখি বসা, গল্প, হাসি, তামাশা।—এ-সবের পর বীথিকে হয়তো ভালই লেগেছে অমলেন্দুর। বিশেষ করে যখন বিয়ের কথাটাও জড়িয়ে রয়েছে দু'জনের মধ্যে। অমলেন্দুর মতন হালকা স্বভাবের ছেলের, মেয়ে দেখলেই যার জিভ দিয়ে জল পড়ে, তার পক্ষে বীথিও যা বীথির চেয়েও কদাকার কোনো প্রীতি, রেণু, বেণু সবই সমান।

বাসনা ভাবছিল, যদি এমনই হয়, বীথির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে অমলেন্দু শেষ পর্যন্ত বীথিকেই ভালবেসে ফেলেছে, তবে?

কথাটা ভাবতেই অদ্ভুত এক ভীত অনুভূতি বাসনার সমস্ত বুকটাকে যেন ভীষণভাবে আঁতকে দিয়ে একরাশ ধুলো-বালি চোখে গলায় ছিটিয়ে করকরে জ্বালায় আর টনটনে চাপা ব্যথায় ভরে বিহ্বল করে গেল। নিশ্বাস নিতেও ভুলে যাচ্ছিল বাসনা। কেউ যেন মুঠোর মধ্যে মুচড়ে ধরেছিল ফুসফুস। মোচড় দিচ্ছিল নির্দয়ের মত।

বীথিকেই ভালবাসল অমলেন্দু। সেই বীথি। যার রূপ নেই, রুচি নেই। কিছুই যার নেই। অত্যন্ত সাধারণ, ফাজিল গোছের একটি মেয়ে। হাজারটা খুঁত যার চেহারায়, স্বভাবে, চলনে-বলনে।

ছি, ছি, ছি! অমলেন্দুর কী চোখও নেই। সামান্য একটা রুচিজ্ঞানও তো থাকে মানুষের। কি দেখে ভালবাসল ওই কালো, রোগা, নির্লজ্জ মেয়েটাকে। ভালবাসার মতন মেয়ে কি চোখে পড়ল না আর তোমার। বিয়ে করতে হবে বলে কোনো বাছবিচার নেই, যা হাতের কাছে জুটবে, তাই। বাসনার ঘিনঘিন করছিল। নাক, চোখ, ঠোঁট কুঁচকে উঠছিল।

কী ভাগ্য করেই এসেছিল বীথি। কত সহজে, কী অনায়াসেই ওর মতন মেয়েও একটি পুরুষের ভালবাসা পেয়ে গেল। বীথি সেই গরবে গরবিনী। অমলেন্দুকে কৃপণের মতন আগলে রেখেছে। তার কাছ থেকে কেউ এক ফোঁটা নেয় বীথির তা সহ্য হয় না।

বীথিকে ঈর্ষা করছে বাসনা—ভীষণভাবে ঈর্ষা করতে শুরু করেছে বেশ বুঝতে পারল ও, এখন, এই অন্ধকারে ছাদে বসে, একা একা। বাস্তবিকই আশ্চর্য এক ঈর্ষা কেমন করে যেন আস্তে আস্তে বাসনার মধ্যে এসে গেছে। কেন?

অমলেন্দু বাসনার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, বাসনার মনে হতেই সেই দূরত্বটা যেন চোখের সামনে দেখতে পেয়ে বাসনা ভয় পেয়ে অস্ফুট একটা শব্দ করল।

অমলেন্দু যে নাগালের বাইরে চলে গেল। বাসনা ঢুকঢুক বুক নিয়ে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিল চারপাশে। হাত বাড়াচ্ছিল। কাউকে ছোঁয়া যাচ্ছে না, ধরা যাচ্ছে না।

কি হবে, আমার কি হবে? গলায় কান্নার আবেগ জমা হয়ে কাঁপছিল, বাসনা হাতের মুঠো মুখে চেপে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। সামনেটা ঝাপসা হয়ে গেছে। আলো নেই, জ্যোৎস্না নেই, মেঘও না—একটা কালো পুরু ছায়া, জলের ট্যাংকটা শুধু নিরেট যবনিকার মতন পড়ে আছে।

আমার কি হবে, আমার? আমার সন্তানের, আমার সম্মানের? বাসনা প্রাণপণে আঙুল কামড়েও দমকা উথলে-ওঠা কান্নার আবেগ থামাতে পারছিল না। কাঁদছিল অসহায়ের মতন। করুণ একটা গোঙানি তুলে, ফুঁপিয়ে।

বড় দেরি হয়ে গেছে, বাসনার বুক একটু হালকা হলে ও ভাবল। অমলেন্দুকে আরও আগে থাকতেই কাছে টেনে নেওয়া উচিত ছিল। এখন ঘৃণা করার সময় নয়। ওকে পাশে রাখার সময়। বিপদে একমাত্র অমলেন্দুই তো সম্বল। অন্তত লোকটাকে কাছে না রাখলে দরকারের সময় কার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেবে বাসনা, কাকে দায়ী করবে—করতে পারবে। আমি অন্যায় করি নি, দোষ আমার নয়, অন্য একজন দায়ী এ-কথা বলার মধ্যেও অনেকটা দোষ-স্খালনের শান্তি আছে। ধরে রাখতে হবে অমলেন্দুকে শুধু তাই। শুধু এই বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হতে। লজ্জা ঢাকতে।

আমায় নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে তোমায় আমি দেব না! কিছুতেই না। বাসনা বলল যেন অমলেন্দুকে মনে মনে, বীথিই সব নয় তোমার। আমি আছি, আমরা।

॥ পাঁচ ॥

পথে বেরিয়ে আড়ষ্ট পায়ে পথ হাঁটছিল বাসনা। অস্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে। অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে রাস্তায় বেরুনো এই প্রথম। অমলেন্দুকে এগিয়ে রেখে ছাড়া ছাড়া একা একা ভাবে এগুচ্ছিল বাসনা। মুখ নিচু করে। অমলেন্দু বড় রাস্তায় পড়ে দাঁড়ালো। কী যেন জিজ্ঞেস করল, বাসনা শুনতে পেল না, ভাল করে জবাবও দিল না।

স্টপে দাঁড়ালো এসে স্থাণুর মতন। মুখে রোদ লাগছিল। তেতে উঠছিল মুখটা। বিকেলের রোদে এত ঝাঁঝ কেন বাসনা বুঝতে পারছিল না। মাথাটা টিপটিপ করছে।

ট্রাম আসতে উঠল। বাসনার জন্যে জায়গা ছিল মেয়েদের সীটে, অমলেন্দুর জন্যে ছিল না। বাসনা বসল। বসেই জানলার বাইরে মুখ ঘুরিয়ে নিল। সারাটা পথ অমলেন্দুর দিকে একটিবারও তাকালো না।

শ্যামবাজারে নেমে অমলেন্দু বলল, 'বাসে বড় ভিড় হবে, একটা ট্যাক্সি করি, কি বলেন?'

মাথা নেড়ে সায় জানালো বাসনা।

ট্যাক্সিতে পাশাপাশি দু'জন। মাঝখানে জায়গা রেখে পাশ ঘেঁষে বসে। দু'জনেই চুপ। অন্যদিকে তাকিয়ে। অমলেন্দু সিগারেট ধরালো। কয়েকটা টান দেবার পরই কানে গেল, সামান্য একটু কাশল বাসনা। তাকালো অমলেন্দু। মুখের কাছে হাতের মুঠো তুলে বাইরে তাকিয়ে বসে রয়েছে বাসনা।

'কাশছেন যে! ধোঁয়া লাগছে নাকি?'

'না।' মাথা নাড়ল বাসনা।

'তবু রক্ষে। নয়তো আস্ত সিগারেটটাই ফেলে দিতে হত।' অমলেন্দু হাসল।

'দিতেনই বা!' বাসনার ঠোঁট থেকে আচমকা কথাটা খসে পড়ল। নিজেই অবাক হল বাসনা। অমলেন্দুর দিকে চাইল, চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। না, অমলেন্দু কথাটা ঠিক ধরতে পারে নি। আশ্চর্য, বাসনাই বা হঠাৎ এমন তরল, ঘনিষ্ঠ সুরে কথা বলল কি করে!

পিচের রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সিটা উড়ে চলেছে। কানের কাছে ক'টা ভোমরা যেন গুঞ্জন করছে একটানা; দোলা লাগছে থেকে থেকে, গা নড়ছে, মাঝে মাঝে পাশে হেলে পড়ি-পড়ি ভাব। মসৃণ একটা গতি যেন দেহেও অনুভব করছিল বাসনা। অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে। একটা বাগান-ঘেরা বাড়ি হুট্ করে মুখ বাড়িয়েই পিছু হটে গেল; গাছের সারি, ইলেক্‌ট্রিক্ পোস্ট পলকে সরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাস, লরী, মটর, ট্যাক্সি তীরের বেগে গায়ের পাশ কাটিয়ে এক দমকা ধুলোমেশা হাওয়া ছুঁড়ে উধাও।

'আজ কী?' অমলেন্দু প্রশ্ন করল।

বাসনা মুখ ফেরালো। অমলেন্দুর চোখে হালকা মতন হাসি। কথাটা ঠিক ধরতে পারছিল না বাসনা। চেয়ে থাকল।

'আজ কী দক্ষিণেশ্বরে, বিশেষ কোনো পুজোটুজো হচ্ছে?' অমলেন্দু বলল আবার।

'কিসের পুজো! কই জানি না তো!' বাসনার ঘন ভুরুর রেখা সহজ হয়ে এল।

'জানেন না। তবে যে হঠাৎ?' অমলেন্দুর বিশ্বাস হচ্ছিল না।

'এমনি। বেড়াতে যাচ্ছি।' বাসনার মাথার কাপড় খসে খসে পড়ছিল হাওয়ায়। ক'বারই তুলেছে। আর তুলল না।

'বেড়াতে!' অমলেন্দু কৃত্রিম বিস্ময়ের মুখভঙ্গি করল। হাস্যকর দেখাচ্ছিল সেই বিস্ময়বিস্ফারিত মুখভঙ্গি। নজর করে দেখছিল বাসনাকে। বলল, 'বলেন কি, এমন দুর্মতি হঠাৎ!'

'হওয়া আশ্চর্য কী! সঙ্গদোষ!' বাসনা নিচের ঠোঁট দাঁতে চেপে

সরু শিখার মত একটু হাসি ওষ্ঠকোণে ছড়িয়ে দিয়ে জবাব দিল। লোকটা যে দুর্জন, কেমন ঘুরিয়ে তা বলা গেল।

অমলেন্দু রীতিমত অবাক হচ্ছিল। বাসনার মুখ থেকে এমন স্পষ্ট, সপ্রতিভ জবাব শোনা যাবে, ও আশা করে নি।

আর বাসনা নিজের জবাবে নিজেই খুশী হচ্ছিল। হ্যাঁ, ও পারে। এখনও ইচ্ছে করলে বাসনা মনের মতন করে, সুন্দর, সরস কথা বলতে পারে। বেশ সহজভাবেই। কষ্ট হয় না, কথা আটকায় না।

আমাকে, বাসনা ভাবছিল, কথা বুনতে হবে, সুন্দর করে, যা অমলেন্দুর ভাল লাগবে, তাকে খুশী করতে পারবে। আর সে-কথা মুহূর্তেই ফুরিয়ে যাবে না। অমলেন্দুর কানে বাজবে, মনের পরদায় কাঁপবে। ও মুগ্ধ হবে।

বাসনার মনের ভাবটা অনেকটা এইরকম, ও যেন একটা ছুঁচের কাজে হাত দিয়েছে কাউকে দেবে বলে, আর সেই কাজের নক্‌শা, কী বুনন, কী রঙমেলানোর কাজটা অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে, একমনে শেষ করতে চায়। দক্ষতার সঙ্গে।

খানিকটা পথ আরও ছাড়িয়ে এসে কী ভেবে অমলেন্দু বলল, 'আমি কিন্তু মন্দিরে ঘুরছি না। ফাঁকা দেখে গঙ্গার ঘাটে বসে থাকব। ধর্ম-টর্ম যা করবার আপনি সারবেন।'

'না পারলেন ঘুরতে। আমি কি বলেছি আমায় আগলে নিয়ে ঘুরুন।' বাসনা সামনে তাকিয়ে প্রথম কথাটা বলল, একটু থামল, আড়চোখে তাকালো অমলেন্দুর দিকে, একটু যেন আহত হওয়ার মতন সুর তুলল গলায়, আবার চোখ ফিরিয়ে বাইরে তাকালো।

মোড় ঘোরার মাথায় গাড়ি হঠাৎ থেমে গেলে। সামনে পর পর কতকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে।

গলা বাড়িয়ে অমলেন্দু বলল, 'কী হল, অ্যাকসিডেন্ট নাকি?'

বাসনা এ-পাশে জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা রঙীন পোস্টার দেখছে সিনেমার। অশ্বত্থগাছের গায়ে আঁটা। একটি নবারূঢ় মেয়ের মুখ দু'হাতের মধ্যে তুলে একদৃষ্টে হাসি হাসি মুখে

তাকিয়ে রয়েছে একটি ছেলে। মেয়েটির মুখেও লজ্জা আর খুশীর উজ্জ্বলতা। ভীরু ভীরু চোখ। ভালই লাগছিল বাসনার।

অমলেন্দু আবার কী বলল। বাসনা মুখ ঘুরিয়ে তাকালো।

ট্যাক্সিটা সামান্য পিছু হটে সোঁ করে পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। পিচের রাস্তায় উঠে মসৃণগতিতে এগিয়ে চলল আবার।

'দেখলেন তো কাণ্ড। রাস্তার মধ্যে দু'টো ষাঁড়ে লড়াই বাঁধিয়েছে।'

'তাই নাকি।' বাসনা হাসল।

'আহা, দেখলেন না! কী রণরঙ্গ মূর্তি দু'টোর!' অমলেন্দু হাসছিল।

'আপনি দেখুন।' বাসনা সোজাসুজি চোখে চেয়ে চেয়ে ঠোঁট কামড়ে হাসল এবং মনে মনে বলল, আরও কত রণরঙ্গিনী মূর্তি তোমায় দেখতে হবে, তুমি জান না। আজকের পর, এই বেড়িয়ে ফেরার পর বীথি কী রকম ফোঁস-ফোঁস করবে, তুমি তা আন্দাজ করতে পারছ না। তা বলে আর বীথির আঁচলের তলায় তোমায় লুকোতে দিচ্ছি না। দেব না। একবার যখন পথে বেরিয়েছি—বাসনা দৃঢ় সিদ্ধান্তে মন শক্ত করছিল, এই পথ থেকে অন্য পথে, নতুন রাস্তায় তোমার পাশে পাশে আমি আছি। পায়ে পায়ে। আমায় থাকতে হবে। তোমায় চোখের আড়াল করব, সে-সময় আর আমার নেই, সে বিশ্বাসও আর না।

একটু কুঁজো হয়ে পেটে চাপ পড়ে এমনভাবে সামনে ঝুঁকে বসল বাসনা। কনকনে ব্যাথাটা পাক্ দিয়ে গেছে পেটে। আবার।

মন্দিরের সামনে নেমে গাড়ি ছেড়ে দিল অমলেন্দু। বাসনা দাঁড়িয়ে থাকল। মাথায় ঘোমটা নেই। কপালে, গালে কতক চুলের গুচ্ছ জড়িয়ে গেছে। মাথাটাও একটু উস্কখুস্ক। খোঁপাটা ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়েছে। গলার সরু হারটা চিকচিক করছিল। সুন্দর সহজ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল বাসনা। আর কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা বা জড়তা নেই।

'তাহলে আপনি যান। আমি ওই দিকটায় এগিয়ে নিরবিলি একটা জায়গা খুঁজি গে ঘাটের কাছে।' অমলেন্দু হেসে হেসে বলল। কথাটা সে ভোলে নি।

বাসনা একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল, 'তারপর আমি কোথায় খুঁজে বেড়াব আপনাকে। তার চেয়ে একটু দাঁড়ান। আমি একবার প্রণাম সেরে আসি।'

'একবার প্রণামে কাজ সারা যায় না এখানে!' অমলেন্দু মাথা নাড়ছিল।

'যায়। দেখুনই না একটু দাঁড়িয়ে।' বাসনা চলে গেল।

সত্যি সামান্য একটু পরে ফিরে এল বাসনা। অমলেন্দু ভাবে নি বাসনা এত তাড়াতাড়ি আসতে পারে। বট-অশ্বত্থের ছায়ায় পায়চারি করছিল অমলেন্দু সিগারেট টানতে টানতে। বাসনাকে ও দেখে নি।

বাসনাই অমলেন্দুকে খুঁজে নিয়ে এসে বলল, 'চলুন।'

অমলেন্দু মুখ ঘুরিয়ে দেখে, বাসনা। রীতিমত অবাক হয়ে বলল, 'হয়ে গেল! আরে ছি ছি, সত্যিই কী আর আমি চলে যেতাম! আপনিও তাই বিশ্বাস করলেন। লাভের মধ্যে প্রণামটাও ভাল করে করতে পারলেন না।'

'করেছি। চলুন, কোথায় যাবেন।'

হাঁটতে হাঁটতে বলল অমলেন্দু 'কোন্ মন্দিরে গিয়েছিলেন?'

'কালীমন্দিরে।'

'খুব ভীড়?'

'খুব নয়, তবে ভিড়ই।'

'দেখতে পেলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কি বললেন প্রণাম করতে করতে এত তাড়াতাড়ি?' অমলেন্দু হাসছিল।

'কি বলতে পারে মানুষে?' বাসনা চোখ তুলল।

'আমি হলে তো যশ, অর্থ, স্বাস্থ্য সবই একদমে চেয়ে বসতুম।'

অমলেন্দু শব্দ করে হেসে উঠল। সরল প্রাণখোলা হাসি।

'আপনি বড় লোভী।' বাসনা অদ্ভুত সুরে বলল। কথাটা তার নিজের কানেই কেমন শোনালো।

'লোভের কি আছে! চাইলেই তো পাচ্ছি না। আর পেলেই বা কী, আমাকে আর কতটুকু দিতে পারেন ঈশ্বর, প্রার্থী যে অসংখ্য!' অমলেন্দু ঘন গাছের ছায়া থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

'না চেয়েই তো কত পাচ্ছেন!' বাসনার কথায় অত্যন্ত স্পষ্ট স্থূল ইঙ্গিত ছিল। যেন ইচ্ছে করেই বাসনা কথাটা অমনভাবে বলল, অমলেন্দুকে বোঝাতে।

'পাচ্ছি!' অমলেন্দু দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে তাকালো বাসনার দিকে সোজাসুজি।

'বরং আমরা—' বাসনা চোখ নামিয়ে হাঁটতে শুরু করল, 'এই আমার মতন যারা, তাদের চাইতে হয়। মাথা খুঁড়তে হয়, মানত করতে হয়।'

এত কথা—সব যেন হালকা শুকনো পাতা, খড়-কুটোর মতন উড়িয়ে দিয়ে অমলেন্দু হো-হো করে হেসে উঠল, 'তাই বলুন। টপ করে একটা মানত করে এলেন বুঝি!'

'এলাম!' বাসনা আকাশের দিকে চেয়ে ভারি, ভরা, থমথমে গলায় বলল স্পষ্ট উচ্চারণে।

ওরা বসে ছিল, পাশাপাশি। গঙ্গার পাড়ে। ঘাসে। সূর্য পশ্চিমে ডুবে আসছে। আকাশের নীলে কোথায় আবছা কালো মিশছিল। গাঢ় আলতা রঙের আলো ঢেউ-ভাঙা ফেনার মতন দিগন্তে ছড়ানো। সোনালী জরির পাড় বসানো টুকরো টুকরো ক'টি মেঘ। থৈ-থৈ জলে সোনার গুঁড়ো ঝরিয়ে প্রথম আশ্বিনের সূর্য ডুবছে। অজস্র সাপ যেন সোনালী ডোরাকাটা গা জলে ভাসিয়ে ভেসে চলেছে। মিষ্টি একটা হাওয়া দিচ্ছিল। নৌকাগুলো কালো হয়ে আসছে। কোথাও একটা ঘণ্টা বাজছিল আর এখানে অত্যন্ত উদাস সুন্দর একরাশ মুহূর্ত যেন বৃষ্টির ঝিরঝির ফোঁটার মতন ঝরে

পড়ছিল দু'জনের মাঝখানে।

গোড়ালি মাটিতে ঠেকিয়ে হাঁটু তুলে, হাতে হাতে আলগা করে ছুঁয়ে বসেছিল বাসনা। হাওয়ায় চুলগুলো কপাল থেকে চোখে এসে পড়ছে কখনো। হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে বাসনা। থানের আঁচলটা টান করে কোলে ফেলে রেখেছে। দু'টি হাতের অনেকখানি অনাবৃত। ধবধবে, নিটোল হাত। কোথাও-বা নীল শিরা, ক'টি তিল। দু'গাছি চুড়ি সেই সাদার ওপর ম্লান শিখার মত জ্বলছে। আকাশে চোখ রেখে বাসনা দেখছিল, ক'টা পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাচ্ছে। হাওয়ার স্রোতে। এক চিলতে মেঘের মতই। ওর গলা একটি সারস পাখির মতনই সুন্দর এক ছন্দে বেঁকে ছিল। গালে এক মুঠো ফিকে সোনারঙ রোদের আবীর লেগেছে। চোখের পাতায় অবসাদ। কেমন যেন নেশা-মাখানো।

অমলেন্দু মাঝে মাঝে দেখছিল বাসনাকে। এই স্থির, শান্ত বেদনাস্তব্ধ মূর্তিটা আজ যেন অন্যরকম লাগছে অমলেন্দুর। বাসনা নিজেকে আজ এত স্পষ্ট, সহজ করে তুলছে যে, অমলেন্দু এখনো বিস্ময়ের ঘোরে বোবার মতন চুপ করে আছে। কথা বলতে পারছে না, বলা সম্ভব হচ্ছে না।

বাসনা বলছিল, অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর এবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, খুব মৃদু মোলায়েম গলায়, 'আমার হয়তো কিছুদিন এমনিভাবে বাইরে ঘুরে বেড়িয়ে কাটানো উচিত।'

'সে তো ভালই।' অমলেন্দু হাতের পাশ থেকে ক'টা ঘাস ছিঁড়ল।

'ভাবছি, তাই করব। শরীর মন দুই-ই ভেঙে যাচ্ছে।' বিষন্ন স্বর বাসনার।

'অসম্ভব কী!' অমলেন্দুও বলল শান্ত গলায়, 'আপনার বয়সে অত কৃচ্ছ্রতা ভাল নয়। তাতে ক্ষতি হয়। হচ্ছেও তো, দেখতে পাচ্ছি।'

'দেখতে পাচ্ছেন না, এখনও অনেক কিছু আছে।' বাসনা ভাসা ভাসা চোখ অমলেন্দুর চোখে রেখে বলল, 'আমাকে সব সইতে হয়, মুখ বুজে।'

অমলেন্দু অনেকক্ষণ আর জবাব দিতে পারল না। বাসনা যখন গালের পাশ থেকে চুলগুলো সরাচ্ছে, অমলেন্দু বলল, 'খানিকটা রিলাক্সেশান্ দরকার। হৈ-চৈ, বেড়ানো, হাসি আনন্দ।'

'দরকার। বাস্তবিকই দরকার। আমিও বুঝছি।' বাসনা বুকের মধ্যে নিশ্বাস চাপল। তারপর হঠাৎ বলল, 'ভাবছি, আপনাকে মাঝে মাঝে টেনে নিয়ে বেরুব।' বলে বাসনা মিষ্টি করে হাসল।

'অনায়াসেই!'

কথাটা বলবে-কি-বলবে না বাসনা ভাবল এবং অনেকটা যেন মরীয়া হয়ে বলে ফেলল, 'বীথির হয়তো অসুবিধে হবে।' বলে তাকালো অমলেন্দুর চোখে।

'বীথির, কেন?' অমলেন্দু অবাক হচ্ছিল।

'হবে না! কী জানি। মনে হয় হবে। পড়াশোনার ক্ষতিই হবে হয়তো।' বাসনা অত্যন্ত সাবধানে কথা সাজাচ্ছিল। যেন দাবার ঘুঁটি চালছে হিসেব করে।

'না। তেমন কিছু না। কীই বা পড়ে ও!' অমলেন্দু সিগারেট ধরালো।

'পড়ে না?'

'পড়ে। তবে সে-পড়ায় দু'-দশদিন কামাইয়ে কিছু আসে যায় না।'

'নাকি, কি করে বুঝব। আপনি একদিন পড়াতে না এলে মেয়েটা এমন করে যেন সর্বনাশ হয়ে গেছে ওর।' বাসনা ঠোঁট টিপে হাসল।

'তাই নাকি! বলতে হবে তো ওকে।' অমলেন্দুও হাসল। বাসনা ভাবল কী সাঙ্ঘাতিক চাপা, জেগে ঘুমোচ্ছে। ধরা দেবে না।

'না। এ-কথা ওকে বলতে পারবেন না।' বাসনা বলল।

'কেন?'

'কেন আবার কি, আমি বারণ করছি।'

'বেশ।'

একটু চুপ। বাসনা আঁচলে মুখটা মুছে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো,

'কমলারা কিন্তু অনেক আশা করে রয়েছে।'

'কিসে!' অমলেন্দুও উঠে দাঁড়ালো।

'আপনি তো জানেন।' বাসনা পা বাড়ালো।

'জানি না ঠিক। অনুমান করতে পারি।'

'কেমন মেয়ে বীথি?' বাসনা মুখ ফেরায়।

'এক কথায় জবাব দেওয়া কঠিন।' অমলেন্দু হাসে।

'তবু—!'

'কি!'

'কেমন লাগে ওকে দেখতে?'

আপনি তো আমার চেয়ে বেশিই দেখছেন।' অমলেন্দু যে ইচ্ছে করে কথাটা এড়িয়ে গিয়ে জটিল করে তুলছে স্পষ্টই তা বোঝা যায়।

'আমার তো ভালই লাগে, আমাদের চেয়েও বোধহয় দেখতে-শুনতে ভাল। বাসনা থমকে দাড়ায়। সামনে খানিকটা জল-কাদা। ডোবা। ডিঙোতে হবে! বাসনা যেন দেখছে খুব সতর্ক চোখে।

'তুলনা যদি করেন—' অমলেন্দু সামনের ছোট্ট ডোবা মতন জায়গার দিকে নজর দিয়ে চোখ তুলল। অন্ধকার হয়ে এসেছে। হাতটা বাড়িয়ে দিল অমলেন্দু। বাসনার গা ছুঁয়ে গেল। বলল, 'তুলনা করলে বীথি দাঁড়ায় না, আপনাদের দু'বোন, বিশেষ করে আপনার কাছে। ধরুন, হাত ধরুন—ছোট্ট করে লাফ দিন একটা।'

মুহূর্তে বাসনার বুকে মুখে খানিকটা উষ্ণ, অসহ্য উষ্ণ রক্ত যেন উথলে এসে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল। বুকটা কেঁপে গেল দুরু-দুরু, ধক্‌ধক্‌ করে উঠল হৃদপিণ্ড, অদ্ভুত এক খুশীর আবেগে টনটনে ব্যথা ছড়িয়ে গেল। বুকের হাড়গুলো যেন কুচিকুচি হয়ে যাচ্ছে। সারা মুখ গরম, নিশ্বাস ঘন, দ্রুত, তপ্ত। চোখের পাতা যেন আর তুলতে পারছে না বাসনা।

তারপর হয়তো এই অন্ধকারে ওর সমস্ত জড়তা কোথায় ধুয়ে গেল। হাতটা ধরে ফেলল অমলেন্দুর। কী শক্ত হাত, কী কঠিন! বাসনার মনে হচ্ছিল, যদি এখানে এই অন্ধকারে, ঘাসে, নির্জনে হঠাৎ, হঠাৎ ও ফিট হয়ে পড়ে। তবে?

কিন্তু না, ফিট আর হল না বাসনা। সামনে যে বাধা দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল কী সহজেই তা পেরিয়ে গেল অমলেন্দুর হাত ধরে।

বাড়ি ঢোকবার আগে বাসনা বলল নিজের থেকে, 'তাহলে বেলুড় নিয়ে যাচ্ছেন কবে ?'

'যেদিন খুশি চলুন না—!'

'পরশু, না পরশু রবিবার, বড় ভিড় হয়। সোমবার।'

'একটু বিকেল বিকেল যাব। আপনি কমলাকে বলে রাখবেন।'

'উনি কি যাবেন ?'

'না, না, কেউ না। গুচ্ছের লোক আমার ভাল লাগে না।' বাসনা হঠাৎ বড় বেশি জোর আর বাধা দিয়ে বলে উঠল।

বাড়িতে পা দিয়ে বাসনা শুনল, কমলার ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে আটটা বাজছে। সেই আটটা। শব্দগুলো আজ আশ্চর্য স্নুন্দর লাগছিল। মনে হচ্ছিল দূর থেকে যেন গির্জার ঘণ্টা বাজছে। আব বাসনা হঠাৎ সাতটা বছর পিছিয়ে এসেছে। মফস্বলের এক শহর, হ্যারিকেনের আলোয়, একা, পড়ার টেবিলে বসে জানলা দিয়ে আলো-ঝরা এক সুন্দর মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে।

রাত্রে আর ঘুম আসছিল না বাসনার। এক বিন্দু অবসাদ ছিল না মনে কিংবা শরীরে। চোখের পাতা পর্যন্ত বন্ধ করতে পারছিল না। হাত কি গা শিথিল করে আলস্যভরে ছড়িয়ে দিতেও পারছে না। জানলার দিকে পাশ ফিরে, লম্বালম্বি টান টান হয়ে শুয়ে। বাইরে কাচেব মত ঝকঝকে জ্যোৎস্না। তারে-মেলা বীথির কমলা রঙের শাড়িটা যেন স্তব্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মাথার ওপর ফ্যানটা ঘুরছে মৃদু মোলায়েম শব্দ তুলে। বাইরে থেকে ঈষৎ ভিজে ভিজে ঠাণ্ডাও ঘরে আসছে। আর সব চুপ। কমলার ঘর ঘুমিয়ে, বীথির ঘরও বুঝি।

গোটা বিকেলটার কথা এরই মধ্যে কতবার যে ভাবল বাসনা! ভেবেও আশা মিটছিল না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবল; ঘটনা, কথা, ওর প্রশ্ন, অমলেন্দুর জবাব; দু'জনের মিলিত পরিহাস এবং দক্ষিণেশ্বরের

সেই সূর্যাস্ত, নিরিবিলি সান্নিধ্য, অন্ধকার, জল-কাদার ছোট্ট ডোবার সামনে থমকে দাঁড়ানো, অমলেন্দুর হাত ধরে সেই সামান্য বাধা ডিঙিয়ে আসা।

ইস, কী ভয়ই হয়েছিল বাসনার। বীথির ভাবভঙ্গি দেখে, কমলার কথা শুনে ও প্রায় বিশ্বাস করে নিতে বসেছিল, বীথি অমলেন্দুর মন পেয়ে গেছে, অধিকার বিছিয়ে ফেলেছে পুরোপুরি গভীরভাবে। সেখানে আর জায়গা হবে না বাসনার। কোনো আশা নেই।

তা নয়, বীথি পারে নি। অমলেন্দুর মন বীথির মুঠোয় নেই; ধরা দেয় নি অমলেন্দু। এখনো বাসনা সেই মন জুড়ে বসে আছে। শুধু এইটুকু, এইটুকুমাত্র কথা, (যদিও কথা এইটুকু কিন্তু বিষয়টা বাসনার কাছে কী যে অসম্ভব প্রয়োজনীয় আর মূল্যবান আর বিস্তৃত ছিল) জেনে নিতে বাসনা আজ যেন সর্বস্ব পণ করে বসেছিল। নিজের সঙ্কল্পকে দৃঢ়, স্থির, অটুট রেখে বাসনা আজ এগিয়ে গিয়েছে। অত্যন্ত হিসেব কষে, একটু একটু করে সে পা ফেলেছে। কোথাও তার ভুল হয় নি, ভুল ঘটতে দেয় নি। লজ্জা, সঙ্কোচ, জড়তা, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা—সমস্ত কাটিয়ে উঠে, মুখোমুখি সরাসরি দাঁড়িয়ে বাসনা জিনিসটা স্পষ্টাস্পষ্টি জেনে নিয়েছে। হ্যাঁ, বীথি নয়; বাসনা, বাসনাই অমলেন্দুর মন জুড়ে রয়েছে এখনো এবং বীথি নয়, অমলেন্দুর দুর্বলতা বাসনার ওপরই। যা ভেবেছিল বাসনা, তার যে ধারণা ছিল তা যে ঠিকই, এখন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাসনা মনে মনে স্বস্তি পাচ্ছিল।

এখন নিজেকে বাসনার কত হালকা লাগছে। মনের মধ্যে কান পাতলে গুনগুন, শিরশির। আলতো, ছুঁই-না-ছুঁই ঠোঁটের থরথর শিহরণ-সুখে-গা-মন ভর-ভর। এমন সুখ আর নিশ্চিন্ততায় এই বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে এখন। নরম বালিশ দিয়ে সব যেন ঢেকে ফেলতে ইচ্ছে করছে। এই চোখ, চুল, নাক, গলা, ঠোঁট। থানটা যেন বড় বেশি জাপটে ছিল। গা-কোমর সব পাকে পাকে বেঁধে, অতি সতর্ক প্রহরীর মতন। আস্তে আস্তে আলগা করে

দিল বাসনা, করকরে, গায়ের ছাল-ওঠা বিশ্রী পুরু কাপড়ের শেমিজটা খুলেই ফেলল অর্ধেক, কোমরের কঠিন পাকটা ঢিলে করল। তারপর নরম বিছানায় বালিশে নিজেকে গাঢ় করে মিশিয়ে রাখল।

নিজেকে এই ঘরে বেশ ভাল করেই দেখতে পাচ্ছিল বাসনা। বাইরে কাচের মত স্বচ্ছ জ্যোৎস্না জানলা ডিঙিয়ে বিছানায় এসে বাসনাকে খুব পাতলা মিহি একটা সাদা চাদরের মত ঢেকে দিয়েছে। সেই চাদরের তলায় বাসনা নিজের ধবধবে নধর হাত দেখছিল, হাতের আঙুল, স্পর্শ করে করে, মুখ আর গাল আর গলা এবং আরও সুন্দর সুন্দর, ননীমসৃণ কোমল, কত সুধাস্বাদ অঙ্গ। দেখছিল আর ভাবছিল বাসনা, তার আঠাশ বছরের এই দেহ ফুলের মতই ফুটে রয়েছে এখনো। ঝরে যায় নি। আর এই আড়াল-করা পুষ্পস্তবক যদি হাতছানি দেয়, মুগ্ধ মধুমক্ষিকা ফিরে আসবে, গুনগুন করবে তাকে ঘিরে।

নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস আজ ফিরে পেয়েছে বাসনা। সে পেরেছে। সহজভাবেই সব পারল। অমলেন্দু, বোকা অমলেন্দু অনায়াসেই নাগালের মধ্যে এসে গেল।

মনে মনে একটা গর্ব সাবানের ফেনার মত ফেনিয়ে উঠছে বাসনার। একটি পলাতক পুরুষকে কত অক্লেশে আবার চুম্বকের মত কাছে টেনে নিতে পারল বাসনা তার এই সুষমিত সৌন্দর্য দিয়ে। না, কোথাও প্রখর বা উগ্র কি বিহ্বল মাদকতাকে অনাবৃত করে মেলে ধরতে হয় নি। পূর্ণিমার স্নিগ্ধ, একটু-বা বিষণ্ণ, মধুর জ্যোৎস্নার মতন ছড়িয়ে থেকেই অমলেন্দুকে আকর্ষণ করে নিতে পেরেছে। প্রয়োজন হলে বাসনা অবশ্য তার সাধ্যায়ত্ত সবটুকু আগুন জ্বালিয়ে দিত, এ-বিষয়ে তার মনে আর দ্বিধা ছিল না, ভবিষ্যতেও যদি প্রয়োজন হয় না-দেবে এমন নয়, কিন্তু উপস্থিত এই স্নিগ্ধ শিখাতেই পতঙ্গ কাছে এসে গেছে।

বাসনার একবার মনে হল, অমলেন্দুর সঙ্গে এই অতি সতর্ক, সন্তর্পণ চাতুরী কি ভাল হচ্ছে! যদি ও বুঝতে পারে, সন্দেহ করে এবং সাবধান হয়, বাসনার এই কৃত্রিম আকর্ষণের গিঁট খুলে সরে যায়। তবে?

যদি যায়—! বাসনা অত ভাবতে পারছিল না। তবে নিজেকে বলছিল, অমলেন্দুকে ভালবাসতে হবে, কিংবা তাকে আমি ভালবাসব —এ, এ-চিন্তা অসম্ভব, আমার পক্ষে। পারি না, ওই অমলেন্দুকে কিছুতেই কোনোদিনই ভালবাসতে পারি না, পারব না।

ভালবাসার কথাই এখানে উঠতে পারে না, বাসনা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠছিল, যে-লোক আমার পবিত্রতা, নিষ্ঠা, নিষ্কলুষ একাগ্রতা এবং সুন্দর শুচিতাকে অসতর্ক, অজ্ঞাত মুহূর্তে কলুষিত করেছে তাকে ভালবাসব আমি? অসম্ভব। কে পারে, তোমার সযত্ন-লালিত একটি কায়া, হ্যাঁ, শিশুর মতই এক অসহায় অবলম্বনকে, ভালবাসার কুসুমকে যদি হঠাৎ কেউ গলা টিপে মেরে রেখে যায়, তুমি পার তাকে ভালবাসতে?

বাসনাও পারে না। তার স্বামী, তিনি এতকাল ধরে প্রণাম আর প্রেম, বুকের সমস্ত করুণা উজাড় করে নিয়ে এসেছেন, যার স্মৃতি বাসনার মনের পরদায় পরদায় কত সূক্ষ্ম, কত একান্ত করে মেশানো —তাঁকে ফেলে দিয়ে, উপেক্ষা করে, ভুলে গিয়ে আবার নতুন করে ভালবাসা, তাও কি সম্ভব।

আমি বলছি, আমার মনের কথা: বাসনা বাইরের শূন্যের দিকে চেয়ে যেন তার স্বামীকে বলছিল বিড়বিড় করে, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, ভালবাসবার কেউ না। বিশ্বাস করো এ আমার ভালবাসা নয়, নিছক প্রয়োজন, কলঙ্ক-মোচনের একটা উপায়। আমার আর অমলেন্দুর মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক। সে আমার সব লুঠ করে নিয়েছে। আমিও এই পশুকে ঘর আর আরাম থেকে কেড়ে নিয়ে যাব, সুখ থেকে সরিয়ে, সম্মান থেকে অসম্মানে, রুক্ষতায়, ধুলোয়।

এ-পাপ তাকে লালন করতে হবে আর-এক ব্যাধির মতন। আমি দেখব।

নাকি?

বাসনা চমকে উঠেছিল ভীষণভাবে। না, বীথি নয়, কাচের ঝকঝকে আলোয় বাইরে তারে-মেলা বীথির কমলা রঙের শাড়িটা

বাতাসে পাক খেয়ে খেয়ে গুটিয়ে-পাকিয়ে অদ্ভুতভাবে দোল খাচ্ছে। মনে হচ্ছিল বীথি যেন সামনে দাঁড়িয়ে সারা গা দুলিয়ে অট্টহাস্য হাসছে বাসনার দিকে চেয়ে চেয়ে, বাসনার কথা শুনে শুনে।

জানলাটা বন্ধ করে দিল বাসনা ভীষণ শব্দ করে। আচমকা।

॥ ছয় ॥

'আজ ক'দিন ধরেই দেখছি ছোড়দির যেন—'

কথাটা কানে যেতেই বাসনা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কমলার ঘরে ওরা কথা বলছে, ওরা স্বামী-স্ত্রীতে। নীলচে রঙের কম-জোর এক বাতি জ্বলছে ঘরে, এক বিন্দু আলো নেই বারান্দায়; দরজা জুড়ে পরদা। পরদার গায়ে গায়ে বাসনা এই এসে দাঁড়ালো, হেঁশেল বন্ধ করে, কমলার বাচ্চা মেয়েটার দুধ গরম সেরে, বাটিটা হাতে নিয়েই। আর একটু হলেই পরদা সরিয়ে ঢুকে পড়ত বাসনা। হাত প্রায় বাড়িয়েছিল, অচমকা কথাটা কানে যেতেই হাত গুটিয়ে নিল। মাটিতে আঁট হয়ে থাকল পা দু'টো। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ। আজ ক'দিন ধরে কী—কী দেখছে কমলা? কান পেতে থাকল বাসনা, যেন কমলাদের একটা নিশ্বাসও না হারিয়ে যায় এখন ওর কাছ থেকে।

'আজ ক'দিন ধরে দেখছি ছোড়দির যেন মতিগতি খানিক বদলেছে।' কমলা বলছিল!

যদিও এখানটায় অন্ধকার এবং বাসনাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, বাসনাও কাউকে নয়, তবু মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে বাসনার। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা ধক্‌ধক্‌ করছে। বাসনা অসাড়, কাঠ-গা হয়ে দাঁড়িয়ে। কি বলতে চাইছে কমলা, কি বোঝাতে চাইছে সুধাময়কে? মতিগতি বদলেছে। মানে, কি মানে? কিসের ইঙ্গিত দিতে চায় কমলা স্বামীকে?

'প্রথম প্রথম কিছুই তো গায়ে মাখ না তোমরা, শেষে যখন আর পথ থাকে না তখন হুঁশ হয়।' সুধাময় জবাব দিল।

সুধাময় যে-সুরে জবাব দিল তা খুব রুক্ষ কি গম্ভীর মনে হল না। বরং একটু হালকাই লাগল কানে। কিন্তু তবু ঠিক বুঝতে পারছে না বাসনা, ওরা স্বামী-স্ত্রী কি বলতে চাইছে।

'তা ঠিক।' কমলা বলছিল। আর শব্দ উঠছিল তার চুড়ির। খুব সম্ভব শুতে যাবার আগে ঘরের কোনো কাজ সারছে কমলা।

'যাক শেষ পর্যন্ত যে উনি বুঝেছেন, এই যথেষ্ট।' সুধাময় বলল।

শুধু বোঝে নি. ক'দিন ধরে দেখছ না, কেমন একটু বদলে গেছে। আজকাল মাঝে মাঝে বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে অমলেন্দুর সঙ্গে। আগে একদণ্ড ছোড়দিকে রান্নাঘর কি ভাঁড়ারঘরের বাইরে বসতে দেখতুম না। এখন তবু খানিক বেড়ায়, দু'দণ্ড ঘরে শুয়ে থাকে, 'গল্পের বই-টই পড়ে।'

বাসনা রুদ্ধনিশ্বাসে কমলাদের এই আড়াল-আলোচনা শুনছিল। অমলেন্দুর সঙ্গে ঘরের বাইরে ঘুরে বেড়ানোর কথাটা যে-ভাবে বলল তাতে বোঝা মুশকিল, আর অন্য কিছু বলতেও চাইছে কিনা কমলা? বা তার চোখে এটা দৃষ্টিকটু লেগেছে কিনা! যখন শুধু কথাই শোনা যায় কারুর, যে-মানুষটি কথা বলছে তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তার গলার স্বর থেকে মানুষটির মনোভাব জানা মুশকিল। মুখ দেখলে সে-মন পড়া যায়, বোঝা যায়। বাসনা কমলার মুখটা দেখবার চেষ্টা করছিল মনে মনে।

'শরীর-টরীর এখন কেমন?' সুধাময় প্রশ্ন করল।

'এমনিতে আর কি বুঝব। তবে ভালই বোধহয়। মন ভাল থাকলে শরীরটাও তো ভাল থাকে।' কমলা যেন ঘরের এক কোণ থেকে সরে প্রায় দরজার কাছে দাঁড়ালো। তার গলা আরও স্পষ্ট আরও ভাল শোনাচ্ছিল. 'ছোড়দিকে ছেলেমেয়ে নিয়ে কখনো এত জাপটা-জাপটি করতে দেখি নি বাপু। ওর আদর-টাদর সব আলগা-আলগা। আজ ক'দিন যেন সে-ছোড়দি আর নেই। মিণ্টুটাকে নিয়ে কী ভীষণ

যে চটকাচ্ছিল আজ, আমি তো অবাক।'

একটু চুপ। বাইরে দাঁড়িয়ে বাসনা পরদাটার দিকে শূন্য স্তব্ধ চোখে চেয়েছিল। হাতের ওপর খানিকটা আঁচল পুঁটলি করে রেখে দুধের বাটিটা বসিয়ে এনেছিল বাসনা, এখন কাপড়টুকু গরম হয়ে হাতে তাত লাগছে।

কমলা বলল আবার, 'যতই বলো, মেয়েমানুষের নাড়িই আলাদা; ছেলেপুলে না থাকলে ভরে না। ছোড়দির যদি ছেলেমেয়ে অন্তত একটা থাকত, ও বোধহয় এত মনমরা হয়ে থাকত না।'

'তা তো ঠিকই।' সুধাময় জবাব দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল।

সুধাময়ের চটির শব্দ উঠতেই চমকে উঠে বাসনা ডাকল, 'কমলা'

পরদা সরিয়ে কমলা গা বাড়াতেই বাসনা বলল, 'এই নে দুধ। উনুনে ছাই পড়ে গিয়েছিল। বসে থেকে থেকে তবে একটু গরম হল। চিনি দিয়ে এনেছি।'

কমলার হাতে বাটিটা দিয়েই বাসনা সোজা তার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বাতি জ্বালল বাসনা। বুকের মধ্যে এখন আর ঢিপঢিপ করছে না, কিন্তু আশ্চর্য, কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। মনেই হয় না, এই বুকে কোথাও হাড় মাংস রক্ত কোনো কিছু আছে। কিচ্ছু নেই যেন। শুধু একরাশ হাওয়া, আর সেই হাওয়া ঠেলে ওঠা পাক-দেওয়া ব্যথা।

কমলার চোখ যে আজকাল এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাসনাকে দেখছে এই যেন প্রথম জানল ও। এখনো অবশ্য ঠিক বুঝতে পারছে না বাসনা, সুধাময়ের কাছে এ-সব কথা বলার কি দরকার পড়ল কমলার। হ্যাঁ, অমলেন্দুর সঙ্গে ক'দিন খানিক ঘোরাঘুরি করছে বাসনা। কিন্তু এই ঘোরাঘুরি যে তার ভাল লাগছে, কিংবা বাসনার মনে সায় আছে অমলেন্দুর সঙ্গে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানোয়. আর এতে তার ভালই হচ্ছে, শরীরের এবং মনের—এ-কথা কি করে বুঝল কমলা, সুধাময়কেই বা বলতে গেল কেন? সুধাময় তো অন্য কিছু ভাবতে পারে। যদিও মনে হল না তা। তবু। তবু।

অথচ বাসনা চায় নি, জানতেও দেয় নি অমলেন্দুর সঙ্গে পথে বেরুবার ব্যাপারে ওর একটুও গা আছে। বরং বরাবরই ও ভাবখানা এমন রেখেছে যে, অনেকটা যেন দায়ে পড়ে, নেহাতই বাধ্য হয়ে, কমলাদের কথাতেই একটু-আধটু ঘোরাঘুরি শুরু করেছিল। তাও নিছক শরীরটার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও, যেমন মানুষে ওষুধ গেলে বিরক্ত হয়ে, তেতো-মুখে, উপায় নেই বলেই।

তবে হ্যাঁ, কথাটা তুলতে হয়েছে বাসনাকেই কখনো, কোনো-কোনো দিন। রোজ রোজ অমলেন্দুকে দিয়ে কথাটা বলানো ভাল দেখাবে না ভেবে, ইদানীং ক'বারই বাসনাকে কিছু কিছু বলতে হয়েছে, যেমন কিনা : যাই বলিস খানিক ঘোরাঘুরি করলে রাত্তিরে বেশ ঘুম হয় রে, কমলা। কাল তো, কী যেন বলে তোদের সেই ইডেন গার্ডেন, সেখানে ঘুরলাম খানিকটা, রাত্তিরে অসাড়ে ঘুমিয়েছি। কোনোদিন বা বাসনা বলেছে, লজ্জায় আমি মরি, কমলা। অমলেন্দু শুনে হেসেই বাঁচে না। আ, হাসবার কি আছে, আমি কি কলকাতার মেয়ে না ছেলেমানুষ যে চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এ-সব দেখি নি বলে ছ্যা-ছ্যা করতে হবে। কবে একবার যেন গিয়েছিলাম, তোর সঙ্গেই না, মনেও কি আছে ছাই। তাই নিয়ে কী ঠাট্টাটাই করলে অমলেন্দু।

এ-সব কথা এমনভাবে বলত বাসনা যেন তার কোনো বিষয়ে কিছু আগ্রহ নেই। এবং সে চায়ও না চিড়িয়াখানা কি লেক, অথবা মেমোরিয়াল দেখতে গিয়ে তার চক্ষু সার্থক হোক। সবই যেন অমলেন্দু বলছে, অমলেন্দুরই ইচ্ছে।

শুনে কমলা জবাব দিত, ওমা তা বলে তুমি ঘরকুনো হয়ে বসে থাকবে, এ-সব দেখবে না। কলকাতায় থাক। বাইরে থেকে হাজার হাজার লোক আসে দেখতে আর কলকাতায় থেকে তুমি গেঁয়ো হয়ে থাকবে। যাও না, দেখে এস। দেখাও হবে, বেড়ানোও হবে।

কাপড় ছেড়ে শোবার জন্যে তৈরি হয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল বাসনা। ছিটকিনি তুলে দিল। বাতিনিবিয়ে বিছানায় এসে বসল।

না, কথাবার্তা শুনে মনে হল না, কমলারা খারাপ কিছু ভাবছে, বাসনা ভাবছিল, বরং ওরা যেন একটু খুশীই হয়েছে। আর বোধহয় এও চায়, বাসনা কিছুদিন ঘুরুক-ফিরুক হই-চই আনন্দ গল্পগুজব করুক যাতে কিনা তার মন, কমলাদের যা ধারণা বাসনার মন ভাল হবে, এই মুশড়ে-পড়া ভাবটা কেটে যাবে—আর তাতে, তার ফলে শরীর সেরে যাবে।

কমলারা যে সমস্ত জিনিসটা এত সহজ এবং সরল মনে দেখছে, ভাবতে এবার ভালই লাগছিল বাসনার। সত্যি, বড় ভালবাসে কমলা তাকে এবং সুধাময়ও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। না করবে কেন? আজ ক'বছর, বিধবা হবার পর থেকেই একরকম, বাসনা ছোটবোনের কাছে রয়েছে। কমলা নিজেই স্বেচ্ছায় তার সংসারে টেনে নিয়েছে বোনকে। কোনোদিন কখনো এতটুকু দুঃখ দিতে চায় নি। দেয় নি। বাসনার স্বভাব কমলার জানা আছে ভাল করেই। এ-মেয়ে হালকা নয়, এর কোনো বেচাল নেই, কখনো একে নিয়ে তোমায় বিপদে পড়তে হবে না। হ্যাঁ, কমলা এ-সব ভাল করেই জানত। জানত আর বিশ্বাস করত। এখনও সেই বিশ্বাস অটুট আছে। কাজেই কমলা কি সুধাময় বাসনার সঙ্গে অমলেন্দুর ঘোরাফেরার মধ্যে কোনো খারাপ কিছু খুঁজে বের করতে যাবে না। ভাবতেই পারবে না প্রথমত যে বাসনা তার বৈধব্যের পবিত্রতা এবং একনিষ্ঠতা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয়েছে, হতে পারে!

এ-সব কথা ভাবলে অবশ্য খারাপই লাগে, মনের মধ্যে গ্লানি জমে ওঠে। নিজেকে ধিক্কারও দেয় বাসনা। কেননা, আজ যাই হোক—যত বিশ্বাসই থাক—আর কিছুদিন পরে, হয়তো আর একমাস কি বড়জোর দু'মাস—তারপর একদিন কমলাদের বিশ্বাসের দৃঢ় সৌধটা হঠাৎ এক অবিশ্বাস্য ভূমিকম্পে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়বে, ভেঙে-চুরে তছনছ হয়ে যাবে। এখন ওরা তা কল্পনা করতে পারছে না।

যতদিন তা না হচ্ছে, আর যতদিন কমলা-সুধাময়ের বিশ্বাস অটুট রয়েছে, ততদিনই বাসনার মঙ্গল। ঈশ্বর করুন, আর কিছুদিন, একটা

কি দু'টো মাস কমলারা অন্ধ হয়েই থাকুক, বিশ্বাসে ভালবাসায়, শ্রদ্ধায় ওদের চোখের পরদা ঢাকা থাক।

মনে মনে এই প্রার্থনাটুকু জানিয়ে বাসনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুল, জানলার দিকে মুখ করে।

বাইরেটা অন্ধকার। খুব আবছাভাবে দোতলার খোলা বারান্দার আলসেটা চোখে পড়ে। একটা জোনাকি শুধু উড়ছিল। তাকিয়ে তাকিয়ে সেই এক ফোঁটা নীল আলোর জ্বলা-নেভা, এ-পাশ ও-পাশ ছুটে বেড়ানো দেখছিল বাসনা। গালের তলায় একটা হাত, আর একটা হাত কোমরের ওপর পড়ে রয়েছে। খুব ধীরে ধীরে নিশ্বাস নিচ্ছে বাসনা। গায়ে শেমিজ নেই। শুধুই কাপড়। অল্প ক'দিন ধরে এই অভ্যেস করে ফেলেছে ও। গায়ে কিছু রাখতে পারে না। রাখলে ঘুম হয় না। খসখস করে, হাঁপ ধরে। বিশেষ করে বুক আর পেটটা যেন আঁট লাগে, হাঁসফাঁস করতে থাকে ও।

জোনাকিটা উড়ছিল। এই ওপরে এক কোণে, হঠাৎ টিপ করে আরও একটু ওপরে জ্বলে উঠল, তারপর পাশে, একটু পরে নীচে, আরও নীচে। হঠাৎ একটুর জন্যে যেন উধাও। আবার চোখের সামনে অন্ধকারে জ্বলছে, নিবছে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল বাসনা। ভালই লাগছিল দেখতে। মনে হচ্ছিল এই ঘর এবং ওই বাইরের ঘন অন্ধকারের মধ্যে আরও একটা জোনাকি জ্বলছে। হ্যাঁ, তার মন; এই চঞ্চল অস্থির মনটাই যেন আর-এক জোনাকি। অন্ধকারে ও নিস্তব্ধতায় খাপছাড়াভাবে জ্বলছে নিবছে। এক ভাবনা থেকে সরে যাচ্ছে অন্য ভাবনায়, কমলার কথা ভাবতে ভাবতে অমলেন্দুকে মনে পড়েছে। অমলেন্দুর মুখ একটুক্ষণ থাকছে কি থাকছে না বীথির মুখ ভেসে উঠছে এবং বীথির কথাও বেশিক্ষণ ভাবা যাচ্ছে না।

অমলেন্দু আর বীথির কথায় কথায় সে-দিনের ঘটনাটা আবার মনে পড়ল এখন হঠাৎ।

বীথি নিজের ঘরে বসে পড়ছিল। পড়ুক না পড়ুক, অন্তত

টেবিলের ওপর পিঠ-কুঁজো করে বসেছিল। বই খোলা। বাতি জ্বলছে। আর টেবিলের অন্যদিকে চেয়ারে বসে অমলেন্দু।

বাসনা অমলেন্দুকে চা দিতে গিয়েছিল। টেবিলের ওপর পেয়ালাটা নামিয়ে রেখেছে সবে, অমলেন্দু বললে, 'আবার চা, আজ আর চা খাব না ভেবেছিলাম। অনেকবার খাওয়া হয়ে গেছে। রাত্রে ঘুম হবে না।'

'অনেকবারের সঙ্গে আর একবার হলে কিছু হবে না, খেয়ে নিন।' বাসনা বলল।

'খাব!' অমলেন্দু মুখ কাঁচুমাচু করল।

'তাহলে ওটা আধাআধি করে দিন। বীথি, তুমি অর্ধেকটা নাও।'

'না।' বীথি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল।

'না কেন, নাও না।' অমলেন্দু হাসতে হাসতে বলেছিল, 'আধ-পেয়ালা চায়ে তোমার কী ক্ষতি হবে!'

বীথি তবু মাথা নাড়ল। বই থেকে মাথা না তুলেই।

'অর্ধেক-টর্ধেক ও পছন্দ করে না।' বাসনার হঠাৎ কি যে হল, হেসে (সত্যি কি বাসনা হেসেছিল, না সে-হাসিতে আর কিছু ছিল)—হেসে বলল পরিহাসের সুরে, 'পুরোটা হলেও পারে।'

এ-বার বীথি মুখ তুলল। কালো মুখ আরও কালো হয়ে গেছে। চোখ দু'টো ধক্‌ধক্ করছিল বীথির।

'হ্যাঁ। তা পারি।' বীথি কেমন এক দাঁতচাপা অস্ফুট স্বরে জবাব দিল। দিয়েই মুখ নীচু করল।

অমলেন্দু একবার বীথি, আর একবার বাসনার দিকে তাকিয়ে কাপটা তুলে নিল।

কথাটা ভোলে নি বীথি। অমলেন্দু চলে যেতে বাসনাকে এসে বলল, 'একটা কথা, ছোড়দি। ও-রকম ঠাট্টা তুমি আমার সঙ্গে কোরো না। আমি ভালবাসি না।'

'ও আচ্ছা।' বাসনা চুপ করে গিয়েছিল। অপমানে মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল তার। বাসনা ভাবতেও পারে নি, ওইটুকু মেয়ে এমন-

ভাবে তার সামনে এসে শাসাতে পারবে। কিন্তু বীথি পারল। বাসনা এও জানে, ভবিষ্যতে বীথি আরও অনেক কিছু পারবে। রাগটা তার বাসনার ওপরই। বাসনাই না তার মুখের খাবার কেড়ে নিয়েছে। একদিন বলেছিল অবশ্য, নেব না। কিন্তু নিল; না নিয়ে পারল না। বীথি তো তা জানে না।

আর একদিনের কথাও মনে পড়ল। আরও আগের ঘটনা। সেই বেলুড়ে বেড়াতে যাবার দিন, বীথি সে-দিন কীভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে, দেখেছিল তাদের—তাকে আর অমলেন্দুকে। ওরা তখন বাইরে যাচ্ছিল ছু'টিতে আর বীথি সবে কলেজ থেকে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিল। না, বীথি কোনো কথা বলে নি। শুধু জায়গা ছেড়ে পাশ ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিল। যদিও একবারের বেশি তাকায় নি, বাসনা তবু বুঝতে পারছিল একটা অসীম ঘৃণায় ঠোঁট বেঁকিয়ে আগুন-ঝরা চোখে মেয়েটা তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।

অবশ্য এ-সবে কিছু আসে যায় না বাসনার। বরং যে-বীথি এতদিন আঁচলে হীরে বেঁধেছে ভেবে দাম্ভিকের মতন অত্যন্ত অসার একটা অহমিকায় মাটিতে পা রেখে যেন হাঁটছিল না আর, ফেটে পড়ছিল গর্বে, সে-বীথিকে হীরে আর কাচের পার্থক্যটা ভাল মতন বুঝিয়ে দিয়েছে বাসনা। জব্দ শুধু নয়, হারিয়ে দিয়েছে। চুনকালি মাখার মতন লজ্জা, অপমান, ক্ষোভ সব মেখে নিয়ে বীথি গুম হয়ে বসে রয়েছে তখন। আর ওই রোগা কালো মেয়েটার হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরার দুঃসাহসকে চমৎকারভাবে ব্যর্থ করতে পেরেছে ভেবে খুশীই হয়েছে বাসনা।

বীথির কথাও বেশিক্ষণ ভাবতে পারল না বাসনা। তলপেটের কোথায় যেন জড়ানো-পাকানো ক'টা শিরা কনকন করে উঠতেই কোমর থেকে হাতটা নামিয়ে তালুর চাপ দিয়ে দিয়ে ব্যথাটাকে সরিয়ে দিতে চাইল ও। একটুক্ষণের জন্যে নিশ্বাস বন্ধ করে রাখল। খানিক আরাম পাওয়া যায় এতে।

ব্যথাটা সরছিল না। আরও যেন ছড়িয়ে পড়ছিল। বাসনা

আজকাল বেশ বুঝতে পারে, পেটের বাঁ-পাশে একটা নাড়ি টনটন করে এখন ব্যাথা উঠলেই, আর মনে হয় সেই নাড়িটা যেন কেউ খামচে খামচে ধরছে। বেশিক্ষণ বা বেশি জোরে ব্যাথাটা উঠলেই সারা গা বমি-বমি করে উঠে। সে-দিন তো রাত্রে খেয়ে ওঠার পর ব্যথাটা ঠেলে উঠল। সবে ঘরে এসেছে বাসনা। সামলাতে পারে নি! বমিই করে ফেলল। আগেও করেছে কয়েকবার। প্রতিবারই বমির ক্লান্তির চেয়ে ভয়ে ভাবনায় তার গা-হাত মরার মত ঠাণ্ডা হয়ে আসে। এই বুঝি কমলার কাছে ধরা পড়ল। কিন্তু না, কমলা কোনোদিনই সে-রকম সন্দেহর সামান্য আভাসও দেয় নি। ভয়ে, রাত্রে খাওয়াই প্রায় বাদ দিতে বসেছে বাসনা। কমলাকে বলেছে, খাওয়া একটু বেশি হলে অম্বল হচ্ছে, হজম হচ্ছে না, গা গুলোয়! কমলাও তাই বিশ্বাস করে নিয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছে।

বালিশটা দু'পায়ের মধ্যে রেখে পেটের মধ্যে চেপে ধরে ধনুকের মতন বেঁকে শুল বাসনা। খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে আচ্ছন্নের মতন পড়ে থাকল। আস্তে আস্তে চোখের পাতা ঘুমে ভারি হয়ে আসছিল। এতক্ষণ যে-মনটা জোনাকির মত টিপটিপ করে জ্বলেছে নিবেছে, সেই মনও যেন নিবে আসছে।

নিবে গেল এবং অন্ধকার। ঘন। জল বয়ে যাচ্ছিল। জলের তলায় ডুবে থাকলে স্রোত বয়ে যাওয়ার যে-অনুভূতি মাথার মধ্যে সরসর করে যায়, তেমনি।

বাসনা দেখছিল। কী দেখছিল বুঝতে না বুঝতে মনে রাখতে না রাখতেই সব মিশে গেল, একটা কালো মেঘ যেন আলতো করে ওর মনের ধুলো-বালি খড়-কুটো সব মুছে নিয়ে আস্তে আস্তে সরে গেল।

আর বাসনা পড়িমরি করে ছুটে আসছিল। বড্ড কাঁদছে ছেলেটা। সিঁড়িটুক্ শেষ হয়েছে সবে, গোড়ালি পিছলে গেল, টাল সামলাতে পারল না বাসনা, মাথা উলটে পড়ল। পড়ল তো পড়লই। বাসনা যেন বুঝতে পারছিল, সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ঠোক্কর খেতে খেতে পড়ছে। হাত বাড়াতে পারছে না, কিছু ধরতে পারছে না।

কী অসহায় ও! শেষ পর্যন্ত সিঁড়ির কোণা লাগল পেটে। ভীষণ জোরে। যেন কেউ একটা কোপ বসিয়ে দিলে কোদালের। অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল বাসনা। কিন্তু আর সে পড়ল না। শরীরটা উঁচু-নীচু হয়ে তালগোল পাকিয়ে পড়ে থাকল। কেউ এল না তাকে তুলতে। বাসনার মনে হচ্ছিল তার পা আর পেট সব যেন ভিজে গেছে, ভিজে যাচ্ছে রক্তে।

চোখ চাইতে পারছিল না বাসনা। মনে হচ্ছিল এখনও সে পড়ে আছে সিঁড়ির তলায়। হঠাৎ চোখ চাইল। চেয়ে চমকে উঠল। অন্ধকারের মধ্যেও বালিশ আর চাদর আর নিজের গায়ে ভয়ে ভয়ে হাত বুলিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসল। না, সত্যিই সে পড়ে যায় নি। স্বপ্ন দেখছিল।

বিছানায় বসে বসে বুক ভরে কিছুক্ষণ নিশ্বাস নিল বাসনা। ঘাড় গলা বুক ঘামে ভিজে গেছে। আঁচল দিয়ে মুছল। আ, কী বিশ্রী, বিশ্রী স্বপ্ন। এখনও যেন হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে।

পা কাঁপছিল। বাতি জ্বালল বাসনা। জল খেল। আর দেখল না, কিছু নয়। মনে হয়েছিল বটে। কিন্তু না। যে বাঁচবার সে বেঁচেই আছে বাসনার শরীরের মধ্যে, সযত্নলালিত হয়ে।

স্বস্তির আর পরম তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বাতি নিবিয়ে আবার বিছানায় এসে বসল বাসনা এবং বসে বসে কী ভাবতে গিয়ে তন্ময় হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ নিজেকে নিজেই অবাক করে দিয়ে বাসনা বুঝল, একটা জমা কান্না ওর বুক ঠেলে গলায় তুলোর মতন পুঁটলি হয়ে হয়ে ছড়িয়ে গেছে। বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদল খানিক, শেষে কান্নাজড়ানো গলায় নিজেকেই বলল, হ্যাঁ বলল, যদি মরি দু'জনেই মরব। আমার এই একদেহের মধ্যে দু'টি দেহ থাকবে—আর একটি চিতাই জ্বলবে। আমরা পুড়ব। তুই আর আমি।

বাসনা আশ্চর্য মমতায়, যেন সেই কোমল অঙ্গকেই স্পর্শ করতে পারছে, ফুলের মতন নরম একটি অবয়বকে—তার আবরণের ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ঘন সুখে ওর গায়ে নেশা লাগছিল।

ইচ্ছে করছিল বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে, মুখে গালে টিপে ধরে সেই রক্ত-পিণ্ডকে। ঠোঁট দু'টো কাঁপছিল বাসনার। দুরন্ত এক পিপাসা —কিসের স্বাদ যেন পেতে চাইছে এক ঠোঁট। এই বুক। কিন্তু সে কোথায়? কবে আলো লাগবে তার চোখে।

হঠাৎ মনে পড়ল কমলার কথা। আজই সুধাময়কে বলছিল, ওর আদর-টাদর সব আলগা আলগা। আজ ক'দিন যেন সে-ছোড়দি আর নেই। মিণ্টুটাকে নিয়ে কী ভীষণ যে চটকাচ্ছিল আজ, আমি তো অবাক।

অবাক! কি আছে তোর অবাক হবার? বাসনা ভ্রূকুটি করে যেন জবাব দিচ্ছিল কথাটার, একটু চটকালে কী আদর করলে তোর মেয়ে গলে যাবে না, কমলা। ক'মাস পর আর যাচ্ছিও না তোর ছেলেকে চটকাতে।

॥ সাত ॥

কথাটা শুনেছিল বাসনা আগেই। কমলাই বলেছিল। সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুই বোনে বসে গল্প করছে, বীথি কলেজে, ছেলেমেয়েরা ঘুমোচ্ছে, দুপদাপ করতে করতে কমলার সেই বালিগঞ্জের দেওর এসে হাজির। বছর কুড়ি বাইশ বয়স। ভীষণ চঞ্চল। নাম সন্তোষ। এল আর গেল। মিনিট দশেকও বসল না। আসল খবরটা এক নিশ্বাসে দিয়ে দিলে। আগামী সোমবারে ওরা পুজোর ছুটিতে বাইরে যাচ্ছে, বাড়িসুদ্ধ লোক. কমলা বউদি আর বীথির যাবার কথা ছিল তাদের সঙ্গে, বাবা বলে দিয়েছেন তৈরি হয়ে থাকতে। মেজদা যেন কাল-পরশু একবার ও-বাড়ি যায়।

সন্তোষ চলে গেলে কমলা বললে, 'এই এক ছেলে। একদণ্ড বসবে না। কি যে বলল হড়হড় করে, না আমি বুঝলাম, না তাকে কিছু বলতে পারলাম। যাব তো বলেছিলাম, কিন্তু যাব বললেই কি

যাওয়া যায়। কত ঝঞ্ঝাট ঝামেলাই যে আছে।'

'কিসের তোর ঝামেলা। যাবি তো খুড়শ্বশুরের সঙ্গে।' বাসনা বলল, হাঁড়ি-কুড়ি চাল-ডাল তোকে বাঁধাবাঁধি করতে হচ্ছে না। শুধু ছেলেমেয়ে দু'টোকে আগলে নিয়ে যাবি। তা বীথিও তো রয়েছে।'

'কি যে বলো ছোড়দি।' কমলা একপাশের ঠোঁট উলটে বলল, 'কম করেও মাস দেড়েকের জন্যে যাওয়া। এখানকার সংসারের ব্যবস্থা আছে, ওখানের ব্যবস্থাও আছে বইকি, হুট বলতেই কি হয়।'

'এখানকার সংসারের জন্যে তোর ভাববার কি আছে? আমি তো রয়েছি। সুধাময়ের কোনো অসুবিধেই হবে না।' গলায় খুব সাধারণ একটা সুর তুলে বলল বাসনা এবং ভাবছিল, কমলাদের যাওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহ দেখানো তার উচিত হবে না।

ভিজে চুলগুলো আঙুল দিয়ে ফাঁক করে পিঠের চারপাশে ছড়িয়ে দিতে দিতে কী যেন ভাবছিল কমলা। বাসনার দিকে বার-কয়েক চাইল থেকে থেকে।

'আমি কি ভাবছি জান, ছোড়দি। আমরা সবাই চলে যাব, তুমি একা থাকবে। তোমারই বরং বাইরে যাওয়া উচিত। তুমিও চল না।'

বাসনা মাথা নাড়ল। হাতের সেলাইয়ের কাজটার উপর হঠাৎ ঘাড় গুঁজে ঝুঁকে পড়ল এবং ছুঁচের ফোঁড় তুলতে তুলতে মনে মনে বলল, একা থাকতেও মানুষ চায়, কমলা। কখন চায়, কেন চায়, সে তুই বুঝবি না।

'তা হয় না, কমলা। তুই যাচ্ছিস তোর খুড়শ্বশুরেব বাড়ির লোকজনের সঙ্গে। আমার যাওয়া ভাল দেখায় না। আর ও-ভাবে গেলে, ওদের মধ্যে তুই জানিস তো আমি স্বস্তি পাব না।'

তা ঠিক, কমলা ভাবল। আর এ আগে থাকতেই জানত কমলা! ছোড়দিকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ও কিছুতেই যেতে রাজী হবে না। সুধাময়ের সঙ্গে যখন কথা হয়, কমলা বলেছিল বইকি, ছোড়দিকে একা ফেলে আমরা সবাই হাজারিবাগ গিয়ে হাওয়া খাব, সেটা ভাল দেখায় না। বরং ও-বেচারীরই বাইরে গেলে শরীরটা

সারত।··· জবাবে সুধাময় বলেছিল, থাক তবে তোমরা যেয়ো না। কাকাবাবুকে বলে দেব, যাওয়া হবে না। ওরা অবশ্য খুবই অসন্তুষ্ট হবেন।

কথাটা শুনে পর্যন্ত বাসনা বলেছে, হ্যাঁ, ঘোরতরভাবে আপত্তি তুলে বলেছে, সে কেন হবে, তার জন্যে কেন কমলাদের যাওয়া আটকাবে। এ কেমন কথা। বাসনা তো তাদের সংসারে একদিন কি এক মাসের জন্যে নয়, বরাবরের জন্যে, আর চিরটাকালই কমলারা তার জন্যে সব সুখ-সুবিধে আমোদ-আহ্লাদ বেড়ানো বন্ধ করে বসে থাকবে, আত্মীয়দের সঙ্গে অযথা সম্পর্ক খারাপ করবে! না, তা হয় না।

আজ সন্তোষ আসার পর এই পুরনো কথাগুলো আবার নানাভাবে বলল বাসনা এবং শেষে বলল, 'আমার জন্যে ভাবিস না। আমি তো ভালই আছি। সুধাময় থাকবে বাড়িতে, ঝি চাকর আছে: কোনো অসুবিধে হবে না আমার।'

কমলা খানিক ভাবল কী যেন। বলল শেষে, 'বেশ। তবে তোমার ভগ্নীপতি আসুক, দেখি কি মত করে।'

বোনের কাছ থেকে উঠে আসতে আসতে বাসনা ভাবছিল সুধাময় অরাজী হয়তো হবে না। যদি হয়, বাসনা বলবে, কমলাদের হয়ে দু'টো কথা অন্তত বলতে পারবে এবং সুধাময় নিশ্চয় বাসনার কথা ঠেলতে পারবে না। কিন্তু বীথি। বীথি যদি যেতে না চায়! যদি কোনো ছুতো ধরে বলে, না, কলকাতা ছেড়ে সে যাবে না।

তা বীথি বলতে পারে, বাসনা ভাবছিল। বাসনা আর অমলেন্দুকে কলকাতায় রেখে হাজারিবাগে গিয়ে দেড় মাস কাটাবে বীথি! মনে তো হয় না। এ-সব ব্যাপারে কুড়ি বছরের ওই একরত্তি মেয়ে খুব সেয়ানা।

বীথি কমলা নয়। যদি না যায়, বাসনা কিছু বলতে পারবে না তাকে কেননা, আর যার চোখকেই ফাঁকি দিক বাসনা, বীথিকে দিতে পারছে না, পারবে না।

নিজের ঘরে এসে একটা বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল বাসনা।

উঠোন ডিঙিয়ে দরজা ছাড়িয়ে খানিক বাসি রোদ ঘরে ঢুকে রয়েছে। আকাশটা নীল। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ক'টা চিল উড়ছে গোল হয়ে। লালবাড়ির ছাদের কার্নিশে একটা সাদা পায়রা বসেছিল। উড়ে এসে পাশে বসল আর একটা। বসতে না বসতে কী ভাব জমে উঠল দু'জনে দেখ। সাদাটা গা ফুলোলে, ডানা ঝাড়লে একবার, ধোঁয়ারঙ পায়রাটা যেন নেচে-নেচে একবার কাছে গেল আবার। তারপর দু'টিতে পাশাপাশি মুখোমুখি। ঠোঁট ঠোকাঠুকি।

ঠোঁট টিপে হাসল বাসনা। হাতের বইটা চোখের ওপর মেলে ধরল। কিন্তু না, বইয়ের অক্ষরে মন বসছে না। বইটা রেখে দিল বালিশের পাশে।

দু'হাতে তলায় মাথা রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালে আবার। দুপুরের মিষ্টি ছায়ার কার্নিশে বসে জোড়া-পায়রা কী যে নিভৃত আলাপ করছে কে জানে। কত তাড়াতাড়ি মাত্র ক'টি পলকের মধ্যে ওরা কেমন এক হয়ে যেতে পারে! বাসনা ভাবছিল, অমনি পাখি-টাখি হতে পারলে বেশ হত।

তার দিন বয়ে যাচ্ছে, বাসনা মোটমুটি একটা হিসেব করছিল এবার মনমরা হয়ে, অপেক্ষা করার মত সময় আর নেই। ধরি-ধরি করেও এখনো লোকটাকে ধরতে পারে নি বাসনা। হাত বাড়িয়েছে, অমলেন্দুও নাগালের মধ্যে, তবু যাকে বলে মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলা তা পারে নি বাসনা। আর যতদিন তা না-হচ্ছে ততদিন ভরসা কি।

এর জন্যে তেমন সুযোগ দরকার এবং খানিক সময় যখন বাসনা সমস্ত কুণ্ঠা, সঙ্কোচ, এমন কি প্রয়োজন হলে এই সংযমটুকুও সরিয়ে ফেলে মুখোমুখি হতে পারে। অমলেন্দুর। তাকে বলতে পারে কী হয়েছে বাসনার, কে-বা দায়ী এর জন্যে আর কী সে চায়!

কমলারা চোখের আড়াল হয়ে গেলে, এই বাড়ি, এই ঘর, এত সময় এবং নিরুদ্বিগ্ন মন নিয়ে বাসনা সেই সব সুযোগ তৈরি করতে পারবে —সেই সব আবহাওয়া যার মোহ এবং আকর্ষণ ওই লোভী অমলেন্দুর সাধ্য নেই এড়িয়ে যায়। তারপর বাকি পথটুকু আশা করা যায়,

অনায়াসেই অতিক্রম করে যেতে পারবে বাসনা।

কিন্তু বীথি কি যাবে ?

অনেকক্ষণ ভাবল বাসনা। যাও, না-যাও, ভেবে শেষ পর্যন্ত স্থির করে ফেলল বাসনা এবং বীথিকেই বললে যেন, না-যাও তোমার চোখের সামনেই আমাকে আমার কাজ গুছিয়ে নিতে হবে। আমি তোমার গ্রাহ্যও করব না।

যে-বীথিকে নিয়ে বাসনার এত ভাবনা, সেই বীথি কিন্তু যাবার জন্যে সবার আগেই পা বাড়িয়ে ছিল। বীথির কথা-বার্তা হাব-ভাব দেখে মনেই হল না, কলকাতায় কে বা কারা থাকছে এই নিয়ে সামান্য মাত্র ব্যথা আছে তার। বরং কিছুদিন কলকাতা ছেড়ে যেতে পারছে বলে সে খুশী। শুনে পর্যন্ত যেন হাওয়ায় উড়ছিল বীথি, বাক্স শাড়ি ব্লাউজ গোছগাছ শুরু করে দিয়েছিল, দু'-চারখানা বইও। আর বলছিল, হ্যাঁ, বাসনার সামনেই কমলাকে বলছিল যে, বউদি যদিবা আগে-ভাগে ফিরে আসুক ; ও ফিরবে না, কাকাবাবুদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত থাকবে।

বীথির এই আগ্রহ যে লোক-দেখানো আতিশয্য, বাসনা তা বুঝতে পারছিল। আর বলতে কি, এতটা ব্যগ্রতা বীথি যে কেন দেখাচ্ছে তাও বুঝতে পারছে বাসনা। হ্যাঁ, বাসনা অমলেন্দুকে বীথি যে উপেক্ষাই করবে, অন্তত উপেক্ষা করতে চাইছে—বীথি চোখে আঙুল দিয়ে যেন সেটা দেখাবার চেষ্টা করছিল।

বাসনা লক্ষ্য করেছে বীথি মাঝে মাঝে তাকে লক্ষ্য করে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসতে শুরু করেছিল আজ ক'দিন। জিনিসপত্র গোছগাছ করতে করতে, কি হাজারিবাগ যাওয়ার গল্প হচ্ছে যখন, তখন সকলের সামনেই অতি অক্লেশে বীথি বলত, বলছিল আজকাল, কলকাতার এই বাড়ি আর তার ভাল লাগে না, একঘেয়ে হয়ে গেছে, হাজারিবাগে গিয়ে ক'দিন মনের সুখে থাকতে পারবে, ফুর্তিতে।

শেষ পর্যন্ত যাবার দিন, বীথি কমলার সামনেই কি কথায় যেন

বাসনাকে বলল, স্পষ্টাস্পষ্টিই বলল, 'তোমার খুব ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে, না ছোড়দি। এক কাজ করো, অমলদাকে বলে দিয়ো রোজ সন্ধ্যেটা এখানে এসে গল্প-গুজব করে যাবে।'

শুনে বাসনার চোখ, নাক, কান গরম হয়েছিল। রাগে কপালের শিরাটাও দপদপ করে উঠেছিল। কিন্তু কিছু বলতে পারে নি বাসনা। কমলার সামনে কি-ই বা বলা যায়।

শয়তান, বেহায়া মেয়েটা এতেও থামে নি। আরও বলেছিল, 'কলকাতায় এখন পুজোর বাজার। খুব হৈ-চৈ ব্যাপার। তুমি খুব এক-চোট বেড়াতে, থিয়েটার-সিনেমা দেখতে পার অমলদাকে সঙ্গে নিয়ে।'

বীথির চোখ দু'টো চিকচিক করছিল। হাসিতে নয়, ক্ষোভে আক্রোশে। বাসনা অন্তত তাই ভাবল সেই চোখ দেখে এবং মনে মনে বলল, ফিরে এসে তোমায় কাঁদতে হবে বীথি, এই তাচ্ছিল্যের জন্যে তখন তোমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করবে।

কমলারা চলে গেছে। ওদের হাজারিবাগ পৌঁছনোর খবর পর্যন্ত এসে গেছে সুধাময়ের কাছে। বাসনাও চিঠি পেয়েছে একটা ছোট্ট চিঠি। বার বার লিখেছে কমলা, তোমার জন্যে সব সময় ভাবনায় থাকব। খুব সাবধানে থেক, ছোড়দি।

সাবধানেই আছে বাসনা। হ্যাঁ, খুব সাবধানে। সুধাময়ের মত মানুষ, সাদামাটা, নিরীহ লোক—অফিস, আর অফিস ফিরে তাসের আড্ডা, কি-ই বা সে দেখছে, দেখতে পারে--তবু সেই সুধাময়কে পর্যন্ত দূরে দূরে রেখে, এড়িয়ে এড়িয়ে সাবধানে অতি সতর্কভাবে বাসনা ধাপে ধাপে উঠে যাচ্ছে।

পুজোর ক'টা দিন অমলেন্দু একরকম এ-বাড়িতেই থেকে গেল। বাসনাই বলেছিল। সুধাময়ও মাথা নেড়েছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ,—কী হোটেলের খাবার খেয়ে আর কড়িকাঠ গুনে পুজোর দিনগুলো কাটাবে, হে। খাওয়া-দাওয়াটা এ-বাড়িতেই করো। ছোড়দিকে একটু ঠাকুর-টাকুর দেখিয়ে এনো।

অমলেন্দু এই প্রস্তাবে খুব যে অনুৎসাহ বোধ করলে তা মনে হল না। দিনের বেশির ভাগ সময়টা এ-বাড়িতেই কাটিয়ে দিত। রাত্রে ফিরত হোটেলে। আর ধীরে ধীরে অমলেন্দু বাসনার সেই একান্ত গণ্ডির মধ্যে এসে পড়ছিল। বাসনার সম্পর্কে তার মন এবং ধারণা এবার বেশ স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট হতে পারছিল।

বাসনা চাইছিল, তাই হোক। অমলেন্দু ভাবতে থাকুক, আঠাশ বসন্তের অসহায় এই নিস্ফল তরুতে কোনো আশ্চর্য, অতি আশ্চর্য মৌসুমী হাওয়ার স্পর্শ লেগেছে। সেই তরুতে এখন নতুন পাতা, কিছু কুঁড়িও ফুটেছে। আমার এই দেহ এবং মন—বাসনা যেন বলতে চাইছিল প্রকাশ্যেই, একটি শীর্ণ নদীর মতন বয়ে চলেছিল। হঠাৎ তুমি এসেছ, যেন দুরন্ত কোনো উপগ্রহ এবং সেই আকর্ষণে দেখ, জোয়ার জেগেছে। আমার কত জল, কী আবেগ, দুঃসহ যৌবন—আর জ্বালা, তুমি দেখছ তো।

অমলেন্দু একটু একটু করে তা দেখছিল। সাদা মিহি সিল্কের কি সুতোর দু'নোখ সমান চওড়া ম্লান-সোনালী-রঙ পাড় দেওয়া থান পরছিল বাসনা, গায়ের জামার ছুঁচের কাজ, মাথার পুরো খোঁপা ঘাড় বেঁকিয়ে পড়ছিল, আর চোখ মুখ প্রসাধনে পরিপাটি হচ্ছিল দিন দিন।

আর অমলেন্দুকে নিজের ঘরে বসিয়ে বাসনা সেই সব ভঙ্গিতে দাঁড়াতো, বসত, কথা বলত, হাসত, চোখ তুলে চাইত, যার মধ্যে স্পষ্টই নানা অনুরাগ-লক্ষণ ফুটে থাকত, যা ভুল করার নয়।

খুব সহজেই এবং অনায়াসেই এখন কি-না পারে বাসনা। তাগাদা দিয়ে অমলেন্দুর গায়ে জামা খুলিয়ে সামনে বসেই বোতামটা সেলাই করে দিতে পারে, পাশে বসতে পারে অসংকোচে; হাত ধরতে, কিছু বলতেও জড়তা নেই। কখনো লজ্জার লাল আভাটুকু গালে লাগিয়ে কটাক্ষ, কখনো অভিমানে মুখ থমথম জোড়া ঠোঁটের নিরাসক্তি—আবার তেমন মুহূর্তে সেই সব নরম, মিষ্টি, স্নিগ্ধ হাসিতেও অমলেন্দুকে ও ঝিরঝির বৃষ্টির মত ধুয়ে দিতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যে প্রায় শেষ করে অমলেন্দু এল। সুধাময় কোনোদিনই

এসময় বাড়ি থাকে না। তাসের আড্ডায় চলে যায়। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এল অমলেন্দু। বারান্দায় পর্যন্ত বাতি জ্বলছে না, ঘরগুলোর কপাট ভেজানো। বাসনার ঘরেরও। মনে হল না কেউ আছে। চুপচাপ, নিস্তব্ধ। চাঁদের আলোয় বারান্দা উঠোন ভরে গেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে অমলেন্দু এই নিস্তব্ধ বাড়ি, চাঁদের গা-ছড়ানো আলোই যেন দেখল। তারপর আস্তে আস্তে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেল।

ঠিক, যা ভেবেছিল অমলেন্দু। বাসনা আলসের পিঠ ছুঁইয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেলফুলের মত ধবধবে সাদা জ্যোৎস্নার সঙ্গে গা মিলিয়ে আর শ্বেত মর্মর-মূর্তি যেন। অমলেন্দু যে এসেছে বাসনা জানতে পারে নি। জানতে পারলে হয়তো ওর মাথা একটু নড়ত, হয়তো চঞ্চল হত সামান্য এবং চোখ ফিরিয়ে চাইত।

অমলেন্দু আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ালো। বাসনার তবু হুঁশ নেই। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে কার্তিকের তারা-জ্বলা আকাশে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়িষ্ণু চাঁদকেই যেন দেখছে বাসনা।

হাওয়া দিচ্ছিল। মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া। ছাদের এক কোণে খানিকটা দলাপাকানো কাগজ সরসর করে মেঝে ঘষে ঘষে উড়ছিল, আর অমলেন্দুর নাকে খুব ফিকে একটা গন্ধ এসে লাগছিল।

বাসনা কি গায়ে সেন্ট ছড়িয়েছে আজ? অমলেন্দু বুঝতে পারছিল না। হতে পারে। হওয়া আশ্চর্য নয়।

একটুক্ষণ সেই সুন্দর, আশ্চর্য মধুর, তন্ময়-মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অমলেন্দু ডাকল আস্তে গলায়।

চমকে উঠল বাসনা। মুখ ফিরিয়ে চাইল। চেয়ে থাকল ক'মুহূর্ত।

'আমি ভাবলাম, তুমি আজ আর আসছ না।' মৃদুগলায় বলল বাসনা।

'পথে দেরি হয়ে গেল।' অমলেন্দু বাসনার মুখে চোখ রেখে কেমন একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, 'এক চেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা, কিছুতেই

ছাড়লেন না, চায়ের দোকানে টেনে নিয়ে গেলেন। খানিকটা গল্পগুজব করতে হল।'

'তোমাকে যে-সে যখন খুশি টানতে পারে!' বাসনা আলগা করে হাসল।

অমলেন্দু একটু সময় নিল কথাটার জবাব দিতে। বলল, 'কী জানি। তোমার মতন আমার খুঁটির জোর তো অত নয়।'

বাসনা তাকালো। অমলেন্দুর এটা ঠাট্টা না আর কিছু ঠিক বুঝতে পারল না।

'আমার খুঁটির সম্বন্ধে তুমি কি জান?'

'আরও জানতে হবে!' অমলেন্দু চোখ দু'টো বড় করল হাসিমুখেই, 'টাগ অব্ ওয়ারে গো-হারা হারছি!'

একটু চুপচাপ। বাসনা মুখ ঘুরিয়ে আলসের বুক-ঝুঁকে তাকিয়ে থাকল।

অমলেন্দু সিগারেট ধরালো।

'কমলাবউদিদের খবর কি?' শুধালো অমলেন্দু। এই চুপচাপ ভাবটা কাটাতে।

'ভালই। বীথি তোমায় চিঠি দেয় নি?' বাসনা অন্যদিকে মুখ করে ঠোঁট টিপে হাসল।

আমায়…? না। বীথি কেন আমায় চিঠি দেবে!' অমলেন্দু বাসনাকে দেখবার চেষ্টা করছিল।

আর কোনো কথা নেই বাসনার ঠোঁটে। চুপ। একেবারেই চুপ।

'আমি দেখছি—' অমলেন্দু এবার বলল, 'বীথিকে নিয়ে তুমি বড় বেশি মাথা ঘামাও।'

বাসনা ঘুরে দাঁড়ালো। অমলেন্দুর চোখে চাইল সোজাসুজি।

'তোমার বুঝি সেটা পছন্দ নয়।

'তা, একরকম তাই।' অমলেন্দু সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, বীথির সম্পর্কে ভাববার জন্যে তার গুরুজনেরা আছে। তুমি বা আমি তার কথা না ভাবলেও পারি।'

'না, আমি পারি না।' বাসনা হঠাৎ অন্য রকম এক সুরে বলল। অত্যন্ত ক্ষিপ্র, চিকন স্বর এবং দৃঢ়।

'কেন?' অমলেন্দু বাসনার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হচ্ছিল। ওর গলায় ফুলে-ওঠা একটি নীল শিরা এই চাঁদের আলোতেও স্পষ্ট। কাঁপছে শিরাটা। সূক্ষ্ম ক'টি রেখা কুঁচকে উঠেছে কপালে গালে।

'তুমি পার না কেন?' বাসনা অমলেন্দুর চোখে তাকিয়েছিল, পাতা পড়ছিল না। বলছিল মনে মনেঃ কেন পারি না তুমি কি জান না! না, কথাটা আমার মুখ থেকেই শুনতে চাও, অযথাই। তবে শোনো।

'বীথিকে আমি ভাল করেই চিনি।' বাসনা বলল চাপা, মৃদু গলায়; বীথির সম্পর্কে ঘৃণা ফুটে উঠছিল কথার সুরে।

'না চেনার কি আছে।' অমলেন্দু জবাব দিচ্ছিল, 'এক বাড়িতে রয়েছ দু'জনে এতদিন—!'

'তাই বলছিলাম।' অমলেন্দুর কথায় বাধা দিয়ে বাসনা খুব স্পষ্ট, ধীর গলায় বলল, গলার হারটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে, 'বীথি তোমায় অত সহজে তাকে ডিঙিয়ে যেতে দেবে না।'

'ডিঙিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।' অমলেন্দু বলল, 'আমিই বা তাকে ডিঙিয়ে যাব কেন। সে আমার পথ আটকাচ্ছে না।'

'আটকাচ্ছে না—?' বাসনা তাকিয়েছিল তেমনভাবেই।

'না। আমি কখনোই এসব ভাবি নি।' অমলেন্দু খোলাখুলি জবাব দিচ্ছিল।

বাসনা একটু চুপ। আস্তে আস্তে সামান্য দূরে সরে গেল, তাকালো আকাশের দিকে। সাদাটে নীল আকাশ। অজস্র তারা। চাঁদের গা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে একটা ছোট্ট, পাতলা, আলুথালু সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে; শিরশির করছে গা।

'এ-কথা এখন শুনলে?' বাসনা বলছিল, 'বীথির মন ভেঙে যাবে। কমলারাও কষ্ট পাবে।...তোমার উচিত ছিল মতামতটা আগেই জানিয়ে দেওয়া।'

'গায়ে পড়ে—' অমলেন্দু জবাব দিল, 'মনে মনে কমলাবউদিরা কি ভাবছে না ভাবছে তা আমায় জেনে নিয়ে গলা বাড়িয়ে বলতে হবে বীথিকে আমি বিয়ে করব না।'

এও সত্যি, বাসনা ভাবল, কমলারা মনে মনে এতদিন ধরে যা ভাবছে সেটা অদ্ভুত একবার অমলেন্দুকে সরাসরি বলা উচিত ছিল।

অমলেন্দু আবার একটা সিগারেট ধরালো। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এই বাজে ব্যাপারটা আর না গড়াতে দেওয়াই ভাল। তুমি কমলা-বউদিকে আমার হয়ে, মানে আমার মনোভাবটা জানিয়ে দিয়ো।'

'বৈ কি?' বাসনা বলল, 'তারপর কমলা ভাবুক, আমাদের মধ্যে এইসব কথা হয়, এত ভাব আমাদের! আর বীথি, তোমাদের বীথি আমায় ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাক।' হাসবার চেষ্টা করছিল বাসনা।

বাসনার কথাগুলো শুনতে শুনতে অমলেন্দু আজ, এখন, এই অবস্থায় অন্য এক কথা ভাবছিল এবং মনে মনে কিছু একটা স্থির করে ফেলছিল। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে, একটু ঝুঁকে, বাসনার মুখে চোখ রেখে স্পষ্ট সহজ গলায় বলল, 'তোমার ইচ্ছেটা কি?'

'ইচ্ছে—কিসের?'

'এই তোমার-আমার সম্পর্কের, তুমি কি কমলাবউদিদের কাছ থেকে আমাদের মেলামেশা লুকিয়ে রাখতে চাও?'

বাসনা মুখ তুলে স্তব্ধ চোখে দেখছিল। অমলেন্দুর মুখ যেন বোঝা-পোড়ার জন্যে তৈরি হয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

'কি যে বলো!' বাসনা বোকার মতন কথাটা হালকা করে হাসবার চেষ্টা করল।

'তোমাকে আমি বুঝতে পারছি না।' অমলেন্দু বুঝি একটু অধৈর্য হল।

'পারছ না।' বাসনা ভাসা-ভাসা গলায় বলল। মুখ তুলে, এক পলক চেয়ে আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল। গাঢ় কালো ছায়ার মতন মাথাটা স্থির হয়ে আছে। ঘাড়ের ওপর ভেঙে-পড়া খোঁপা; মুখের এক পাশটায় আলো পড়েছে। কেমন একটু ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে

বাসনাকে। মিহি ক'টি চুল গালে নেমে এসেছে, চোখের পাতা একটু কাঁপল যেন। সেই ফিকে গন্ধটা নাকে লাগছে। নিশ্বাস যেন বুকের মধ্যে চেপে চেপে রাখছিল বাসনা। হ্যাঁ চাপছিল; নিশ্বাস শুধু নয়, কেমন এক ভয় এবং বিহ্বলতা।

'কেন?' খানিক অপেক্ষা করে বলল আবার অমলেন্দু, 'কিছু মনে করো না, আমি সব ব্যাপারেই স্পষ্ট হতে পছন্দ করি।'

বাসনা মুখ ফেরালো। চকচক করছিল চোখ দু'টো এবং সামান্য ফ্যাকাশে মুখে একটা কাঠিন্য নামছিল এবার। ঠোটের আগা অল্প অল্প কাঁপছে। 'আমায় তুমি বুঝতে পারছ না। কিন্তু পারা উচিত তোমার।' কথাটা বলে একটু থামল বাসনা, যেন বুঝতে সময় দিলে অমলেন্দুকে, বলল আবার, 'তোমার, শুধু তোমার পক্ষেই সব বোঝা সম্ভব। আমি অন্তত তাই আশা করব।'

আশ্চর্য, বাসনা আর দাঁড়ালো না। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। একটু তাড়াতাড়িই যেন। আর ওর পা এত কাঁপছিল, গা টলছিল যে অমলেন্দু ভাবছিল, বাসনার বোধহয় মাথা ঘুরে গেছে, টলে পড়বে এখুনি।

সত্যিই বাসনা যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো। দুলে পড়ছিল পাশ ঝুঁকে। হাত বাড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছিল কিছু।

অমলেন্দু এসে ধরে ফেলল। বাসনার ফিট হয়েছে আবার। চোখের পাতা তখনো আধবোজা, ঘোলাটে চোখ, ছলছল করছিল। জ্বরো রুগীর মতন ঠোঁট নড়ছিল। শক্ত মুঠোয় অমলেন্দুর বুকের কাছটায় খানিকটা ধরে ফেলেছিল বাসনা। আর বিড়বিড় করে বলছিল। কী যে বলছিল, অমলেন্দু বুঝতে পারছিল না। কিন্তু মনে হচ্ছিল অমলেন্দুর, বাসনা তাকে এখন সব কথাই বুঝিয়ে দিচ্ছে।

ছাদের ওপর আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল বাসনাকে। শরীরটা আরও সাদা দেখাচ্ছিল। বাসনার চোখ বুজে গিয়েছে ততক্ষণে এবং ঠোঁট জুড়ে গেছে।

॥ আট ॥

কমলাদের শেষ চিঠি এল অগ্রহায়ণের গোড়ায়। আর ক'দিন পরেই ওরা ফিরছে।

অফিসের পোশাক গায়ে চড়িয়ে সুধাময় বলছিল বাসনাকে, 'শীতের শুরুতেই চলে আসছে। আরও ক'টা দিন থেকে এলে পারত। এই সময়টাই ঠিক চেঞ্জের সময়।'

চিঠিখানা হাতে করে নীচু মুখে দাঁড়িয়েছিল বাসনা। সুধাময় বলল আবার, 'আপনি কি বলেন ছোড়দি, লিখে দেব নাকি ক'টা দিন আরও থেকে আসতে?'

'তাই কি ওরা থাকবে?' বাসনা বলল।

'কাকাবাবুরা তো থাকছেন আরও মাসখানেক। অসুবিধে কি।' সুধাময় পোর্টফোলিওটা হাতে তুলে নিল।

'কমলার বোধহয় ফেরার ইচ্ছে।' বাসনা চিঠিখানার দিকে চোখ রেখে বলল, 'তবু একবার লিখে দেখুন।'

বাসনা মুখে বলল কিন্তু মনে মনে চাইছিল ফিরে আসুক কমলারা ফিরে আসুক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং বীথিও। আর দেরি সইতে পারছে না বাসনা। ধৈর্য থাকছে না আর।

তখন চাইছিলুম ওরা যাক -আর এখন চাইছি ওরা আসুক—বাসনা সুধাময়ের ঘর গুছতে গুছতে ভাবছিল এবং নিজেকেই একটু যেন বিদ্রূপ করে ম্লান হাসছিল।

বিছানা ঝেড়ে-ঝুড়ে বেড্‌কভারটা নিভাঁজ করে পেতে একটু বসল বাসনা। সমস্ত বাড়িটা কী নিস্তব্ধ। কাক-চড়ুইয়ের ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। কমলার ঘরের দেওয়াল-ঘড়ির একটা শব্দ অবশ্য আছে, মৃদু একটানা মোলায়েম শব্দ। জানলা দিয়ে রোদ আসছে। কী স্বচ্ছ, উজ্জ্বল রোদ। এক মুঠো রোদ ড্রেসিং টেবিলে

কাঠের ওপর যেন টপকে গিয়ে উঠে বসেছে। বাসনা সেই রোদের দিকে চেয়ে থাকল। এবং অল্পক্ষণ পরে যখন চোখ তুলল, নিজেকে, হ্যাঁ নিজের গোটা শরীরটাকেই দেখল বাসনা আয়নার গায়ে একটা ছবির মতন নিশ্চল ফুটে রয়েছে।

নিজের চোখ, কী চুল, কী মুখ—এমন কি বুক এবং গা দেখার আর তেমন কোনো আগ্রহ নেই। তবু একটুক্ষণ দেখল বাসনা। মনে হচ্ছিল, হ্যাঁ, এবার শরীরটা বেশ শুকিয়ে আসতে শুরু করেছে। কমলা থাকলে—এই পরিবর্তনটা তার চোখে পড়ত। সুধাময় পুরুষ মানুষ। সারাদিনে কতটুকুই বা দেখে বাসনাকে। তার পক্ষে এসব বোঝা সম্ভব নয়।

ফিরে এসে কমলা প্রথমেই হয়তো জানতে চাইবে, তুমি তো ভীষণ শুকিয়ে গিয়েছ ছোড়দি, কি হয়েছে তোমার ?

কি হয়েছে ! বাসনা উঠে পড়ল। মনে মনে সেই দৃশ্যটা কল্পনা করল, দুই বোন যখন মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে প্রায় দেড়টা মাস পরে, আর পাশেই বীথি ; হয়তো বা ঠোঁট বেকিয়ে হাসছে।

কি হয়েছে কমলাকে বোঝাবার কি বলবার দরকার হবে না বাসনার। কেননা, সত্যিই তো বাসনাকে বোনের কিংবা বীথির মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে না, কোনোদিনই। এ বাড়িতেই বাসনা তখন আর নেই। তার আগেই চলে গেছে। ওর ঘর শূন্য, বিছানা শূন্য।

কমলা বিশ্বাস করতে চাইবে না, বিশ্বাস করতে পারবে না, ভীষণ আঘাত পাবে, হয়তো রাগে ঘৃণায় লজ্জায় মুখটা পাথরের মতন কঠিন করে ঘরে গিয়ে বসবে। বীথি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বিছানায় লুটিয়ে কাঁদবে, কুটি-কুটি করে ছিঁড়বে বাসনাকে মনে মনে।⋯ হ্যাঁ—বাসনা মোটামুটি ভবিষ্যৎ দৃশ্য তো দেখতেই পারছে। কিন্তু কোনো উপায় নেই। একটা চিঠি অবশ্য কমলার নামে রেখে যাবে বাসনা। ইচ্ছে হলে সে-চিঠি পড়তে পারে কমলা। যদি পড়ে, তবে সমস্ত জানতে আর বুঝতে পারবে।

'আমি ভালবেসে বা এই শরীরটার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বাড়ি

ছেড়ে চলে যাচ্ছি অমলেন্দুর সঙ্গে, এ-কথা সত্যি নয় কমলা। এমনও নয় যে, আমি ঘর-সংসার স্বামীর জন্যে তিলে তিলে মরছিলাম। আমার ভাগ্য, আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একটি মুহূর্ত আমি অসতর্ক হয়েছিলাম, ভুল করেছিলাম, বিশ্বাস করেছিলাম অমলেন্দুকে। সে আমার শনি। এক মুহূর্তের অসাবধানে সেই শনি আমায় গ্রাস করে ফেলেছে। এই কলঙ্ক পেটে নিয়ে আমি যদি মরতে চাইতাম হয়তো মরতে পারতাম। কিন্তু তা আমি চাই নি।

যে আমার সর্বস্ব নষ্ট করল তার সর্বনাশ আমিই বা না করব কেন। লোকটাকে আমি কী ভীষণ ঘৃণা করি, আমিই শুধু তা জানি। তবু যাচ্ছি। যেতে হচ্ছে।

বাসনা মনে মনে চিঠির খসড়াটা যেন এখুনি করে ফেলল এবং ভাবল, মোটামুটি এসব কথা লিখলেই কমলা জিনিসটা বুঝতে পারবে।

সুধাময়ের ঘর গুছিয়ে বাইরে এল বাসনা। দরজাটা বাইরে থেকে টেনে ভেজিয়ে দিল।

এরপর একবার রান্নাঘরে যাওয়া দরকার। বাসনা ভাবছিল নীচে যাবে, কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছিল না।

নিজের ঘরেই এসে বসল বাসনা। খানিকটা চুপচাপ বসে জানলা দিয়ে আকাশ, রোদ, কাক আর চড়ুই দেখল। আর যে-সব কথা মনে আসছিল, হঠাৎ যেন সব হুস করে উড়িয়ে দিয়ে আপন মনেই হাসল।

অমলেন্দুকে যা ভাবাতে চেয়েছিল ও—বোকা লোকটা তাই ভেবে নিয়েছে, বাসনা নোখ খুঁটতে খুঁটতে ভাবছিল আবার। অমলেন্দু ভেবেছে, বাসনা তাকে ভালবেসেই ঘর ছাড়ছে।

ঘর অবশ্য ছাড়ছেই বাসনা, ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু তোমায় ভালবেসে নয় বা তোমার ভালবাসা আমায় ভরে রাখবে এ আশা নিয়েও নয়। বাসনা বলছিল, অমলেন্দুকে উদ্দেশ্য করে যেন, আমি তো জানি, যদিও মুখে তুমি বললে না, ভাবখানাও দেখালে যেন বাসনাকে কতই ভালবেসে ফেলেছ, কিন্তু আসলে যা তুমি করেছ এবং

যার চারা নষ্ট করবার কোনো উপায়ই নেই, শুধু তার ভয়েই এই সাধুতা তোমার। তা ভালই করেছ। নয়তো আমাকেই মুখ ফুটে বলতে হত। সে কষ্টটুকুর হাত থেকে আমায় বাঁচালে, এই যা। ভবিষ্যতে তুমিও আকাশ থেকে পড়বে না, আমিও না। কেউ কাউকে কিছু বলব না, অথচ বুঝব। আর কখনও যদি ন্যাকামি করে কিছু বলতে আস অমলেন্দু, বাসনা পরম নিশ্চিন্তে তা উপেক্ষা করতে পারবে।

সেদিন অমলেন্দু এলে কমলাদের ফিরে আসার খবরটা দিলে বাসনা।

'তাই নাকি, কবে?' শুধলো অমলেন্দু চা খেতে খেতে।

'দিন আট-দশের মধ্যে।'

'তা ভালই হল।' অমলেন্দু বাসনার দিকে চেয়ে বেশ সহজভাবেই হেসে বলল, 'কমলাবউদিরা ফিরে না-আসা পর্যন্ত তো কাজটা হচ্ছে না আমাদের।'

'কাজ, কি কাজ?' বাসনা অবাক হচ্ছিল।

'শুভকাজ!' অমলেন্দু বোকার মতন জবাব দিয়ে হাসল।

অত্যন্ত কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছিল অমলেন্দুর সেই কালো গোল মুখের গাল-গলা ফোলানো, মুখ চাপা-করা হাসি। বাসনার সারা গা ঘিনঘিন করে উঠল।

'মানে?' রুক্ষ স্বরে, চোখ কুঁচকে হঠাৎ প্রশ্ন করল বাসনা।

কোনো জবাব না দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল অমলেন্দু এবং এখনও হাসছিল মুচকি-মুচকি।

'মানেটা এমন কি কঠিন।' অমলেন্দু অতি সরল স্বরে বলছিল, 'কমলা বউদিরা এলেই আমাদের রেজিস্ট্রীর কাজটা সেরে নিতে পারি।'

কথাটা কানে যেতেই বাসনার সারা বুকের মধ্যে একটা কাঁপুনি দিয়ে গেল। হাত দু'টো কেমন অসাড় অসাড় লাগছিল। মুখটা শুকনো। ভুরু আর কপাল কুঁচকে উঠেছিল। অস্বস্তি বোধ করছে বাসনা, বিরক্তও হয়েছে খুব। অমলেন্দুর দিকে অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে

বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'মনে মনে এসব বুঝি ভেবে রেখেছ ?'

'হ্যাঁ। মোটামুটি ঠিক করে রেখেছি।'

'আমায় তো জিগ্যেস করো নি।' বাসনা এমনভাবে বলল, এমন একটা কঠিন স্বরে যার অর্থ বোঝালো, আমায় না জানিয়ে এসব ঠিক করার কোনো অধিকার তোমার নেই।

'করি নি মানে, বললুম যে সেদিন।' অমলেন্দু অবাক হচ্ছিল।

'না, সেদিনের কথা থেকে এসব বোঝায় না।' একটু থেমে, 'আমিও তো সেদিনই তোমায় বলে দিয়েছি কমলাদের কিছুই জানাতে চাই না এখন। যা জানবার ওদের, যা জানাবার পরে ওরা জানবে। আমি চলে যাওয়ার পর, আগে নয়।'

অমলেন্দু চুপ করে শুনল কথাগুলো। জবাব দিল খানিকটা পরে, 'লুকোচুরি করার কোনো দরকার ছিল না। সোজাসুজি, স্পষ্টাস্পষ্টিই কাজটা হতে পারত।'

'না, পারত না। কি তুমি সৎকাজ করছ!' কথাটা ঠোঁট থেকে ফস করে বেরিয়ে এল বলে ভাবল বাসনা, একটু বেশিই বলা হয়ে গেছে বোধহয়। অমলেন্দুর হয়তো ভাল লাগল না কথাটা কানে। একটু থেমে, একটু ভেবে--আগের কথার জের টেনে জিনিসটা হালকা করতে চেষ্টা করল বাসনা, 'তোমার কি, এদের সঙ্গে কতটুকু আর তোমার সম্পর্ক। কিন্তু আমার অবস্থাটা কেমন হবে ভেবে দেখেছ। কমলা শুনে পর্যন্ত মুখ ঘুরিয়ে নেবে, সুধাময় ছি-ছি করবে, বীথি বলবে—কী যে সে বলবে না-বলবে জানি না, তার পক্ষে সবই সম্ভব। আমার অত দুঃসাহস নেই। যা করবার আড়ালেই আমি করতে চাই।' বাসনা ছটফট করছিল।

অমলেন্দু ভাবছিল। বাসনার এই মামুলি লজ্জা, আড়ষ্টতা এবং ভয়-ভয় ভাবটা বেশি। সেদিনও বাসনা বলেছিল, সামনা-সামনি কিছুই সে কমলাদের জানাতে চায় না। চলে যাবার পর ওদের জানতে কিই বা আর বাকি থাকবে। তবু যা জানাবার পরে জানাবে বাসনা, চিঠিতে।

অমলেন্দুর এটা পছন্দ নয়। কিন্তু বাসনার কথা ভাবলে অবশ্য, ওর অবস্থাটা বুঝে এই লুকোচুরি না-করেই বা উপায় কি। 'এই লোকলজ্জাটা কাটাতে পারলেই কিন্তু ভাল হত।' বলল অমলেন্দু, 'অসৎ কাজই বা তুমি কি করছ!' একটু থেমে আবার, 'সুধাদাকে আমি চিনি। সোজাসুজি ব্যাপারটা বললে আর যাই হোক তার মনটাও খুঁতখুঁত করত না।'

জবাব দিল না বাসনা। ভাবছিল, লোকলজ্জা কাটাতে বলার উপদেশটা অমলেন্দুর মতন লোকের পক্ষে দেওয়াই সম্ভব যার সঙ্কোচ-লজ্জার বালাই নেই। মনে মনে বলছিল বাসনা অমলেন্দুকে, তোমার মুখেই এসব কথা শোভা পায়, তোমার মতন চরিত্রের লোকের মুখে।

লোকলজ্জা আমার আছে, থাকবে। নাচতে নেমেছি বলেই যে আমার আলগা গায়ে থাকতে হবে, তার কি মানে আছে! আমার রুচিতে এবং ইচ্ছেয় এসব বাধে। তাছাড়া, তুমি আর কতটুকু বুঝবে —যারা আমায় এত বিশ্বাস করত, শ্রদ্ধা করত, যারা জানত, সিঁথির সিঁদুর মুছলেও আমার মধ্যে কোনো গ্লানি কি হতাশা দুঃখ ছিল না, তাদের চোখের সামনে হঠাৎ এক পর-পুরুষের হাত ধরে ঘর ছাড়বার তেজ দেখালে কেউ আমায় বাহবা দেবে না। চোখের সামনে সেই কেলেঙ্কারি হওয়ার চেয়ে আড়ালে হওয়াই ভাল। না আমি, না ওরা কেউ কারুর কথা শুনতে যাচ্ছি; ঘেন্না, জ্বালা, দুঃখ, কান্নাকাটি দেখতে পাচ্ছি।

শেষ পর্যন্ত অমলেন্দু বলল, 'বেশ, তুমি যখন চাইছ তাই হবে। কিন্তু কমলাবউদিরা আসার আগে তোমার যাওয়া হচ্ছে কই!'

বাসনাও ভাবল একটু। জবাব দিল, 'কমলারা আসার দিনই যদি চলে যেতে পারতুম! ওর কাছে আমি সব সময় এখন ভয়ে ভয়ে থাকব।'

'ক'টা দিন থাকতেই হবে, উপায় নেই।' অমলেন্দু একটু হেসে বাসনার হাতটা টেনে নিল।

'তাও থাকতে হয় না যদি ব্যবস্থা করো।' অমলেন্দুর মাথার

কাছে ঘন হয়ে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল বাসনা। তারপর সামান্য পাশে হেলে পড়ে, চেয়ারে-বসা অমলেন্দুর মাথা-মুখের সঙ্গে ওর বুক ছুঁইয়ে, অমলেন্দুর চুলে আঙুল দিয়ে ইলিবিলি কাটতে লাগল। কখন মুখটা নীচুও করল খানিক, প্রায় কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তুমি কিছু মনে করলে না তো!'

অমলেন্দু মাথাটা আরও যেন হেলিয়ে দিয়ে হাসল, 'না, মনে করব কেন!'

অমলেন্দু চলে গেলে বাসনা চিঠি লিখতে বসল কমলাকে। দু'চারটে এ-কথা সে-কথার পর লিখল; সুধাময়ের ইচ্ছে তোরা আর ক'দিন থেকে আসিস। এখন নাকি শীত পড়ছে ওখানে, সময়টা খুব ভাল আমিও ভেবে দেখলাম, আরও দিন আট-দশ অনায়াসেই তোরা থেকে আসতে পারিস। অমলেন্দুও সেদিন আমাদের কাছে বলছিল দিন সাতেকের জন্যে একবার ওখানে বেড়াতে যাবে। ওর যেতে অবশ্য দিন সাতেক দেরি হবে। তোরা যদি তখন চলে আসিস—অমলেন্দু যাবে না। যদি না আসিস, হপ্তাখানেক তোদের সঙ্গে থেকে এক সঙ্গে সব ফিরতে পারবি। আমার মনে হয় তাই ভাল। ফেরার সঙ্গী পাবি, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে অসুবিধে হবে না। কি করবি জানাস।

চিঠিটা খামের মুড়ে, কলম রেখে একটু চুপচাপ বসল বাসনা। গালে হাত দিয়ে ভাবল, আজ মঙ্গলবার—আগামী বুধবার আর একটা চিঠি লিখতে হবে কমলাকে: অমলেন্দুর যাওয়া বোধহয় হলো না। তোরা আগামি সপ্তাহেই ফিরিস। আমার শরীরটা ভালো নেই।

কমলারা আসার আগেই রেজিস্ট্রীর কাজটা সেরে রাখতে চায় বাসনা। আর যেদিন ফিরবে কমলারা, সে-দিনই কি বড়জোর পরের দিনই এ-বাড়ি ছাড়তে চায়। কমলার চোখের সামনে একটা দিন কাটানোও এখন কি যে কষ্টের আর ভয়ের সে শুধু বাসনাই বুঝতে পারছে।

কিন্তু, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবছিল বাসনা—এই চিঠির পরও যদি কমলা জবাব দেয়, সে আগামী সপ্তাহেই ফিরছে, তবে?

।। নয় ।।

হাতটা কাঁপছিল। কলমটাকে শক্ত করে ধরতে গিয়ে মনে হল, সব অসাড় হয়ে গেছে, বরফে হাত রেখে বসে থাকলে যেমন হয়। ঘামে ভিজে গেছে। বুকটা কেমন এক উত্তেজনায় ধক্‌ধক করছিল। কিসের আঁচ লেগে চোখ যেন জ্বালা করছে, গরম। নিশ্বাসও উষ্ণ।

তবু কাঁপা হাতেই বড় বড় করে সইটা করে ফেলল ও ; বাসনা সেন। ইংরিজিতেই। অক্ষরগুলো কেঁপে অসম হয়ে রইল। থাকুক। একটি পলক সেই কাগজটির দিকে চেয়ে থাকল বাসনা, নীচের ঠোঁট দাঁতে কামড়ে। তারপর আস্তে আস্তে কলমটা টেবিলে নামিয়ে রাখল।

একটি কি দু'টিবার চোখ তুলেছে বাসনা সারাক্ষণে। নয়তো মুখ নীচু করেই বসে। কাঠের পার্টিশান দেওয়া এই ছোট্ট ঘরে কে আছে, কারা আছে তা দেখবার যেন দরকার নেই। সত্যিই নেই। কাউকেই চেনে না বাসনা, এক অমলেন্দু ছাড়া। কিন্তু সেই অমলেন্দুর দিকে তাকাতেও পারছে না বাসনা। অদ্ভুত এক সঙ্কোচ! বাসনা জড়সড় হয়ে বসে। অমলেন্দু বাদে আর চারজোড়া চোখ যেন দেখছে, হাসছে, ঠোঁট টিপেটিপে এবং ভাবছে, ভাবাই স্বাভাবিক এই মেয়ে, বাসনা সেন যা করল, হ্যাঁ তা একটা কীর্তিই বৈকি! বিধবা একে বলা যায় না, বেহায়া-বিধবা, কাঁচা বয়সের জ্বালায় জ্বলছিল, আর তারপর যা হয় —প্রেমেই পড়েছিল অমলেন্দুর সঙ্গে। লুকিয়ে লুকিয়ে কত রঙ্গই করেছে। এখন চোরের মতন দেখ, ওয়েলিংটনের এই কাঠের পার্টিশনে দেওয়া ছোট্ট এক ফালি ঘরে তার বৈধব্যকে খসখস কলমের সইয়ে আর বিড়বিড় মুখের কথায় (আমি বাসনা সেন শ্রীঅমলেন্দু মিত্রকে আজ থেকে বৈধ স্বামীরূপে গ্রহণ করিলাম—) বাসি কাপড়ের মতন আড়ালে খুলে ফেলে দিল।

শপথ করতে গিয়ে গলা যেন আর ফুটছিল না। নেশার ঘোরে কোনোরকমে ঠোঁট নেড়ে সাপ চলার সুরে কথাগুলো আওড়ে গেল বাসনা। কিন্তু মনে মনে একবার থেমেছিল। বৈধ স্বামী! স্বামী···

আর এক স্বামী, এক ফোঁটা বৃষ্টির মতন টুপ করে যেন চোখের পাতায় পড়ে একটু বুঝি ভিজিয়ে দিলে, অস্পষ্ট করে তুলল দৃষ্টি। বাসনা খুব অস্পষ্ট, ভুলে যাওয়া স্বপ্নের মতন ফিকে খাপছাড়াভাবে দেখছিল—পরিমলকে, সামনে বসে, গায়ে সাদা পাতলা চাদর, খালি গা, হাতে বাঁধা হলুদ সুতো···হালকা দু'টি ভুরুর নীচে অত্যন্ত নিরীহ লজ্জাভরা দু'টি চোখ নিয়ে বসে আছে।

···বৈধ স্বামী হিসেবে গ্রহণ করিলাম। হ্যাঁ, কথাটা—ঠোঁট বেঁকিয়ে কাঠের মত শক্ত করে শেষ করে ফেলল বাসনা। কপালের শিরা দপ্ দপ্ করছিল।

মনে হচ্ছিল বাসনা ঘুমের মধ্যেই বিছানা ছেড়ে উঠে ঘুম-চোখেই নিশির ডাকে কোথাও চলে এসেছে। এখানে সব অন্ধকার, আবছা। বাতাস নেই, আলো নেই। পুকুর পাড়ের স্যাঁতসেঁতে অনুভূতি, কতক-গুলো ঝিঁঝিঁ ডাকছে কানের কাছে, গাছ পাতা লতার ফিসফিস। খসখস।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার একটা শব্দ হল। চমকে উঠল বাসনা। বুকটা আবার ধক্‌ধক্ করে উঠল।

ভদ্রলোক হাসছেন। নমস্কার করলেন এবং বললেন—।

কী বললেন বাসনার কানে গেল না। আড়ষ্ট হাতে বাসনাও প্রতি-নমস্কার করল।

তারপর বাইরে। সেই তিনজন। এরা কে—? বাসনা চেনে না। অমলেন্দুর বন্ধু, পরিচিত সব। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সিগারেট ধরালো। কথা বলছিল হেসে। তরল সুরে।

ঠক-ঠক শব্দ হচ্ছিল সিঁড়ির। বাসনার পা কাঁপছিল, ভয় পাচ্ছিল না।

কোথায় নামছে বাসনা, কতটা নেমে এসেছে, কোথায় নেমে যাচ্ছে?

রাস্তায়।

'আমরা যাই অমলেন্দু, তুমি ট্যাক্সি নাও। উইশ ইউ বোথ্ এ ভেরী হ্যাপি কনজুগাল লাইফ!' বাসনা তাকালো, একজন বলছে, সেই তিনজনের একজন। এবার বাসনার দিকে চাইল, হাসল একটু, 'পরে আলাপ হবে আপনার সঙ্গে, বউদি। এই তিন নাপিতের পাওনাটা কিন্তু থেকেই গেল। পরে আদায় করে নেব। নমস্কার।'

হাত তুলে তুলে বাসনাকে তিনটি নমস্কার করতে হল। দম দেওয়া পুতুলের মতনই। মুখের কোথাও একটু হাসি ফুটল না, রেখা কাঁপল না।

ট্যাক্সিতে এক পাশ ঘেঁষে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকল বাসনা। ভীষণ অন্যমনস্ক।

সিগারেট ধরালো অমলেন্দু। কী যেন বললে একটা, বলে তাকালো বাসনার দিকে। কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

হাত বাড়িয়ে বাসনার গা ছুঁয়ে যেন তাকে জাগালে অমলেন্দু, 'কি ব্যাপাব, চুপচাপ যে!'

অমলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু একটু করে বাসনা যেন নিশির ঘোর কেটে জেগে উঠছিল।

'ভয় হচ্ছে?' অমলেন্দু বলল আবার হাসি-মুখে।

'ভয়।' মাথা নাড়ল বাসনা, 'না।'

'লজ্জা?' অমলেন্দু একটু সরে এল।

'লজ্জা,' ঠোঁটে দাঁত ছুঁইয়ে ফিসফিস গলায় জবাব দিলে বাসনা, 'লজ্জা হবে কেন?'

'তবে—?'

'কি?'

'একেবারে চুপচাপ যে! মনে হচ্ছে তুমি যেন মনমরা হয়ে রয়েছ।'

'পাগল!' বাসনা একটু হাসবার চেষ্টা করল। অমলেন্দুর হাতটা সরিয়ে দিতে গিয়ে, হঠাৎ কী যেন খেয়াল হল, আস্তে করে নিজের

হাতখানা রাখল ওর হাতের ওপর।

'কি ভাবছ?' শুধলো অমলেন্দু একটু থেমে।

কি ভাবছে বাসনা, সেটা এখন—বিকাল চারটের পর আর বলা যায় না। এখন আমার বৈধ স্বামী, বাসনা যেন মনে মনে নিজেকে এবং অমলেন্দুকে ভেঙচি কেটে বলছিল, এখন আমার বৈধ স্বামী তুমি—অমলেন্দু মিত্র। আর আমি বাসনা সেন—পরিমল সেনের বিধবা স্ত্রী—অক্টোবরের তেইশে বিকেল চারটের পর বাসনা মিত্র হয়ে গেছি।

তোমার স্ত্রী হওয়ার পর আমার আর ভাববার কি থাকতে পারে? আমি যদি এখন বলি যে, আমি—হ্যাঁ আমি, তেইশে অক্টোবরের বিকেল চারটের পর যে বাসনা মিত্র হয়েছে- সেই মেয়ে বাসনা সেনকে ভাবছে এবং পরিমলকে, তুমি কি খুশী হবে? হবে না। নিশ্চয় নয়। পরিমলও হত না, হয়তো হয় নি, যদি ধরে নেওয়া যায় কোনো সূক্ষ্ম বায়বীয় অস্তিত্ব নিয়ে সে বেঁচে থাকে, বেঁচে ছিল, আছে এখনও।

বাসনা মুখ ফিরিয়ে বাইরে তাকালো। হুস্ করে একটা বাস পেরিয়ে গেল। ট্রামের ঠং-ঠং ঘণ্টা বাজছে। রাস্তায় লোক। জুতোর দোকান। একটা কুলি ঝুড়ির মাথায় লাল রঙের এক ট্রাই-সাইকেল চাপিয়ে চলেছে। দমকা ঠাণ্ডা হাওয়াও বুঝি বয়ে গেল।

পরিমল আমাকে ভালবাসত। সাধারণত স্বামীরা স্ত্রীকে যেমন ভালবাসে। হ্যাঁ, তেমনি। আমরা ঘর করেছি এক সঙ্গে বিছানায় শুয়েছি। একই বালিশে মাথা দিয়ে। মুখে মাথায় এক হয়ে। গায়ে গায়ে তফাৎ থেকেও না থেকে। আর তার কাছেও আমার লজ্জা ছিল না। কোনোখানেই নয়। আমার সব তারই ছিল। যদি বলো তবে, তুমি ভাবতে পার তার হাতে তার চোখে আমি মনে শরীরে নগ্নই ছিলাম।

পরিমলের জন্য আমার সময়কে আমি একদিন খরচ করেছি কত সুখে। ওর ঘুম ভাঙিয়েছি সকালে, ওর জন্যে হাত পুড়িয়েছি উনুনে, শাড়ি জামায় সেজেছি ওর চোখে যাতে ভাল লাগে। তার জন্যে

আমি ভাবতাম। বাধ্য স্ত্রী, বৈধ স্ত্রীর মতনই এ-সব ভাবনা, স্বামীর সুখ-দুঃখের ভাবনা ভাবা আমার কর্তব্য ছিল এবং আমি ভেবেছি। পরিমলের মুখ কালো দেখলে ভেবেছি, কি হয়েছে; কি হয়েছে ওর, শরীর খারাপ হলে ভেবেছি—অসুখটা তাড়াতাড়ি সেরে যাক।

যাকে ভালবেসেছিলাম—সে মরে গেলে কেঁদেছি বৈকি। আঘাত পেয়েছি। দুঃখ বেজেছে। কতদিন মনে হয়েছে আমার সর্বস্ব পরিমল ওর চিতায় ছাইয়ের সঙ্গে পুড়িয়ে উড়িয়ে বিলিয়ে দিয়ে চলে গেছে। মনে হত লোকটা কী নিষ্ঠুর। এত যন্ত্রণা কেন সে দিল আমাকে।

তারপর এখন সেই পরিমলকে আমি ভাবছি তোমার স্ত্রী হয়ে। বৈধ স্ত্রীদের এ-সব ভাবার অধিকার অবশ্য নেই। তবু ভাবছি। যেমন তোমার কথাও আমায় ভাবতে হয়েছে বাসনা সেন থেকেও।

অমলেন্দু কথা বলছিল। বাসনা যেন চমকে উঠে চাইল।

'এতদিন তবু ছিলাম একরকম। এখন থেকে খুবই খারাপ লাগবে।' অমলেন্দু বলছিল।

'কেন?' বাসনা চোখ তুলে তাকালো।

'তুমি এক জায়গায়, আমি অন্য জায়গায়।' অমলেন্দু হাসবার চেষ্টা করল।

'ও!' বাসনার বুকের মধ্যে কেমন একটু শিরশির করে গেল। অমলেন্দুর চোখে চোখে চেয়ে একটু চুপ করে থেকে মৃদু গলায় বলল, 'আমারও ভাল লাগবে না। কিন্তু আর ক'দিন বা। দিন চারেক।'

'কমলাবউদিরা সত্যিই শুক্রবারে ফিরবে তো?'

'তাই তো লিখেছে।'

'লিখেছে, কিন্তু যদি না এসে পৌঁছায়!' অমলেন্দু সুস্থির হতে পারছিল না।

'না এলেই বা।' বাসনা এবার, প্রথম ঠোঁট মেলে হাসল, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আর কিসের ভয় তোমার।'

'ভয় না। তবু—!' অমলেন্দু বাসনার হাত তুলে নিল, 'আমি ঘরভাড়া করেছি জান তো।'

'জানি। বলেছ আগেই।'

'কিছু কিছু জিনিসপত্র কিনেছি।'

'না কি!' বাসনা বুক চেপে নিশ্বাস ফেলল।

হ্যাঁ, বিছানা, বাসনপত্র—'

'খুব সংসারী তো তুমি।'

'কয়েকটা শাড়ি কিনেছি তোমার জন্যে। নিজের চোখে যে রং ভাল লেগেছে তাই দেখে দেখে।'

'শাড়ি।' বাসনার গলার কাছে খানিকটা বাতাস হঠাৎ যেন মুঠোর মতন শক্ত হয়ে আটকে গেল।

উজ্জ্বল গাছপাতা-রঙ শাড়ি পরিয়ে চেহারাটা যেন মনে মনে একবার দেখল বাসনা। তারপর খুব সহজেই তার মনে এল, এরপর অমলেন্দু চাইবে বাসনার এই সাদা সিঁথিতে সিঁদুর উঠুক, কপালে টিপ, পায়ে আলতা। আরও হয়তো অনেক, অনেক কিছুই।

এমন নয় যে অমলেন্দু চাইলেই বাসনাকে এই বয়সে আবার নতুন করে টিপ আলতা পরতেই হবে। কিন্তু সিঁদুর!

বাসনার শুকনো, সাদা নরুনের আগার মত সরু সিঁথিটা কিরকির করতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন অনেক ধুলোবালি ময়লায় সিঁথিটাই হারিয়ে গেছে।

আলগোছে হাতটা মাথায় আস্তে আস্তে টেনে বুলিয়ে নিল বাসনা; নিয়ে কপালে ধরে থাকল।

'কি, মাথা ধরেছে?' অমলেন্দু কোমল স্বরে শুধলো।

মাথা হেলালো বাসনা। হ্যাঁ ধরেছে। যদিও মাথা ঠিক ধরে নি, ঝিম-ঝিম করছিল।

'তুমি কেমন নার্ভাস হয়ে পড়েছ।' খানিক থেমে বলল অমলেন্দু, 'এ-সব হাঙ্গামা একটু সহ্য করতে হবে বৈকি! তবু তো রেজিস্ট্রীর ব্যাপারটা কত ইজি!' অমলেন্দু একটু হাসল।

বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামল। 'ক'টা বেজেছে?' শুধলো বাসনা। সুধাময়ের অফিস থেকে ফেরার কথা বার বার মনে পড়ছিল।

'প্রায় সোয়া পাঁচ।' গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল অমলেন্দু।
ততক্ষণে সদরে এসে দাঁড়িয়েছে বাসনা। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল মমলেন্দুকে 'তুমি এস, আমি যাচ্ছি।'

কেমন একটা ঘোরের মধ্যে সন্ধ্যেটা কেটে গেল। রাত হল। মমলেন্দু চলে গেছে। সুধাময় তাসের আড্ডা থেকে ফিরে এসেছে। াাওয়া-দাওয়া শেষ করল। বাসনা সারাটা সন্ধ্যে এবং রাত জোর করে নিজেকে রান্নাঘরেই আটকে রাখল। অমলেন্দু অনেকক্ষণ একা একা ।সেছিল। কদাচিৎ বাসনা ওপরে উঠেছে। আজকের দিনে এতটা ূরে দূরে থাকা অমলেন্দুর বোধহয় ভাল লাগে নি। প্রতিবারই সে ।লেছে, 'বসো না একটু, এত কি তোমার রান্নাঘরে কাজ?'

'বৈ কি, তোমার গা ঘেঁষে বসে এখন গল্প করি!' জোর করে বৈচিত্র এক হাসি ফুটিয়ে কটাক্ষ করেছে বাসনা। যেন নিছক এক-লজ্জায় সে সরে সরে পালিয়ে পালিয়ে থাকছে।

অমলেন্দুকে আজ যতই দেখছে বাসনা, ততই মনে হয়েছে, এই ি'ঘণ্টার মধ্যেই লোকটা যেন কত বদলে গেছে। এখন আর বাসনা ়যেন অন্য কেউ নয়, অন্য কোনো মেয়ে। অমলেন্দু তার নিজের সম্পর্কের চোখ দিয়েই দেখতে শুরু করে দিয়েছে বাসনাকে এবং সেই হিসাবে তার দাবি আর অধিকারটাও ক্রমশ ছড়িয়ে দিচ্ছে। জালের মতন। বাসনাও আস্তে আস্তে সেই জালের তলায় এসে পড়ছে, এসে পড়েছে।

যাবার সময় অমলেন্দু আড়ালে পেয়ে বাসনাকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছিল। ওর চোখে এবং ঠোঁটে তখন আর এক ভীষণ লোভ ছিল। হ্যাঁ, বাসনা গোড়াতেই তা বুঝতে পেরেছিল। নিজেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টাও করেছে বাসনা। পারে নি। লোকটা এমন শক্ত হাতে তাকে আঁকড়ে ছিল। অবশ্য অমলেন্দু যা চাইছিল তাও পায় নি। সব বুঝে, বুঝতে পেরে—মুখটা আর কিছুতেই তুলতে পারে নি বাসনা। ঘাড় মুখ যেন গুঁজেই ছিল কাঠ হয়ে। অমলেন্দু ভেবেছে, এও আর

এক লজ্জা কি সঙ্কোচ। বাসরঘর কি ফুলশয্যার দিন যে ধরনের লজ্জা কিছুক্ষণ মানায়, সুন্দর আর মিষ্টি মনে হয়।

কিন্তু এ লজ্জা বা সঙ্কোচে কোনোটাই নয়—বাসনা ভাবছিল কথাটা এখন মনে পড়ে যাওয়ায়। বরং বলা যায়, কেমন এক বিতৃষ্ণা, বিরক্তি, অসাড়ত্ব। বাস্তবিক বাসনা তখন সাড়া দিতে পারছিল না। বিশ্রী লাগছিল, অস্বস্তিতে গা মন ঘিনঘিন করছিল। মনে হচ্ছিল, লোকটা নিছক একটা সইয়ের দাবিতে যা-খুশি তাই জোর করে নিতে চাইছে।

শেষ পর্যন্ত অমলেন্দু যেন একটু ক্ষুব্ধ হয়েই ওকে ছেড়ে দিয়েছে। আর তখন, ঠিক তখনই—বাসনা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। কিন্তু বলতে হয়েছে, 'তু'দিন সবুর সইছে না আর।'

বেশ বড় মতন এক নিশ্বাস ফেলে অমলেন্দু জবাব দিল, 'তোমারই তো সবুব সইছিল না। এখন আর আমার দোষ কি!' কথাটা বলে হাসবার চেষ্টাই করেছিল অমলেন্দু, যদিও হাসতে পারে নি ঠিক।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে বাসনা একে একে নীচের বাতি নেবালো, সদরে তালা দিল। চাবিটা হাতে নিয়ে উঠে এল দোতলায়। সুধাময়ের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। হয়তো ঘুমোবার আগে বই-টই কিছু পড়ছে সুধাময়। বীথির ঘর বাইরে থেকে তালাবন্ধ।

একটু দাঁড়ালো বাসনা। বীথির ঘরের সামনে। তাকালো। মনে হল, বীথি যেন আড়াল থেকে দেখছে। সবই দেখছে।

অকারণেই ঠোঁট উলটে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল বাসনা। সরে গেল ঘরের সামনে থেকে—যেতে যেতে বলল, আমি তো আগেই বলেছিলাম, বীথি।

বারান্দার আলোটা নিবিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকল বাসনা। আলো জ্বালল। টাইমপিস ঘড়িটা দেখল। এগারোটা বাজে প্রায়।

একটুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল বাসনা, ছিটকিনি তুলে দিয়ে দাঁড়ালো। দবজায় পিঠ ঠেকিয়ে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, কিংবা কিছুই হয়তো দেখছিল না—আবছা, অস্পষ্ট দৃষ্টিতে দেওয়াল, বিছানা, টেবিলে চোখ রেখে রেখে কিছু ভাবছিল।

খানিকক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বাতি নিবিয়ে দিল বাসনা। আস্তে পায়ে এগিয়ে এসে আলনার কাছে দাঁড়ালো।

কাপড় বদলে বিছানায় এসে শুলো। জানলা দিয়ে এবার বেশ ঠাণ্ডা আসছে। গলাটা খুসখুস করছিল বাসনার। হাত বাড়িয়ে জানলাটা একটু ভেজিয়ে দিল।

না, চোখের পাতা বুজলেও ঘুম আসছিল না। ঘুম যে আসবে না এখন, বাসনা যেন তা জানত। না আসুক ঘুম, সারাদিন পরে এতক্ষণে নিজের চার দেওয়ালের মধ্যে একেবারে একা হতে পেরেছে যে, এতেই স্বস্তি পাচ্ছিল বাসনা এবং এই ঘন অন্ধকার তার ভাল লাগছিল। এখন এই অন্ধকার তাকে ঢেকে ফেলেছে। নিজেকে নিজেও দেখতে পাচ্ছে না বাসনা। আর ঠিক এ-সময়, এই অবসরে, কেউ যখন দেখছে না, দেখতে পাবে না—তখন মনটাকে যতটা পার, পারা সম্ভব—এলিয়ে ছড়িয়ে, পেঁজা তুলোর মত বিছিয়ে ভাবতে পারা যায়।

বাসনাও ভাবছিল। কী যে হয়ে গেল হুস্ করে। এখনো যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারা যাচ্ছে না। কিংবা বিশ্বাস করলেও মনে মনে ঠিক সয়ে নিতে পারা যাচ্ছে না। এমনি হয়েছিল মনের অবস্থা পরিমল যখন হঠাৎ দু'দিনের অদ্ভুত এক অসুখে চোখের পাতা বন্ধ করে নিল চিরকালের মতন। সহজ, সুস্থ মানুষ। জ্বর নিয়ে এল অফিস থেকে দুপুরে। চোখ জবা ফুলের মত টকটকে লাল। কাঁপতে কাঁপতে এসে বিছানায় শুলো। তার গা কাঁপছিল, ঠোঁট কাপছিল, হাত পা থরথর করছিল। সেই যে শুলো আর উঠল না—এমন কি উঠে বিছানায় পর্যন্ত বসে নি। হু-হু করে জ্বর বেড়ে চলল। ডাক্তার, ওষুধ, টেলিগ্রাম। কমলা ছুটে গেল। সবে তার বিয়ে হয়েছে তখন। সুধাময়ও এল।

পরিমল কত নিঃসাড়ে চলে গেল। বাসনা দেখল, শুনল, বুঝল—তবু বিশ্বাস করতে পারছিল না। ঘর, বিছানা শূন্য হয়ে গেল, বাসনা থান পরল—অবিশ্বাসের কোনো কারণ ছিল না, তবু যেন এই সত্য সওয়া যায় না। বাসনা সইতে পারছিল না। মনে হয়েছে তখন, পরিমল এখুনি পাশের ঘর থেকে ডাক দেবে, কিংবা হুট করে ঘরে এসে দাঁড়াবে।

ধীরে ধীরে সব সয়ে নিল বাসনা। পরিমল যে আর কখনোই আসবে না—একদিন তাও এত স্পষ্ট করে বুঝল, যার পর পরিমলকে শুধু একটা স্মৃতির মতন মনে হয়েছে, ফিকে কোনো গন্ধের মতন, এই আছে—তারপর নেই।

তারপর আর কি? পরিমলের ছবি দেওয়ালে টাঙিয়ে রোজ সকাল সন্ধ্যে প্রণাম করেছে বাসনা গলায় কাপড় জড়িয়ে। একটা অভ্যাসের মতন হয়ে গিয়েছিল এই প্রণাম। মনে মনে তখন যা বলত, যা বলেছে তা, বলতে কি, কোনো আশায়, কোনো দৃঢ় বিশ্বাসে, কোনো আকর্ষণে বলে নি। হ্যাঁ, যেমন দিন যেমন রাত্রি, যেমন সূর্য আর আকাশ, চাঁদ আর তারা—আর এই বাতাস জল—সব আছে সব তুমি দেখছ—সবই স্বাভাবিক, নিয়মিত, অভ্যস্থ—তেমনি পরিমল তার কাছে একটি অভ্যস্ত, নিয়মিত, স্বাভাবিক আত্মীয় হয়ে ছিল, যার স্বতন্ত্র কোনো আকর্ষণ, অনুরাগ, স্পর্শ কি অনুভূতি পাওয়া যেত না। বাস্তবিকই যেত না। বাসনা চাইত, এবং বলত, তুমি আমার সর্বস্ব হয়ে আছ—আমার দিনে রাত্রে, স্বপ্নে ঘুমে শরীরে মনে। কিন্তু সত্যিই কি পরিমল তাই ছিল, না থাকতে পারে?

তবে আর মৃত্যু কি? যদি জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে তফাত না থাকে! তুমি কি আমায় ডাকতে আমার নাম ধরে? তুমি কি কখনো চুপি পায়ে এসে আমার কানে ঠোঁট ছুঁইয়ে দিয়েছ? না, অফিস থেকে কোনো সন্ধ্যেতে ফিরে এসে ডাক দিয়ে বলেছ, তাড়াতাড়ি চা দাও তো, বড় খিদে পেয়ে গেছে আজ। যেমন সুধাময় বলে, সুধাময় আসে। সেই সুধাময়ের মতন বা আর কারো, অন্য কারুর মতন।

পরিমল, আমি এই ঘরে একলা—এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে কত বর্ষা, শরৎ, শীত কাটালাম। কত বসন্ত। কতদিন সারা রাত ধরে বৃষ্টি হয়ে গেছে, কত রাত সারাক্ষণ আকাশে চাঁদ জ্বলে জ্বলে ভোরের আলোয় মুছে গেল, আমি হাত বাড়িয়ে এই বিছানায় একটা খসখসে চাদরই শুধু ছুঁয়েছি। তুমি তো আস নি। কোথাও তুমি ছিলে না।

এই না-থাকাই মৃত্যু। কিন্তু আমি ছিলাম—আমি আছি। তুমি

কি জান না, এই থাকা, এই জীবন নিয়ে আমি বেঁচে রয়েছি। আর শুধু কি নিশ্বাস নেওয়ার মধ্যেই জীবন, না আরও অনেক, অনেক কিছু জড়িয়ে-মিশিয়ে একাকার হয়ে থাকাই জীবন।

তবু দেখ, আজো, এখনও অমলেন্দুকে বৈধ স্বামী হিসেবে স্বীকার করেও তোমার কথা ভাবছি, শুধু তোমার কথাই। সারা সকাল, বিকেল, সন্ধ্যে তোমাকে শুধু ভাবলাম। অমলেন্দুকে কি ভেবেছি ? না। ওর গা পর্যন্ত আমি ছুঁইনি ইচ্ছে করে। ওকে এড়িয়ে গিয়েছি, অবহেলাও করেছি। এখনও তোমার কথা ভাবছি, পরেও ভাবব। কিন্তু তুমি শুধু সেই ভাবনাতেই থাকবে, ফিকে গন্ধের মতন।

অমলেন্দু যাই হোক—তবু এখন তার এবং আমার স্বার্থ এক হয়ে গেছে।

এই ছেলে, কিংবা যদি মেয়ে হয়—তবে তার সে অর্ধেক, আমি অর্ধেক। আমরা সম্পূর্ণ হতে চাইছিলাম। আজ অন্তত সেদিক থেকে আমরা সম্পূর্ণ হয়েছি।

বাসনা বালিশে মুখ গুঁজে নিল হঠাৎ। মনে হল, পরিমল যেন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, বাসনা মুখ ফিরিয়ে নিল। আর মুখ গুঁজে নিশ্বাস রোধ করে ফাঁকা গলায় বলল, তুমি যাও, তুমি যাও।

॥ দশ ॥

শুক্রবার ভোরের ট্রেনেই কমলারা এসে পৌছল। সুধাময় গিয়েছিল স্টেশনে। কোন ভোরেই উঠেছে বাসনা। সারারাত ঘুম হয় নি, চোখে কালি পড়েছিল, মুখটাও শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। ভোরে উঠেই আয়নায় নিজের চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে বাসনা। আর দেখে ভয়ে আরও আড়ষ্ট, কাঁটা হয়ে গেছে।

সুধাময়কে চা করে খাইয়ে স্টেশনে পাঠিয়েই কলঘরে গিয়ে ঢুকেছিল বাসনা। এই কালিমা, সারা শরীর জুড়ে ভয় আর উদ্বিগ্নতার এই স্পষ্ট

লক্ষণ ওকে মুছে ফেলতেই হবে কমলারা বাড়ি ঢোকার আগে।

শীত করছিল। তবু সাবান ঘষে ঘষে মুখ থেকে যেন এ-ক'দিনের সমস্ত কালো তুলে ফেলতে চায় বাসনা—অন্তত একটি দিনের জন্য। কমলার কাছে কিছুতেই ধরা পড়তে দেবে না নিজেকে সামনা-সামনি। শীত করছিল, বুক ব্যথা করছিল, কোমর পেট যেন ঠাণ্ডায় হিম হয়ে যাচ্ছিল—তবু সারা গায়ে সাবান মেখে, মাথায় তেল দিয়ে স্নান করল বাসনা, অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ঘরে এসে কাপড় বদলালো। মুখে খানিক পাউডার ছিটালো। চোখের কোলে কোলে পাউডার দিয়ে কালো মুছল।

পাউডারের কৌটোটা বাক্সে লুকিয়ে ফেলল বাসনা। কমলারা যাবার পর বের করছিল। ওরা আসতে আবার লুকোল। আরও কিছু টুকিটাকি—যা কমলার চোখে পড়লে অন্য কিছু মনে হতে পারত।

কমলাদের পথ চেয়ে দুরুদুরু বুকে তৈরি থাকল বাসনা। ঠাণ্ডাটা লেগে গেছে সঙ্গে সঙ্গেই। বার কয়েক হাঁচল। চোখ করকর করছিল এবং খুসখুস করছিল গলা।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতেই বাসনার দু'টো পা হঠাৎ পাথর হয়ে গেল, হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে উঠে এসে ধকধক করতে লাগল। সারা গা কাঁপছিল এবং হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, জিব ঠোঁট শুকনো।

কোনো রকমে সদরে এসে দাঁড়ালো বাসনা।

কমলারা ততক্ষণে নেমে পড়েছে। সুধাময় মালপত্র নামাচ্ছে। বীথি এগিয়ে আসছিল, ডান হাতে ঝোলানো বেতের হালকা টুকরি। কমলার ছেলের হাত ধরেছে অন্য হাতে। কমলার কোলে মিণ্টু।

কাছে আসতেই হাত বাড়িয়ে কমলার কোল থেকে মিণ্টুকে টুপ করে নিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বাসনা। যেন কোনো রকম একটা সহায় জুটে গেছে—অন্তত এই ফাঁপা-ফাঁপা ভীরু বুকের স্পন্দনকে সে উপস্থিত সামলাতে পারবে।

'সাবধানে এনেছিস তো গাড়িতে মেয়েটাকে—!' বাসনা বলল বোনের প্রায় গা-ঘেঁষে এগুতে এগুতে।

মাথা হেলালো কমলা। ঢাকাঢুকি দিয়ে সাবধানেই এনেছে।
লছিল ও, 'কী শীত ছোড়দি, শুধুই তো শুরু কিন্তু এর মধ্যেই যেন
াঘের কনকনানি।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কমলাই বললে আবার, গরম জামা
াপড় দু'চারখানা নিয়ে গিয়েছিলাম কে জানত এত শীত পড়বে।
ালাই পালাই করছিলাম, কবে থেকেই। বীথির জন্যেই যা—নয়ত
লে আসতুম আমি। অমলঠাকুরপোর শেষ পর্যন্ত হল কি ছোড়দি,
গল না যে!'

'কী জানি!' বাসনা ঘাড় হেঁট করে ছোট্ট জবাব দিল, মিণ্টুর
খে মুখ ঠেকিয়ে আড়াল করতে চাইছিল নিজের ফ্যাকাশে চেহারা।

কথাটা পালটাতেই যেন হঠাৎ বীথির দিকে আরচোখে চেয়ে বলল
াসনা, 'কই তোর শরীর তো তেমন সারে নি বীথি।'

'সারে নি মানে। আমি তিন দিন অন্তর মাল-গুদামে গিয়ে ওজন
নতাম যে, ছোড়দি—' বীথি বেতের টুকরিটা নাচের ভঙ্গিতে হাত
বঁকিয়ে কোমর-পিঠের মাঝ পর্যন্ত তুলতে তুলতে হাসল, 'ছ'সের ওজন
বড়েছে আমার, তা জান!' বেণী দুলিয়ে খিলখিল করে হাসল বীথি।

কমলার ঘরে ঢুকে কেমন এক খাপছাড়াভাবে কেউ বসল, কেউ
াড়িয়ে থাকল, বীথি টুকরিটা নামিয়ে রেখে বিছানার ওপর এলিয়ে
াকটু গড়াগড়ি দিয়ে নিল।

কমলার ছেলে মাসির হাঁটু জড়িয়ে ধরেছে। টুকটুক করে পাঁচ-
াশালি কথা বলছিল। মিণ্টুকে বিছানায় নামিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে
কালে তুলে নিল বাসনা।

তোমার শরীর কেমন, ছোড়দি?' কমলা শুধলো এতক্ষণে বোনের
িকে চেয়ে।

'ভালই!' জানলার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে জবাব দিল বাসনা।
ুকটা কাঁপছিল আবার।

একটু চুপচাপ। বাসনাই বলল, 'তোরা একটু জিরো, আমি চা
ুরে আনি।' এগিয়ে যাচ্ছিল কমলা, দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো,

ভাবল কী-একটা বলবে। কিন্তু বলল না, একটু দাঁড়িয়ে, একবার পিছু তাকিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সকাল দুপুর কাটল। বাসনা যা ভেবেছিল তা নয়। বাসনাকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখার অবসর নেই ওদের এখন। কমলার নিজের কথা, বেড়ানোর গল্প, বীথির নানান কীর্তি-কাহিনী এত বেশি জমা হয়েছিল যে, সকাল দুপুর ওরা দু'জনে বকবক করেও শেষ করতে পারছিল না। আর এত হাসিই বা কি করে জমেছিল, জমে থাকে—ভাবছিল বাসনা—ননদ-ভাজে হাসছে তো হাসছেই, গল্পেরও শেষ নেই, হাসিরও।

এ-সব গল্প কি হাসির মধ্যে গা ঢেলে মন ডুবিয়ে বসে থাকার অবস্থা বাসনার নয়। তার অন্য ভাবনা আছে। কিন্তু কমলা-বীথির গল্প-হাসির কাছ থেকে ও সরে যেতে পারে না। বরং এই যে ওরা দু'টিতে নিজেদের কথা নিয়েই মশগুল রয়েছে, এতেই বাসনার লাভ।

দুপুরে খাওয়ার পর থেকেই বাসনার শরীরটা খারাপ লাগছিল। এমনিতেই তো ঠাণ্ডা লেগে গেছে ভোরে স্নান করতে গিয়ে। সর্দি চেপে বসছিল। গলা ব্যথা করছে। চোখ জ্বলছে। একটু যেন জ্বর জ্বর। খাওয়া-দাওয়ার পর তলপেটটাও হঠাৎ কেমন যেন মুচড়ে কনক করে গেল। বমি-বমি লাগছিল। কোনো রকমে তা সামলে নিল বাসনা।

শীতের দুপুর। দেখতে দেখতে দু'টো বেজে গেল। কমলাদের ঘুম পাচ্ছিল, সারা রাত ট্রেনের ধকল গেছে। বীথি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কমলারও চোখের পাতা বুজে আসছিল। বাসনা উঠে গেল এই ফাঁকে।

নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল বাসনা। শরীরটা সত্যি বড় খারাপ লাগছে।

কেমন একটা বিশ্রী রাগ হচ্ছিল বাসনার নিজের ওপরেই। আজকের দিনেই কিনা যত গণ্ডগোল, বাধা-বিঘ্ন। কি ক্ষতি হয় আর একটা দিন সবুর করে শরীরটা যদি একেবারে বিছানাতেই এলিয়ে পড়ত। কি যেত-আসত তবে!

একটায় হল না, পর পর ছ'টো বালিশ তাল পাকিয়ে পেটের মধ্যে আঁকড়ে চেপে ধরে চোখ বুজে পড়ে থাকল বাসনা বিছানায়। একবার ভাবল, এ-সব কিছু নয়, এই শরীর খারাপ। আসলে হয়তো ওটা ভয় আর দুশ্চিন্তার জন্যেই হচ্ছে। হ্যাঁ, তা হওয়া স্বাভাবিক।

চোখ বন্ধ করে কেমন এক ঘোরের মধ্যেই ভাবছিল বাসনা, কাল এতক্ষণ কোথায় ও?

কোথায় যে, বাসনা তা জানে না। তবে এই কলকাতারই আর এক পাড়ায়। নিরিবিলি ফাঁকা ঘরে। হয়তো সে-ঘরেও এমনি হলুদ রঙ রোদ এসে গেছে এতক্ষণে, বাইরে ক'টি কাক চড়ুই উড়ছে, বসছে, ছপুর থমথম সময়, রাস্তা দিয়ে রিকশা চলেছে ঠুং-ঠুং। আর ঘরে— সেই নতুন ঘরে বাসনা একা একেবারেই একা। অমলেন্দু কি থাকবে এমন ছপুরে! থাকতেও পারে।

কেমন যে লাগবে সেই বাড়ি কে জানে! নতুন চুনের গন্ধ শুঁকেই হয়তো বাসনাকে সারা ছপুর কাটাতে হবে এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, কমলাদের কথা ভেবে ভেবে, ফাঁকা বুক বালিশে চেপে! চোখের জলে গাল ভিজিয়ে।

কমলারা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না—কি হবে আজ, আর খানিকক্ষণ আর কয়েক ঘণ্টা পরে। বাসনা ভাবছিল। আজই এ-বাড়ি আমি ছেড়ে যাচ্ছি, কমলা: বাসনা মনে মনে আকুল হয়ে বলতে চেষ্টা করছিল, আমি চললাম, কমলা। আজ। আজই। অমলেন্দুর সঙ্গে। তোর ঘর-দোর এতকাল আগলে ছিলাম। এবার ভাই, তোর হাতে তুলে দিয়ে চললাম।

ছলছল করছিল বাসনার চোখ। বুকটা যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। কী অসহ্য শূন্যতা! যেন সামনে এক ছরন্ত অন্ধকার ছড়িয়ে রয়েছে, আর বাসনা সেই অন্ধকারে অসহায়ের মত একা—একাই নেমে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিকেলে শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছিল বাসনার। ইচ্ছে হচ্ছিল বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকে। চুপ করে। পেটের মধ্যে একটা অসহ্য

যন্ত্রণা, যেন করাত দিয়ে চিরছে কেউ। মাঝে মাঝে ব্যথাটা উঠছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। সারা গা গুলিয়ে বমি উঠতে চাইছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে কলঘরে গিয়ে একবার বমিও করে এসেছে বাসনা। মাথাটা ভার, ঝিমঝিম করছে। চোখ যেন আর চাইতে পারছিল না। ওপর-পা দু'টো ভারে ব্যথায় টনটন করছে। দাঁড়াতেও পারছে না বাসনা।

তবু দাঁত চেপে সব—সমস্ত সহ্য করে বাসনা বিকেলের চা জলখাবার তৈরি করতে বসল। বীথি কাছে এসে বসল। একবার কী যে নিজের মনে বললে খানিক—বাসনা শুনতেই পেল না। কোনো কথা তার কানে যাচ্ছিল না।

অমলেন্দু এবার আসবে! বিকেল পড়ে এল··! ক'টা বেজেছে? বাসনা থেকে থেকে খালি ভাবছে। অমলেন্দুর আসার সময় হয়ে এল। এবং তাদের যাওয়ার।

প্রথম শীতের বিকেল পড়ে এল। আলো মুছল কখন। উঠোন ভরে ছায়া। ছায়া ঘন হচ্ছিল। সুধাময় ফিরল অফিস থেকে। কমলাদের কাপড় কাচা শেষ হয়ে কলঘর ফাঁকা হয়ে গেল। বাতি জ্বলল। রান্নাঘরের উনুনে আঁচ গনগনে হয়ে ওঠে। টিকটিকিটা নেমে এসেছে দেওয়াল গড়িয়ে নীচে।

বাসনা হাঁটুতে মুখ নামিয়ে তরকারি কুটে চলেছে। আর যেন ও চোখ তুলবে না, তুলতে পারবে না।

বুকটা হঠাৎ কেঁপে গেল। ধকধক করে উঠল। অমলেন্দু এসে গেছে।

বাসনা মুখ তুলল। টিকটিকিটা আলপিনের মতন চোখ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

আর পারছে না, সত্যিই পারছে না—বাসনা—ভীষণ এক যন্ত্রণা পেটের ক'টা নাড়িতে জট পাকিয়ে গেছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। বুকের হাড়ের খাঁজে খাঁজে পর্যন্ত সেই ব্যথা খুঁচিয়ে উঠেছে।

আস্তে আস্তে, কোনো রকমে দেওয়াল আর রেলিং ধরে ধরে বাসনা

দোতলায় উঠে এল। কমলাদের ঘরে জটলা বসেছে। অমলেন্দুও সেখানে। খুব হাসছে। বিন্দুবিসর্গও ধরাছোঁয়ার উপায় নেই। কে বুঝবে, বুঝতে পারবে—লোকটা কেন এসেছে এ-বাড়িতে আজ।

বাসনার মনে হল এবার কমলাকে ডেকে বলে, আমার মাথাটা বড় ধরেছে রে, সর্দিতে। একটু ঘরে গিয়ে শুলাম।

কিন্তু না, কমলাকে ডাকল না বাসনা। কাউকেই নয়। আস্তে আস্তে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। বাতিও জ্বালল না।

তারপর এক ফাঁকে কমলাই এল খোঁজ নিতে।

'সন্ধ্যেবেলায় ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রয়েছ?' টুক করে বাতি জ্বালিয়ে দিল কমলা। তাকালো।

বাসনা তাকাতে পারছিল না। ভাঙা অস্পষ্ট গলায় বললে, 'ভীষণ মাথা ধরেছে। বাতিটা নিবিয়ে দে।'

বাসনার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন একটু সন্দেহ হল কমলার। কাছে এসে কপালে হাত দিল।

'একটু গরম-গরম লাগছে। জ্বর-জ্বালা হবে নাকি!'

'না কিছু না। সর্দির ম্যাজমেজে ভাব।'

'সাত-সকালে বাসি জলে কি যে দরকার ছিল তোমাব চান করার।' কমলা যেতে যেতে বলছিল, শুয়ে থাক, উঠতে হবে না আর। আমরা রান্নাঘরে যাচ্ছি।' বাতি নিবিয়ে কমলা চলে গেল।

সারাটা বিছানায় লুটোপুটি খাচ্ছিল বাসনা। ব্যথাটা ক্রমশই ছড়িয়ে পড়েছে। কেমন এক আচ্ছন্নতা নামছিল।

টুক করে বাতি জ্বলে উঠল আবার। বালিশ থেকে মুখ তুলে কোনো রকমে চাইল বাসনা। অমলেন্দু।

'কি হল?' অমলেন্দু একটু কাছে এসে খুব আস্তে গলায় বলল।

'শরীরটা কেমন করছে।' আরও আস্তে গলায় বাসনা জবাব দিল।

'ও কিছু না, নার্ভাসনেস!' অমলেন্দু আরও একটু সরে এল।

'ওরা কোথায়?'

'নীচে।'

'বীথি ?'

'বীথিও নীচে গেছে !'

'সুধাময়—?'

'তাসের আড্ডায় চলে গেছে, অনেকক্ষণ।'

একটু চুপচাপ।

'আমি তৈরি হয়েই এসেছি !' অমলেন্দু বলল চাপা গলায়।

খানিকটা সময় নিয়ে জবাব দিল বাসনা, 'আজ থাক। কাল।'

'কাল ?' অমলেন্দু একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল অবাক চোখে।

'শরীরটা আজ বড্ড কেমন করছে। কি করে যাব ?'

'কতক্ষণ আর ?' অমলেন্দু জোর করবার চেষ্টা করছিল, 'আমি না হয় কমলাবউদিকে কিছু একটা বলছি। কোনো অজুহাতে একবার বাড়ির বাইরে বেরুনো।'

'না না। আজ থাক।' কথা বলতেও যেন কষ্ট হচ্ছিল বাসনার।

অমলেন্দু আরও একবার চেষ্টা করল। বাসনা তবু মাথা নাড়ছিল। না, না, আজ নয়। আজ নয়।

'তবে থাক !' অগত্যা মনমরা হয়ে বলল অমলেন্দু, কিন্তু কি হল তোমার হঠাৎ ?'

'কি জানি !' বাসনা বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ল আবার।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অমলেন্দু বিছানার কাছে এসে খুব কোমল গলায় বলল, 'কিছু না। মনটা হয়তো খারাপ লাগছে খুব। ভয় করছে তোমার। চুপচাপ শুয়ে থাক। সেরে যাবে। কাল আসব আর ফিরিয়ে দিয়ো না।' আলগা হাতে একটিবার বাসনার মাথায় হাত রেখে অমলেন্দু চলে গেল। বাতি নিবিয়ে দিয়েই।

আবার অন্ধকার।

বাসনা কিছুই আর ভাবতে পারছিল না। কেমন যেন অসাড় হয়ে আসছে পা হাত। মাঝে মাঝে একটা বরফ-ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছে সারা গা দিয়ে। যন্ত্রণাটা সাপের মত পেঁচিয়ে উঠছে আর নামছে।

দাঁতে দাঁত চেপে, ঠোঁট কামড়ে, চোখ বুজে, হাত মুঠো করে

কুঁকড়ে গা গুটিয়ে এই অসহ্য যন্ত্রণাকে সহ্য করবার চেষ্টা করছিল বাসনা। আর কেমন এক জ্বরের ঘোর ঘোর নেমে আসছিল আস্তে আস্তে।

তখন বুঝি বেশ রাত। কমলা এল খেতে ডাকতে। আলো জ্বালিয়ে প্রথমটায় অত বুঝতে পারে নি কমলা। একবার নয় বার তিনেক ডাকল, ছোড়দি!

বাসনা একটুও নড়ল না। সারা বিছানার মধ্যে বালিশ চাদর লুটো-পুটি করে হাত মুখ পেট দুমড়ে গুঁজে অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে শুয়ে রয়েছে। ঘুমিয়েই পড়েছে বোধহয়।

বিছানার কাছে এগিয়ে এল কমলা। পা দু'টো মাটির সঙ্গে জুড়ে গেল হঠাৎ। ভীষণভাবে চমকে উঠেছে কমলা। ভয়ে বিস্ময়ে তার গলা ফুটছিল না।

বাসনা কি বেঁচে আছে? মনে হচ্ছে না। বিছানার একটা পাশে স্পন্দনহীন অসাড় কঠিন মত দেহটা পড়ে আছে। বিষ-খাওয়া একটা মানুষ না এমনিভাবে পড়ে থাকে। চোখ বন্ধ ঠোঁট জোড়া। দাঁতে দাঁত লাগা। শক্ত মুঠোয় খানিকটা চাদর খিমছে ধরেছে।

কমলা ভয়ে ভীষণভাবে চিৎকার করে উঠল। বীথি ও-ঘর থেকে ছুটে এল। অদ্ভুত কলরব। ভীত বিহ্বলতা। সুধাময়ও এসে দাঁড়ালো।

তারপর ছুটোছুটি, কান্নাকাটি, হুড়োহুড়ি! কমলা কাঁদছিল। বীথি পাথর হয়ে গেছে। বাসনার ঘর কনকন করছিল, এত ঠাণ্ডা। বাতিটা হঠাৎ হলুদ-চোখ বিকার রুগীর মত দেখল তাকিয়ে।

সুধাময়ের সঙ্গে ডাক্তার এলেন। পাড়ার ডাক্তার।

না, বিষ খায় নি বাসনা। ফেণ্ট হয়ে গেছে। অসহ্য যন্ত্রনায়! হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন এখুনি। কিছু বুঝতে পারছি না। আলসার ছিল নাকি পেটে? জানেন না। আমি একটা ইনজেকশন করে দিচ্ছি আপাতত। কিন্তু এখুনি হাসপাতালে রিমুভ করুন।

হাসপাতাল। বাসনা এখনও অজ্ঞান।

সুধাময় নাম ঠিকানা লেখাচ্ছিল ডাক্তারের মুখোমুখি বসে। বাসনা সেন। বয়স আঠাশ। ঠিকানা।···

বাসনা সেনের নামটা খসখস করে লিখে চলেছিল এক ছোকরা ডাক্তার।

।। এগার ।।

ঘন কুয়াশার মতই অনেকটা। এক আশ্চর্য গভীর আচ্ছন্নতায় চেতনা কোথায় যেন তলিয়ে ছিল এতক্ষণ, অনুভূতির সেই বিচিত্র পথ। এবার অল্পে অল্পে সেই কুয়াশা বুঝি ছিঁড়ছিল, সরে যাচ্ছিল। তবু স্পষ্ট নয় তখনো। ঘুম-ভাঙার-আগের কেমন এক স্নায়ু-আবিলতা এবং অস্পষ্ট অদ্ভুত কিছু রেখাচিত্র। যেন ঢেউয়ের মাথায় মাথায় পলকের মত উঠছে আবার হুস করে তলিয়ে যাচ্ছে।

অস্ফুট চেতনায় বাসনা দেখছিল : ঠুং-ঠুং রিক্শ চলে গেল, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ধুপধাপ কারা নামছে যেন, একটা বেতের টুকরি ফুলের মতন ফুটে রয়েছে, এগিয়ে আসছে অমলেন্দু। আ, কী সুন্দর একটা ছড়ি তার হাতে! বাসনার গায়ে পানের পিচ ফেলে সরে গেল কমলা। বাক্স হাতড়াচ্ছে বাসনা ঘরময় জিনিসপত্র ছড়ানো। কী খুঁজছে বাসনা। হঠাৎ খুব শীত-শীত লাগছিল। কে যে আলগা হাতে গরম শাল জড়িয়ে দিচ্ছে গায়···

আচমকা যেন আলো জ্বালিয়ে দিল কেউ এই অন্ধকারে। চোখ খুলল বাসনা। সাদা দেওয়াল। বড় বেশি সাদা। একটুক্ষণ কেমন এক পঙ্গু আবিল অনুভূতি নিয়ে সেই দেওয়ালের দিকে চেয়ে থাকল। চোখের পাতা বন্ধ করল আবার খুলল।

ভীষণভাবে চমকে গেছে এবার বাসনা। প্রথমটায় বিহ্বল। কিছুই বুঝতে পারছিল না। এ কোথায় শুয়ে রয়েছে সে? তার ঘর কই, তার খাট, সেই জানলা, আলনা, টেবিল! কমলা, বীথি, সুধাময়—

কোথায় তারা! কারুর গলার সাড়া তো পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কি এখনো ভোর হয় নি। এ কি স্বপ্নে দেখা ভোর!

কিন্তু না, ভোরই। সকালের আলোয় ঘর ফরসা। রোদের রঙ ধরছে দেওয়ালে।

এই তবে তার নতুন ঘর, নতুন সংসার। অমলেন্দু সাজিয়েছে। কোথায় গেল অমলেন্দু! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবার বাসনা ঘাড় ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে এই ঘর দেখছিল।

দেখতে গিয়ে সমস্ত শরীরে কাঁপুনি দিয়ে আসছিল, কি হয়ে গেল হাত-পা। বুকের মধ্যের সেই ধুকধুক যেন ঠেলে গলা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। নিজের কানেই বাসনা সেই অতি দ্রুত স্পন্দন শুনতে পাচ্ছে।

এবার খুব অস্পষ্টভাবে সারা রাতের একটি দু'টি অর্ধ-সম্বিত মুহূর্ত মনে পড়ল।

মনে মনে সেই সব দুঃস্বপ্নের মুহূর্তকে ভাল করে মনে করবার চেষ্টা করছিল বাসনা। আর দেখছিল শূন্য চোখে—সামনে দেওয়াল, উঁচু ছাদ। পাশে কাঠের পার্টিশান। গা তুলতে পারছিল না। মাথার দিক থেকে আলো এসে পড়েছে ভোরের। কেমন এক অস্ফুট গুঞ্জন, পায়ের শব্দ, অ্যাসিড অ্যালকালির বিচিত্র গন্ধ ঝাঁঝালো, কটু।

আস্তে আস্তে হাত নামিয়ে বাসনা পেটের তলায় তার কনকনে প্রায়-অসাড় আঙুল দিয়ে কী যেন অনুভব করবার চেষ্টা করছিল।

তারপর হঠাৎ একেবারেই আচমকা সমস্ত বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠা এক গুমরনো কান্নায় কেঁদে উঠল অদ্ভুত এক শব্দ তুলে।

একটা সকাল আর দুপুর যে কী করে কাটল বাসনা যেন ভাল করে বুঝতেই পারল না। কারা এল! কোথায় তুলে নিয়ে গেল। সে কেমন এক ঘর। কিসের যেন গন্ধভরা। বিছানা তো নয়, অদ্ভুত এক লম্বা টেবিল। কারা যেন ছিল—দু'টি কি তিনটি মানুষ। সিস্টার, ডাক্তার।

তারপর? ছি, ছি—বাসনা যেন ভাবতেও পারে না আর। গা

কাঠ, চোখ বন্ধ করে পড়েছিল। জবাব দিতে হয়েছে কথায়। কালকের সেই বেহুঁশ অবস্থার কথা এখন কি আর সব মনে আছে! তবু বলতে হল তার যন্ত্রণার কথা—সেই অসহ্য যন্ত্রণা যখন করাতের মতন চিরে দিচ্ছিল ভেতর-পেটের তলায়, মনে হচ্ছিল একটা যদি ছুরি পায় নিজের হাতেই ছুরিটা বসিয়ে দেয় বাসনা কী আক্রোশে তখন সেই ব্যথার ওপর। ব্যথাটাই যেন স্বতন্ত্র কোনো মানুষ। তাকেই ছুরি দিয়ে চিরে দেওয়া চলে!

হ্যাঁ, আমি তখন উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। কমলাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম। পারি নি। সামনে চেয়ার ছিল। চেয়ারের মাথার কোণায় বুঝি লাগল। তলপেটের তলায়, একেবারে মুখটাতেই। টাল সামলে ফেলেছিলাম। কিন্তু মনে হল কেউ যেন বঁটির কোপ দিয়েছে। বিছানায় লুটিয়ে পড়েছি কোনো রকমে।

বলতে পারছিল না বাসনা। থেমে থেমে, অস্পষ্ট ফিসফিস গলায় কোনো রকমে বলেছে। প্রায় এ-ধরনের সব কথা।

এ ব্যথা কতদিনের?

মাস চার-পাঁচের।

তার আগে?

না!

আরও সাত-সতেরো প্রশ্ন। নানা পরীক্ষা। বাসনার শরীরটা যেন তার নিজের নয়, অন্তত তখনকার মতন। বাসনার মনে হচ্ছিল এর চেয়ে যদি বিষ খেত? এত বড় লজ্জার কথা অন্তত কানে শুনতে হত না। যদিও সে-কথা বলল না কেউ। বাসনা অন্তত শুনল না।

তবে কি সে মরেই গেল পেটের মধ্যে? বাসনার মুখ ফুটে কথাটা বেরিয়ে গিয়েছিল আর একটু হলে। অনেক কষ্টে ঠোঁটের আগায় কথাটা আটকে ফেলেছে বাসনা।

আবার সেই কাঠের পার্টিশান ঘেরা এক চিলতে খোপের মধ্যে। দুপুরে বাসনাকে তুলে নিয়ে আসা হল—এক বিছানা থেকে অন্য বিছানায়। এবার আর কাঠের আড়ল-তোলা এক চিলতে খোপ নয়।

সত্যিই ছোট্ট এক কামরা। অনেক ঝকঝকে-তকতকে। কেবিন। বাসনা একটু স্বস্তি পেল।

ভাবতে পারছিল না বাসনা—এরপর কি হবে? কি কি হতে পারে? আগাগোড়া এক হেঁয়ালির মধ্যে যেন পড়ে রয়েছে। কি হয়েছে তার? পরে কি হবে? ডাক্তার কি বললে। কাকে বললে! একটু একটু শুনেছিল বাসনা, সুধাময় সকালেও এসেছিল হাসপাতালে। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলেছে, কেবিনের ব্যবস্থা করে চলে গেছে।

ভাবছিল বাসনা, হয়তো এতক্ষণে সব জানাজানি হয়ে গেছে! সুধাময়কে কি আর ডাক্তার না বলেছে? কমলাও জানতে পেরেছে।

সুধাময় আর কমলার মুখ যেন দেখতেই পাচ্ছিল বাসনা। কালো, কঠিন হয়ে গেছে। ঘেন্নায় কুঁচকে উঠেছে সারা মুখ। ওরা ভাবছে এই সেই বাসনা, তাদের ছোড়দি, যার ওপর, যার স্বভাব চরিত্রের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস অটুট ছিল। হ্যাঁ, সেই ছোড়দিও শেষ পর্যন্ত এমন কেলেঙ্কারী করলে, যার পর আর যাই হোক কমলা হয়তো এই বোনকে আর বোন বলে স্বীকার করতেই চাইবে না।

ওরা বুঝতেও পারছে—এ-সবের সঙ্গে আর কে জড়িয়ে রয়েছে। অমলেন্দু। এত ঘোরাঘুরি, বেড়ানো! কমলাদের অবর্তমানে কলকাতার বাড়িতে দু'টিতে রোজ দেখা-সাক্ষাৎ, গল্প-গুজব। তারপর আর কি? যা ভাবা যায় নি, তাই। দুই সমান। কাল-সাপ।

অমলেন্দু এখন কোথায়? সে কি এখনো কিছু জানতে পারে নি? শোনে নি কিছু! না-শোনাই সম্ভব। আজও সে আসবে বিকালবেলায় বাড়িতে এবং সুধাময় হয়তো বলবে···

কি বলবে?

না, কালই অমলেন্দুর সঙ্গে চলে যাওয়া উচিত ছিল। অন্তত তাহলে কলঙ্কের একটা আড়াল থাকত।

হ্যাঁ, বাসনা এখানে এটুকুও শুনেছে—বিছানা বদলাবার সময়, এই হাসপাতালে তার নাম বাসনা সেন···বাসনা মিত্র নয়। কে বলবে, কাকে

বলবে, কেমন করে বাসনা সেন বাসনা মিত্র হয়েছিল, হয়ে রয়েছে।

হয়তো আর বদলানো যায় না।

আস্তে আস্তে একটু পাশ ফিরে শুলো বাসনা। চোখ ছাপিয়ে জল এসেছে। বুকটা কী ভীষণ ভার।

আমি কি মরতে পারি না! এখুনি। হঠাৎ!

বিকেলের রোদ যাই-যাই বেলায় ঘণ্টা পড়ছিল। হাসপাতালের ঘণ্টা। বাসনা চমকে উঠেছিল শব্দটা কানে যেতে। বুক কাঁপছিল আবার, হাত পা অসাড়।

শেষ পর্যন্ত চোখ মুছে পাশ ফিরল বাসনা। শুকনো মুখে বসে কমলা মাথার কাছে। কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছিল। বীথি পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। টুলের ওপর বসে রয়েছে সুধাময়।

চুপচাপ। সময় খানিকটা কাটল।

'আজ কি খেয়েছ ছোড়দি, সারাদিনে?' কমলা কথা পাড়ল।

'দুধ।' বাসনা ছোট্ট করে জবাব দিল।

'আজ বোধহয় আর কিছু দেবে না।' সুধাময় বলছিল, 'ভয় পাবার কিছু নেই, আপনি ঘাবড়াবেন না ছোড়দি। ডাক্তার ব্যানার্জি তো খুবই বড় ডাক্তার। তিনিই দেখছেন। তাঁর পেশেণ্ট আপনি।'

কেমন যেন লাগছিল এইসব কথাবার্তা। কমলাদের হাবভাবে। বাসনা বুঝতে পারছিল না। যা ভেবেছিল ও তার সঙ্গে এর কোথাও মিল নেই। বাড়িসুদ্ধ সবাই দেখতে এসেছে হাসপাতালে। তাদের কথায় চোখে মুখে কোথাও একটু ঘেন্না কি বিরক্তি কি বিদ্রূপ কিছুই যে নেই। এমন কি বীথিও নরম চোখে কেমনভাবে তাকিয়ে রয়েছে!

তবে?

ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিল বাসনা। কি হয়েছে আমার? কি হয়েছে? প্রশ্নটা গলা থেকে ঠোঁট পর্যন্ত উঠে এসেও স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। কিছুতেই প্রশ্ন করতে পারছে না।

'তুমি না কোন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করবে বলছিলে?'

'হ্যাঁ, যাই।' সুধাময় টুল ছেড়ে উঠল।

'রাত্তিরে কেউ থাকবে কি না—' কমলা বলছিল।

'তুমি পারবে কি? ছেলেটাকে না হয় সামলালাম। কিন্তু মেয়েটা—!'

'সেই তো ভাবনা। কিন্তু যদি দরকার হয়—!'

'দেখি কথা বলি। তেমন হলে নার্সের ব্যবস্থা করতে হয়।' সুধাময় চলে গেল।

একটু চুপ।

'এখনও কি ব্যথা আছে, ছোড়দি?' বীথি শুধালো।

'হ্যাঁ, খানিকটা কম।' বাসনা কেমন অবশ গলায় বলল।

'যা গেছে আমাদের কালকে। সারা রাত ঠায় জেগে কেটেছে।' কমলা বলছিল, 'বড্ড অবহেলা করা হয়েছে, ছোড়দি। তোমার শরীর। আমরা পারি, না পারি, তোমার তো কিছু অন্তত বোঝা উচিত ছিল। তখনই যদি তেমন বলতে কিছু, একজন বড় ডাক্তার দেখানো যেত।' একটু থেমে নিশ্বাস ফেলে আবার বলল, 'কষ্টভোগ আছে কপালে, কি-ই বা করবে তুমি।'

বুক তুরুতুরু করছিল বাসনার। অনেক কষ্টে সাহস করে বলল, 'ওরা কি বলেছে? কি অসুখ আমার?'

কমলা ভাবছিল। কি যেন নাম বলল সুধাময়।

'টিউমার।' বীথি বলল।

বাসনা চমকে উঠল। বিস্ময়টা যেন সাপের ফণা হয়ে চোখের সামনে ছোবল তুলে দাঁড়িয়েছে।

'টিউমার তো বটেই, কিন্তু কি যেন নাম তার—। কটমটে কী একটা নামও যে বললে বাপু।' কমলা কিছুতেই মনে করতে পারছিল না এবং বীথিও বলছিল না, যদিও নামটা ওর মনে এসেও আসছে না। সীস্ট্—কী সীস্ট্ যেন ওভা—ওভারিয়ান সীস্টই বোধহয়। যেন এই নাম শুনলে বাসনা ভয়ানক ভয় পেয়ে যাবে।

চোখের পাতা আস্তে আস্তে মুছে ফেলল বাসনা। মুখটা পাশ করে

বালিশে গুঁজে নিল। সব যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। মাথার মধ্যে অদ্ভুত এক নাগরদোলার ঘুরন। উঠছে নামছে। দুলে-দুলে, টলে-টলে। বাসনার বোধ নেই। সব বুঝি এক জলের ঘুর্ণির মুখে পড়ে তলিয়ে যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ আর কিছু ভাবতেই পারল না বাসনা। চোখের সামনে অন্ধকারের ঘন বেড়া উঠেছিল। তারপর ধীরে ধীরে সেই অসাড়ং কেটে গেল। চোখের পাতা মেলল বাসনা। মেলতেই বীথির কালো রোগা-রোগা মুখটা চোখে পড়ল।

অন্যমনস্ক চোখে সেই মুখটাই দেখছিল বাসনা।

হঠাৎ কমলা কথা বলল। 'তোমাকে বেশ ভোগাবে ছোড়দি।' কমলা খানিক ঝুঁকে পড়ে বলছিল, 'তুমি বাপু ভয়-টয় পেয়ো না যেন, হয়তো কাটাকুটি করতে হবে।' সাহস যোগাবার চেষ্টা করল কমলা। বউদির এই হুট্‌গাট কথা একেবারেই ভাল লাগছিল না বীথিব। ইশারায় কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছিল। কমলার চোখে চোখে তাকিয়ে, একটুক্ষণ কি যেন দেখল বাসনা। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। ভয় হচ্ছিল বাসানার হয়তো কাটাকুটিব কথা শুনে এবং সেই ভয়ে মুখটা আবও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল।

কমলা আরও কি বলতে যাচ্ছে, ও এল। নার্স। জুতোর খুটখুট শব্দ তুলে। গোলগাল আধ-ফবসা একটি মেয়ে। গম্ভীব মুখ। সটান মাথার কাছে এসে থামল। ওষুধ খাওয়ালো। তারপর বলল, কমলাদের দিকে চেয়ে 'আপনাদের বাইরে যেতে হবে। একটু পরে আবার আসবেন।'

বাইরে যেতে হবে। কেন? কমলা চোখে প্রশ্ন তুলছিল। তার আগেই বীথি আস্তে আস্তে কেবিন ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। ক্ষুব্ধ মনে কমলাকেও উঠতে হল।

ওরা বেরিয়ে গেলে কেবিনের দরজাটা বন্ধ করে দিল নার্স।

সুধাময়বা চলে গেল। সন্ধ্যের অন্ধকার তখন ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে

পড়েছে। কেবিনের মধ্যে যেন অনেক রাতের নিস্তব্ধতা। মিটমিটে আলো। গন্ধ আর ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। ফাঁকা-ফাঁকা ছমছম।

চুপ করে শুয়েছিল বাসনা চোখ বন্ধ করে। ভাবছিল, ভাল করে গুছিয়ে এবার ভাববার চেষ্টা করছিল, সব তালগোল পাকিয়ে ওলট-পালট হয়ে গেল কি করে! বাসনা এক ভেবেছিল, হল আর-এক। এত বড় ভুল কি করে করল বাসনা! আশ্চর্য!

এই ভুল আমায় কোথায় টেনে এনেছে জানিস, কমলা? বাসনা মনে মনে বলছিল যেন, অনুশোচনা আর গ্লানি জমছিল; তুই ভাবতেও পারবি না কী সব করেছি আমি, কোথায় এসে পড়েছি। মিথ্যেই আমি রাত জাগলাম, ভাবলাম আর ভাবলাম, অমলেন্দুকে ভুলোলাম, তার কাছে আর-এক বীথির মতনই হ্যাংলামি করলাম। আর হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত বিয়ে, আবার বিয়ে। আমি অমলেন্দুর বউ, একথা ভাবতেই এখন আমার গা কেমন করছে। তোরা জানিস না এসব কথা। জানতেও পারবি না যদি আমি এই অসুখে মরে যাই, অমলেন্দু না বলে···

অমলেন্দুর কালো নির্বোধ মুখটা এবার বাসনার চোখের সামনে ভাসছিল। খুব স্পষ্ট। ওর চোখ, ঠোঁট, সবই যেন দেখতে পাচ্ছে বাসনা এবং দেখছে।

॥ বারো ॥

ঠিক ঘুম নয়, কেমন এক ঘন তন্দ্রা এসেছিল এবং সেই আচ্ছন্নতার মধ্যে বাসনা আচমকা যেন অনুভব করছিল, করতে পারছিল সাঙ্ঘাতিক এক ঝড় উঠেছে। সোঁ-সোঁ হাওয়া, গুমোট কালো আকাশ, গাছ লুটোচ্ছে, পাতা উড়ছে। সমানে একটানা বয়ে চলেছে। কী দুরন্ত আর তীব্র! বাসনা সেই ঝড়ো হাওয়ায় আর অন্ধকারে কেমন করে যেন এসে পড়েছিল। না কি, সেই হাওয়াই এসে পড়েছে বিস্তীর্ণ ব্যবধান পলকে পেরিয়ে, ডিঙিয়ে; আর এখন বাসনাকে তুলে নিয়েছে।

খুটি বাঁধা মশারি কি কাপড় হাওয়ার বেগে যেমন উড়ে যাই-যাই করেও কোনোরকমে আটকে থাকে, বাসনাও যেন সেই সজ্ঘাতিক বাতাসের টানে ভেসে যেতে যেতে কোথাও আলগাভাবে বাঁধা রয়েছে। এই অনুভূতি তার স্নায়ু এবং শিরায় শিরায় আশ্চর্য এক অসহায়তা ছড়িয়ে দিয়েছে এবং সেই দুরন্ত আকর্ষণ ওকে অবশ করছিল, ভয়ে বুকের স্পন্দনও বুঝি স্তব্ধ করে দিতে চাইছিল।

আমি বুঝি ভেসেই যাব, উড়েই যাব এই হাওয়ার টানে! হাত হাত বাড়িয়ে ধরাব একটা অবলম্বন খুঁজছিল বাসনা ব্যাকুল হয়ে। কিছু নেই, কিছুই না। পা ছুটোকে শক্ত আর আঁট করে বাসনা বিছানার মধ্যে চেপে রাখল। আর হাওয়ার হু-হু টানে ওর গা, হাত, মুখ ক্রমশই ভেসে যাই-যাই করছিল।

হঠাৎ, হঠাৎই হাত বাড়িয়ে এই শেষ সময় কী যেন ধরে ফেলতে পারল। বাসনা। একটা হাতই বোধহয়। কার?

চোখ মেলে চাইল এবার। কপাল-গলা ভিজে উঠেছে। কেবিনের মিটমিটে বাত্তিটা ম্লান চোখে জ্বলছে। মথার দিকে জানলা হাওয়ায় একটু শব্দ তুলল। কেবিনের সাদা পরদাটা যেন ঠায় দাঁড়িয়ে আছে দরজাটা ভেজানো। রাত বেড়েছে। আশ্চর্য নিস্তব্ধ সব।

গাল-গলা মুছে আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকালো বাসনা। কেউ নেই।

এখন যদি কাউকে কাছে ডাকার অধিকার থাকত বা ডাকা চলত, বাসনা অমলেন্দুকেই ডাকত। ওর কথাই শুধু মনে পড়ছে।

অমলেন্দুকে ডাকত এবং ডেকে বলত, হ্যাঁ, বলত বৈকি—এখানে এসে বোস। আমার মাথার কাছে। একটু সরে যাও বিছানার নিচের দিকে। তোমার চোখ, তোমার গলা, বুক, হাত—সব যেন দেখতে পাই।

আর শোন। আমার যা বলার আছে তুমি শোন। তোমার শোনানো উচিত। আমার কথা অনেক—সারা বিকেল এবং সন্ধ্যে ধরে এইসব কথা আমি ভেবে ভেবে ঠিক করেছি তোমায় বলব

বলে। কমলাদের মুখ থেকে এই বৃত্তান্ত জানার পর—আমি যেন এক জন্ম থেকে অন্য জন্মে এসে দাঁড়িয়েছি। কিংবা বলতে পার আমি আকাশ থেকে মাটিতে ছিটকে পড়েছি।

চাদরটা বুক থেকে উঠিয়ে গলা পর্যন্ত টেনে নিল বাসনা। বালিশের পাশ দিয়ে হাত এলিয়ে দিল। একটুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা পোকা দেখল। বাতির কাছে ফুরফুর করে উড়ছে—দেওয়ালের গায়ে ছিটকে পড়ছে আবার।

এই পতঙ্গের মতন, বাসনা মনে মনে তার সারা বিকেল-সন্ধ্যের জমানো কথা ভেবে ভেবে এবার বলছিল, অমলেন্দুকে উদ্দেশ করেই, ওই পতঙ্গের মতন তুমি আমার আলোর সীমানায় বার বার এসেছ, অমলেন্দু। বার বার। ঈশ্বর জানেন, আমি তোমায় কোনো প্রলোভন দেখাই নি। হাতছানি দিয়ে ডাকি নি, ইশারায় কাছে টানি নি, টানতে চাই নি। বরং তুমি, হ্যাঁ তুমি নিজেই, স্বেচ্ছায়, তুমিই জানো কী আকর্ষণে আমার চোখের সামনে ছুটে ছুটে এসেছ। তুমি কথা বলতে গল্প করতে চাইতে, হাসতে, আমায় হাসাতে চাইতে। আমি বুঝেছিলাম কারণ বোঝা সহজই ছিল, আমার ওপর তোমার এই লোভ কিসের এবং কেন।

আমি ভেবেছিলাম, ভাবা নিশ্চয় অন্যায় হয় নি যে তুমি অন্তত সেই সৎ পুরুষদের অন্যতম নও যারা পরস্ত্রীর পায়ের ওপরে আর চোখ তোলে না।

বলতে আমার সঙ্কোচ নেই, তোমাকে আমি অবিশ্বাস করতাম ঘৃণাও। ঘরে সাপ আছে জানলে নিশুতি রাতে কি অন্ধকারে বা আনমনা থাকলে সেই ঘরের একটি দড়ির স্পর্শেও মানুষ আঁতকে ওঠে। তেমনি, তোমায় আমি ভীষণ সন্দেহ করতাম, তেমন কারণ তুমি ঘটিয়েছিলে তোমার আচার আচরণে, আর তাই আমার, আমার কোনো এক অবস্থায় একটা সন্দেহকেও ধীরে ধীরে বিশ্বাস করে নিতে আমার বাধে নি। যদি সে-দিন অত রাত্রে তোমার সঙ্গে দেখা না হত, তুমি নিজের থেকে ওষুধ এনে না দিতে, আর

সেই ওষুধ খেয়ে আমি মরবার মতন না ঘুমতাম, দরজা খোলা না থাকত, তবে এমন ভুল করতাম না। করবার কারণ থাকত না।

ভুল আমি করেছি। এত বড় ভুল মানুষে বুঝে করে না, এমন মারাত্মক ভুল। কিন্তু তখন, তেমন অবস্থায় পড়লে এবং আমার যে-রকম মনোভাব ছিল তোমার সম্পর্কে, তাতে এই ভুল করা আশ্চর্যের নয়। তবু, ভাবলে আমি আশ্চর্যই হচ্ছি।

কেন যে এমন হল!

বাসনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বাইরে কোথায় কে কেঁদে উঠেছিল, সেই কান্নার অস্পষ্ট একটু গোঙানি কেবিনের স্তব্ধতায় একটা ভয় ছিটিয়ে গেল।

চুপ। পাশ ফিরল আবার বাসনা। বালিশে মুখের একটা পাশ গুঁজে নিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকল।

ঘুম আসছিল না। মাথাটা ঠাস ধরে গেছে। ভাবতেও আর ভাল লাগছে না। তবু ছেঁড়া-খোঁড়া অজস্র ভাবনা ধোঁয়ার শিখার মতন ভেসে ভেসে উঠছে।

অমলেন্দুর কথা যতই ভাবছে ততই এবার নিজের ওপর, নিজের সম্পর্কে বিরক্তি জমছে। বিশ্রী লাগছিল বাসনার। বলতে কি, যতই যুক্তি সাজাও, নিজেকে সমর্থন করো—তবু, বাসনা স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, অমলেন্দুকে যা ভাবা গিয়েছিল সে তা নয়।

অনুশোচনা হচ্ছিল বাসনার—তার মূর্খতা এবং এই মারাত্মক ভুলের জের টেনে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে ও তার কথা ভেবে ভেবে এবং অমলেন্দুকে অকারণেই এতটা চুনকালি মাখিয়েছে মনে মনে কেন তাই ভাবতে বসে।

আমি খুবই অন্যায় করেছি: বাসনা বলছিল নিজেকেই এবং প্রশ্ন করছিল, কিন্তু কেন, আমি এসব ভাবলাম, এত করলাম? কি দরকার ছিল?

আর অত নিস্তব্ধ রাত্রে একা হাসপাতালের অনাত্মীয়, নিঃঝুম ঘরে, মৃদু আলোর মধ্যে বাসনা হঠাৎ যেন নিজেকে নিজের কথার উত্তর দিতে

শুনে চমকে উঠল।

সেই উত্তরটা মুখ দিয়ে শব্দ হয়ে ফুটছিল না। বা মনের মধ্যে সাজানো কথা নিঃশব্দে লেখার মতন কথা বলছিল না। সমস্ত শরীর এবং মনে আশ্চর্য এবং অব্যক্ত এক ব্যর্থতা গুমরে কাঁদছিল। যে কান্না অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে তার চেতনায় সাপ-চলার মতন শিরশির করে এই অনুভূতি জাগাচ্ছিল যে, হয়তো তার এ-ভুল এমনভাবে মিথ্যে না হয়ে গেলেও সে খুশী হত।

আমি কি তাই চেয়েছিলাম? বাসনা ভাববার চেষ্টা করছিল বিহ্বল হয়ে। তার বুক কাঁপছিল, একটা ব্যথা যেন হাত বাড়িয়ে হৃদ্‌পিণ্ডটাকে মুচড়ে ধরার চেষ্টা করছিল। আর বাসনা ভয়ানক রকম ভয় পেয়ে চোখ বন্ধ করে চাদরে মাথা পর্যন্ত ঢাকা তুলে নিয়ে কাঠ হয়ে পড়েছিল।

অমলেন্দু এল। পরের দিনই। ভিজিটিং আওয়ার্সের ঘণ্টা পড়েছে সবে।

বাসনা শুয়েছিল। কনুই-মোড়া হাতের ওপর মাথা রেখে, পাশ ফিরে। ছায়া-ছমছম ঘর। ঠাণ্ডা। লাইজলের গন্ধ উঠছিল।

কেবিনের পরদাটা একটু কেঁপে গেল। একটা পাশ সরে উঁকি দিল মুখ। তারপর নিঃসাড়েই অমলেন্দু মাথার কাছটিতে এসে দাঁড়ালো।

দেশলাই-কাঠির মতন ফস্ করে একবার জ্বলে উঠেই চোখ মুখ যেন নিবে ছাই-কালো হয়ে গেল বাসনার।

অমলেন্দুর চোখে চোখে তাকাতে পর্যন্ত পারছিল না বাসনা। দেওয়ালে চোখ রেখে চুপ করে, ঠোঁট জুড়ে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকল।

অমলেন্দু দেখছিল। ফ্যাকাশে, ক্লান্ত, ম্লান একটি মুখ। শুকনো ফুলের মত নিষ্প্রাণ। কপালের ওপর রুক্ষ কিছু চুল জড়িয়ে রয়েছে। গলার সেই নীল শিরাটা সুতোর মতন চিবুক পর্যন্ত উঠে এসে হারিয়ে গেছে কোথায় যেন। চোখ ভরা ঘুম না বেদনা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

আস্তে করে হাত বাড়িয়ে কপালে রাখল একটু অমলেন্দু। একটু যেন জ্বর-জ্বর লাগছে না। চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বলল খুব মৃদু

নরম গলায়, 'জ্বর রয়েছে দেখছি।'

টুলটা একটু পাশ করে নিয়ে বসল অমলেন্দু।

বাসনা চুপ। যদিও এই স্পর্শ ভাল লাগছিল—কিন্তু ভয়ও হচ্ছিল, যদি কমলারা কেউ এসে পড়ে এখন, তবে? কিন্তু কিছু বলতে পারছিল না; বাধা দিতেও না।

'কাল সন্ধ্যেবেলায় ও-বাড়ি গিয়ে দেখি কেউ নেই। শুনলাম, হাসপাতালে সব। তোমার কথাও বললে ঠাকুরটা। কিন্তু কোন্ হাসপাতালে আছ তা জানে না', অমলেন্দু নিজে থেকেই হাতটা সরিয়ে নিলে কপালটা পরিষ্কার করে দিয়ে। 'শুনে পর্যন্ত এমন অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু কি করব, কোথায়, কোন্ হাসপাতালে আছ তা কেমন করে খুঁজে বের করি। উপায় ছিল না আমার চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া। শেষে কমলাবউদিরা ফিরলে সুধাদার মুখে সব শুনলাম।' অমলেন্দু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

একটু চুপ।

'ওরা এল না!' এতক্ষণে বাসনা কথা বলল খুব সাধারণ একটা ভূমিকা করে।

'আসবে নিশ্চয়। সুধাদা অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে ওদের নিয়ে আসবেন।'

'তুমি কি কলেজ থেকেই সটান আসছ?' বাসনা সহজ হবার চেষ্টা করছিল।

'না, কলেজ যাই নি আজ।'

'যাও নি। কেন?' বাসনা তাকালো। যদিও অমলেন্দুর কলেজে না যাওয়ার কারণ বুঝতে তিলমাত্র দেরি হয় নি।

সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে অমলেন্দু বলল, 'আমার ভাগ্যটা খুবই মন্দ দেখছি।' বলে বিষণ্ণ হাসি হাসল একটু।

বাসনা দেখল সেই বিষণ্ণ হাসিটুকু। নষ্টই হচ্ছিল তার। কি ভেবে সামান্য পরে জবাব দিল হাসবার চেষ্টা করে, 'আমারই বা কী এমন ভাল ভাগ্য! এ-সব ছোঁয়ায় হয়। বড্ড ছোঁয়াচে লোকের কপালের সঙ্গে

তোমার কপাল জড়িয়েছ।'

'তাই নাকি?' অমলেন্দু একটু গম্ভীর হয়ে চুপ করে গেল। খানিক পরে বললে, 'এমন একটা রোগ বাধালে শুধু নিজের শরীরের ওপর অগ্রাহ্য করে।' একটু থামল, 'অবশ্য রোগের কথা বলা যায় না কিছুই, তবু—ভীষণ অযত্ন আর অগ্রাহ্য করো শরীরটাকে। আজ পাঁচ মাস ধরে রোগটা পুষে পুষে বাড়ালে, একবারও তো মানুষের সন্দেহ হয়, ভাবনা হয়।' ক্ষোভে গলার স্বর ভার আর চাপা শোনাচ্ছিল।

সন্দেহ, ভাবনা, ভয়? বাসনার কানে শব্দগুলো যেন তীরের মতন গেঁথে যাচ্ছিল।

সন্দেহ, ভাবনা, ভয়—আমি যে না করেছি এ তুমি কি করে জানলে অমলেন্দু? বাসনা মনে মনে বলছিল কাতর হয়ে, পাঁচ মাস ধরে প্রতিদিন কী ভীষণ সন্দেহ আর ভাবনায় আর ভয়ে আমার দিন কেটেছে তা তুমি জান না। কল্পনাও করতে পারবে না। সন্দেহ, ভাবনা এবং ভয়—আমার সব ছিল—কিছু আমি যে অন্য কিছু ভেবেছিলাম। তাই কাউকে কিছুই বলতে পারি নি, লুকিয়েই রাখতে হয়েছে। তোমায় কি বলব সে-কথা? শুনবে?

বাসনা অমলেন্দুর মুখটা এবার ভাল করে দেখছিল। দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায় গুমোট হয়ে রয়েছে। কাল সারারাত বোধহয় ঘুমোতে পর্যন্ত পারে নি, ছটফট করেছে। এখন তো বাসনা ওরই স্ত্রী। স্ত্রী সম্পর্কে উদ্বিগ্ন যদি হয় অমলেন্দু বাসনা কি-ই বা করতে পারে।

বাসনার জন্যে এই যে একটা লোক সারা রাত না ঘুমিয়ে দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় ছটফট করেছে—কথাটা ভাবতে ভালই লাগছিল বাসনার। আরও ভাল লাগছিল মনে করতে যে, অমলেন্দু বাসনার সম্পর্কে একটা দায়িত্বের মনোভাব নিয়ে এখন সব কথা ভাবছে এবং ভাববে।

'আমাকেও তো অন্তত একবার বলতে পারতে!' অমলেন্দু বলছিল। বাসনা হঠাৎ কথার শব্দে আবার সজাগ হয়ে কথা শুনতে লাগল, 'এখন অবস্থাটা কেমন দাঁড়ালো দেখতেই পারছ। হাত-পা আমার বাঁধা। কিচ্ছু করারউপায় নেই। এমন কি, রোজ এসে দেখা করারও।'

'তা কেন—!' জবাবে খানিক অপেক্ষা করে বলল বাসনা, 'তুমি রোজই এস।'

'আমার তাই ইচ্ছে, তুমি এখন আপত্তি না করলেই হয়।'

'আপত্তি কি!' বাসনা ঘাড় সরিয়ে একটু কাত হয়ে শুলো।

'তোমার যে কখন কিসে আপত্তি ওঠে বলা যায় না।' সম্ভবত একটু বিরক্ত হয়েই অমলেন্দু বলছিল, 'আমি বুঝি না, বুঝতেই পারি না।' একটু থেমে বাসনার চোখে চোখ রেখে আস্তে করে বলল অমলেন্দু আবার, 'সুধাদাকে আলাদা করে বলব কথাটা।'

বাসনা চমকে উঠল যেন। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, 'পাগল নাকি, এখন, এ-অবস্থায়?'

'এ-অবস্থায় নয় তো কখন?' অমলেন্দুর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে গেল, আরও বিষণ্ণ।

'সেরে উঠি, তারপর।' বাসনা সহজ গলায় বলছিল।

'সেরে উঠে বাড়ি ফিরে যাবে, স্বাস্থ্যটা আবার ভাল হবে—ক'মাস আরও যাক এভাবে, তারপর। তাহলে এই বিয়ের কি দরকার ছিল? আমার করবারই বা কি থাকল!' অধৈর্য হয়ে কথা বলছিল অমলেন্দু এবং বেশ অভিমান করেই।

বাসনার একটু কষ্ট হল না এই অভিমানের সুর চিনে নিতে। অদ্ভুত লাগছিল তার। বুকটা কেমন এক আবেগে কনকন করছিল।

দু'জনেই চুপচাপ। অমলেন্দু অন্য দিকে তাকিয়ে।

বাসনা পরদার দিকে একবার চেয়ে দিয়ে আস্তে করে হাত বাড়ালো। অমলেন্দুর হাতটা টেনে নিলে বুকের ওপর। খুব ভাল লাগছিল। মুখ দিয়ে কথা ফুটছিল না। চোখে জল আসছিল।

'যদি মরে যাই তাহলে কথা নেই।' খানিক পরে চাপা ভেজা গলায় ধীরে ধীরে বলল বাসনা। বলে একটু হাসল। অপেক্ষা করল। আবার বলছিল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, 'যদি সেরে উঠি, তোমায় আর ভোগাবো না। আমিই বলব সব। স্বীকার করব আর আমার লজ্জা-সঙ্কোচ থাকবে না।'

অমলেন্দু কথা বলল না। চুপ করেই থাকল।

বাসনা ভাবছিল। ভাবছিল, এই অমলেন্দুকে সে আজ অন্য চোখে দেখছে। বড্ড কষ্ট হচ্ছে ওর জন্যে। ওর কথা শুনে। আগে যা হত না। হয় নি।

'তোমায় একটা কথা আমার বলা উচিত।' হঠাৎ কেমন এক আবেগের মধ্যে বলে ফেলল বাসনা এবং বলে একটু সতর্ক হয়ে উঠল।

'কি?' অমলেন্দু তাকালো।

'বলব?'

'বলো।'

'আজই, এখুনি নয়।' অমলেন্দুর হাত ছেড়ে দিল বাসনা, 'সে অনেক কথা। এত অল্প সময়ে কুলোবে না। কমলারা এসে পড়বে এখুনি। অন্য একদিন—যেদিন সময় পাব, কেউ আসবে না। কাল পরশু—যে-কোনো একদিন।'

বাসনার কথা ফুরোয় নি—কেবিনের পরদা সরে কমলার মুখ ভেসে উঠল।

।। তেরো ।।

সামান্য জ্বর-জ্বর ভাবটা কাটল। যন্ত্রণাও কম। ক'দিন একটানা বিছনায় শুয়ে শুয়ে আর ভাল লাগছিল না। শিরদাঁড়া যেন আসাড় অবশ হয়ে গিয়েছে। সকাল থেকেই সেদিন বালিশে হেলান দিয়ে বসে অনেকক্ষণ কাটিয়েছে বাসনা। দুপুরের দিকে আর বসে থাকতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। একটু উঠে দাঁড়াতে, চলাফেরা করতে কী সে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল তার। তবু সাহস পাচ্ছিল না। ভয় হচ্ছিল। কে জানে আবার যদি কিছু হয়ে যায়!

শেষে নার্সকেই মনের ইচ্ছেটা বলে ফেলল বাসনা। গলার স্বরে

ছেলেমানুষের মতন খানিক মিনতি, একটু-বা আব্দারও। 'বেশ তো'। সুনীতি চল্লিশ বছরের ভরাট গোলগাল মুখের আনাচে-কানাচে হাসি ছড়িয়ে বলল, 'জানলাটার কাছে গিয়ে বসুন একটু। টুলটা আমি এগিয়ে দিচ্ছি।'

বিছানা ছেড়ে পায়ে ভর দিয়ে উঠতেই কেমন যেন হালকা লাগল বাসনার। মনেই হচ্ছিল না ওর শরীর বলে কিছু আছে। কোনো রকম ভার, হাঁটার শক্তি বা পা-ফেলার জোর। অবশ্য এ-রকমটা মনে হয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। সুনীতি হাত বাড়াতেই কিন্তু বাসনা প্রথমটায় একটু ধরি-কি-না-ধরি করে নিজে নিজে হেঁটে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। না কোনো কষ্ট হল না।

দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকালো বাসনা সুনীতির দিকে। একটু হাসল ঠোট ভিজিয়ে।

'কেমন যেন লাগে, না!' বাসনা বলল নিজের থেকেই, 'বিছানায় শুয়ে শুয়ে এমন অভ্যেস হয়ে যায়, দাঁড়ালেই মনে হয় পড়ে যাব। হাঁটতেই জোর আসে না পায়ে।'

'তবু তো মাত্র ক'দিন শুয়ে রয়েছেন।' সুনীতি জবাব দিল, 'অপারেশনের পর কিন্তু বেশ কিছুদিন শুয়ে থাকতে হবে।'

হাসিটুকু নিবে গেল। সুনীতির দিকে চেয়ে চেয়ে সময় কাটল একটু।

'কবে হবে অপারেশন?' বাসনা জিজ্ঞেস করল, খুব মৃদু গলায়, ভয়ে ভয়ে।

'ঠিক জানি না। তবে শিগগিরই, দিন আট দশের মধ্যে বোধহয়, জ্বর যখন ছেড়েই গেছে।'

সুনীতির মুখ থেকে চোখ তুলে জানলা দিয়ে তাকিয়েছিল বাসনা কথাগুলো শুনতে শুনতে। খুব অস্পষ্ট কালো কালো একটা ছবি যেন মনে ভেসে উঠছিল। সেই মুখটা মনে পড়ছিল, ফরসা গাল-গলা ফোলা জ্বলজ্বলে চোখ বয়স্ক ডাক্তারটির। উনিই ডাক্তার ব্যানার্জি। বাসনাকে দেখেছেন। এখনও দেখছেন। কাটাকুটিও করবেন নিশ্চয়।

বুকের ওপর থেকে লাফ দিয়ে এক মুঠো ভয় যেন কণ্ঠার কাজে এসে বিঁধেছে।

কী ভাবল বাসনা। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'খুব কষ্ট হয়, না—?'

'কষ্ট! না, তেমন কষ্ট আর কী—' সুনীতি সাহস যোগাবার চেষ্টা করল, 'সামান্য কষ্ট-টষ্ট সহ্য করতে হয়ই। তা এ আর কিসে না হয় বলুন। একটা ফোড়া হলেও কি তার টনটনানি যন্ত্রণা কিছু কম।'

আর কোনো কথা বলল না বাসনা। জানলার কিনারা ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। বাইরে তাকিয়ে।

সুনীতি চলে গেল।

এখন শেষ দুপুর। রোদের কমলা রঙ আজ সামনের গাছ রাস্তা ফুলবাগান ভিজিয়ে রেখেছে। ছায়া বাড়ছে দালানটার গা দিয়ে। খানিকটা রোদ জানলায়। বাসনার গায়ের একটা পাশেও।

বাসনা দেখছিল। কাঁকরের রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি যাচ্ছে আসছে। দু'দশজন লোক। কয়েকটি ছেলে। একটি দু'টি নার্স। মেথর ধাঙড় জমাদার গোছের কেউ কেউ, তাদের বউ-টউও। আঁচল ধরে ধরে কি বুকে মুখ দিয়ে ওদের বাচ্চারা।

মোরগফুলের ঝুঁটি দোল খাচ্ছে হাওয়ায়। কাক চড়ুই ডাকছে। বেশ চুপচাপ, শান্ত-শান্ত লাগে এই দুপুর, হাসপাতালের এ-পাশটা। কোথা থেকে এক নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে এসেছে। উড়ছিল এখানে ওখানে। বাসনার চোখে পড়ল। ব্লকের এ-রেলিং থেকে অন্য রেলিংয়ে উড়ে গেল। তারপর ফরফর ডানা এলিয়ে বাতাসে। আকাশে।

আকাশটা কী নীল। রোদ টসটসে। তুলোট মেঘের কলকা বুনেছে যেন জমিতে।

হঠাৎ আকাশ থেকে চোখটা মাটিতেই নেমে এল। আট দশজন লোক চলেছে। কাঁধে মড়া বয়ে। কিছু ফুল চোখে পড়ছে। একটা চাদরও যেন। মুখ নয়।

বুকটা ছ্যাঁক্ করে ওঠে বাসনার।

কাঁকরের রাস্তা বয়ে দলটা মিলিয়ে যেতে খানিকটা তবু স্বস্তি পায় বাসনা।

হ্যাঁ, বিশ্রীই লেগেছে তার। মনটা আরও মুষড়ে পড়ল দৃশ্যটা দেখার পর।

আট দশ দিন পর, বাসনা ভাবছিল, তার শরীরটাই বা অগ্রহায়ণের এমন ঠাস দুপুরে একটু শীত-শীত হাওয়ায়, মোরগফুলের ঝুঁটির পাশ দিয়ে আসড়ে চলে না-যাবে এমন নয়। যেতে পারে। যাওয়া আশ্চর্যের নয়।

টুলটার ওপর আস্তে আস্তে বসে পড়ল বাসনা। বসে বারকয়েক গুনে গুনে নিশ্বাস নিল। যেন হিসেব করছিল, তার জীবনের এখনও কত বাকি, সে-জোর নিশ্বাস প্রশ্বাস আছে কিনা।

আর ভাবছিল, এই ভয়, মৃত্যুভয়, শরীরের ভয়, যন্ত্রণা-সহের উদ্বিগ্নতা-দুশ্চিন্তা তাও কাছে যেন একেবারেই নতুন। আগে ছিল না। যদিও থেকে থাকে, তা অন্তত এমন করে তাকে আকুল-ব্যাকুল করে নি, করতে পারে নি। বরং কষ্ট কি দুঃখ কি মৃত্যুর মধ্যে যে নির্যাতন নিগ্রহ এবং বিরাট নিঃস্বতা আছে তা যেন মনেই আসত না। তখন ভাবত, মরে যদি যাই যাব, কষ্ট যদি হয় হবে, সইব।

কী সুখেই আমি আছি যে বাঁচবার জন্যে ডাক্তার ওষুধ শরীর শরীর করব—তখন বলত বাসনা, আড়ালে পরিমলের ছবির কাছে দাঁড়িয়ে মনে মনে। হ্যাঁ বলত, কমলারা যদি শরীরের কথা তুলত এবং ভাবত, বেশ স্বচ্ছ ভাবেই ভাবতে পারত অন্তত যে, আমার কাছে মৃত্যু কিচ্ছু না—এর কোনো শূন্যতা আমায় স্পর্শ করতে পারবে না। বরং যদি যাই, মরে যাই—আমার পথ আর তাঁর পথ এক হয়ে যাবে। হয়তো আমি পৌঁছতে পারব তাঁর কাছে।

সত্যি কীই বা তখন গ্রাহ্য করেছে বাসনা। শরীর স্বাস্থ্য কষ্ট যন্ত্রণা কিচ্ছু না।

আর আজ, কী আশ্চর্য, নিজের ওপরই কেমন এক মায়া পড়ে গেছে। অগাধ দুর্বলতা। নয়তো, বিছানা ছেড়ে দু'-পা হেঁটে জানলার

এসে দাঁড়াবে তাই কত ভাবছিল, সাহস পাচ্ছিল না, সুনীতির কাছে ফলাফলটা জেনে নিয়ে তবে উঠেছে পা-ভর দিয়ে।

আজকাল আমি ভয় পাচ্ছি। বাসনা যা ভাবছিল তা গুছিয়ে সাজালে প্রায় এ-রকম দাঁড়ায়। আমি খুবই মুষড়ে পড়ছি যখন ভাবছি আমি আর থাকব না। এখন এই-ই আমার বেশ লাগছে। ভালই লাগছে। নিজেকে এবং আমার এই জীবনকে নতুন করে দেখছি আমি। আমার জন্যে অনেক সুখ আছে, অনেক আনন্দ।

এ কষ্ট আর ক'দিন। আমি সেরে উঠব। তারপর কত অসংখ্য দিন আর মাস আর বছর পড়ে রয়েছে। পুরো জীবনটাই আমাদের। আমার আর অমলেন্দুর। আমাদের ঘর-সংসার, কাজ-অকাজ, রান্না-বান্না, ঘরগুছনো, বিছানা সাজানো, বেড়ানো, গল্প, হাসি, ঘুম। আরও কত। ছেলেপুলে। সেই সুখের সুন্দর কষ্ট। তারপর কোল-জোড়া হয়ে ঘর-বারান্দা। ছেলে মানুষ করা। দুধ খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো। কথা ফুটলে চাঁদ শোনানো তারপর ছড়া, অ-আ।

এ-সব স্বপ্ন আমার কবেই ফুরিয়েছিল। আবার এসেছে। এখন আর স্বপ্নই বা বলি কেন। যা হয়, হচ্ছে সকলের, হবেই, তাই সাদা-মাটা কথা, হিসেব। এমন হিসেবে কমলার জীবন চলছে, বেলা, মীরা, আরতিদির। বীথির বিয়ে হলে তারও। সকলেরই সব মেয়ে-মানুষেরই, আমারও চলবে।

সেই হিসেবের সুখ আমি এখন বুঝি। স্বাদ পাই নি, কিন্তু স্বাদ যে আছে তা জেনেছি। নিজেকে এখন আমি ভালই বাসছি। আমার সত্তায় কখন মিশে আছে একটি উজ্জ্বল মুখর জীবনের কড়ি। এবারে ফুটবে। একটি দল মুখ খুলেছে শুধু। আস্তে আস্তে নিজেকে ছড়িয়ে-বাড়িয়ে-সাজিয়ে তবেই তার সবটুকু শোভা ফুটবে।

এর জন্যে সময় চাই। একদিন দু'দিন নয়। দু'পাঁচ মাস কি দু'এক বছরও না। অনেক, অনেক সময়।

বসে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। এর মধ্যেই ক্লান্তিতে মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। গা হাত অবশ-অবশ। টুল ছেড়ে

আস্তে আস্তে উঠল বাসনা। সাবধানে দু'পা এগিয়ে লোহার খাটের মাথাটা ধরে ফেলল।

পাশ ফিরে শুয়েই পড়ল বাসনা। চোখ আড়াল করে। বালিশে মুখ গুঁজে চুপ করে শুয়েই থাকল। হয়তো ঘুমোবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ঘুম আসছিল না। বরং কান্না আসছিল। অন্য রকম এক কষ্ট হচ্ছিল বুকে। আর নিজেকে এখন এত অসহায় লাগছিল বাসনার, যেন একটা ঝরা পাতা হাওয়ায় উড়ছে। ঠিক-ঠিকানা নেই।

বীথিই এল। তখনও হাসপাতালের ঘণ্টা পড়ে নি। না পড়ুক। এটা কেবিন। একজন কেউ আমরা থাকতেই পারি চব্বিশ ঘণ্টা ইচ্ছে করলে। সে-সব বলা-কওয়া আছে। কিন্তু তুমি এত কি ভাবছিলে, ছোড়দি? আমি অন্তত মিনিট পাঁচেক হল তোমার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

টুলে নয়, বাসনার বিছানাতেই কিনারা ঘেঁসে বসল বীথি। টুলটার ওপর বইখাতা নামিয়ে রাখল

'তুই কি সটান কলেজ থেকেই আসছিস আজ?' বাসনা আচলে চোখ মুখ মুছে নিয়ে একটু অবাক গলায় বলল।

'না। কলেজে গিয়েই আজ ছুটি পেয়ে গেলাম। দল বেঁধে গিয়েছিলাম আমাদের এক বন্ধুর বাড়ি। কাল তার বিয়ে হয়েছে। সেখান থেকে আসছি।' বীথি বেণী দুলিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে বলছিল। হাসি-হাসি মুখ।

'তোর বন্ধু। কে—?' বাসনা, একটু উঠে বসল।

'না। খুব বন্ধু নয়। পড়ত একসঙ্গে।' বীথি একটু থামল। হঠাৎ হাসল ফিক করে, 'জান মেয়েটা এমন কানকাটা—কথাটা শুরু করে চুপ করে গেল—শুরু করল আবার, 'এক রাত্তির কাটতে না কাটতে একেবারে অন্য মানুষ। আমরা সব অবাক, ছোড়দি। যতক্ষণ ছিলাম বরের গল্প।'

'কেমন দেখলি বর?' বাসনাও হাসল। ভাবছিল অন্য কথা।

'তেমন কিছু নয়। রাম শ্যাম যদুর মতনই। ঠোঁট উলটে বীথি বলল,' এই নিয়ে এত আহ্লাদ করবার কি-যে ছিল লাবণ্যর জানি না।'

বাসনা খানিক্ষণ আর কিছু বলল না ভাবছিল। বীথিকে একথা বোঝানো মুসকিল একটা রাত্তিরই কখনো সখনো জীবান এমন এক একটা মোড় ঘুরিয়ে দেয়, যার পর আর মনেই হয় না, পিছনে আমার পথ ছিল আও, সে পথ আমি হেঁটে এসেছি।

মনমরা ভাবটা এইসব হালকা কথায় কাটছিল। আবার না চেপে বসে তাই তাড়াতাড়ি বাসনা যা ভাবাছল, ভাবতে শুরু করেছিল এলোমেলো করে ছড়িয়ে দিয়ে অন্য কথা পাড়ল।

'পরের বিয়ে দেখে দেখে আর কতদিন কাটাবে। নিজেই একটা করে ফেল।' বাসনা হাসল।

'ঠিক বলেছ।' বীথিও জবাব দিচ্ছিল, 'তোমরা তো আর খুঁজে-টুঁজে দিলে না, নিজেই একটা পাত্র জুটিয়ে নি এবার।' কথাটা শেষ করে শব্দ করেই হাসল বীথি। হেসে সরাসরি বাসনার দিকে তাকিয়ে থাকল।

বাসনার হঠাৎ মনে হল, কথাটা যেন তাকে ঠেস দিয়েই বলল বীথি। অস্বস্তি আর কেমন যেন কুণ্ঠায় অপ্রস্তুত মুখে তাকিয়ে থাকল বাসনা। বিশ্রী লাগছিল।

মুখ ফিরিয়ে বাসনা বোকার মতন কি যে আজে-বাজে কথা ভাবল, আর যখন তার চুপ করে যাওয়াই উচিত, তখন—ঠিক তখনই অত চড়া সুরের ওপরও আর সুর চড়াতে গেল। বলল, বলে ফেলল আচমকাই, 'কেন, পাত্র তো আছেই ঠিক করা। অমলেন্দু।'

বীথি আর জবার দিচ্ছিল না। বাসনা অপেক্ষা করল। তারপর আস্তে আস্তে মুখ ফেরালো বীথিকে দেখতে।

হাসি-হাসি মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেছে বীথির। কালো মুখে দাগ ফুটেছে কঠিন হয়ে। বীথির মাথা আর দুলছে না, বিনুনী নড়ছে না। গলার হারটা আঙুলে পেঁচাচ্ছিল আর তাকিয়েছিল বাসনার দিকেই স্তব্ধ চোখে।

বাসনাও চুপ। বুকটা কাঁপছে।

একটা কথা বলব ছোড়দি। বীথিই কথা বলল আচমকা।

তাকালো বাসনা। আঙুল মটকাতে মটকাতে সহজ হবার ভঙ্গি করছিল। একবার হাই তুলল।

'তুমি হয়তো বুঝতেই পার, আর আমিও জানি—' বীথি স্পষ্ট গলায় বলছিল, 'এই ঠাট্টা আমার কেন ভাল না লাগার কথা।'

'ঠাট্টা কেন, কথাটা তো ঠিকই।' বাসনা জবাবে সাধারণ একটা কথা বলল। এবং আর কিছু বলবে না ঠিক করে মুখ বুজল।

যে কথা দিয়ে আলোচনাটা শেষ করতে গেল বাসনা, বীথি যে· সেই কথাতেই করল।

'কিছু ঠিক নয় ছোড়দি। অমলদার মন আমি জানি।'

'জানিস? চমকে উঠল বাসনা। মুখটা শুকিয়ে আসছিল। ভয় হচ্ছিল এবার না বীথি মুখ ফুটে কথাটা বলেই দেয়। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে হাসবার ভঙ্গি করল বাসনা, 'পাগলামি করিস না তো! তুই ওকে জিজ্ঞেস করেছিলি?'

'সব কথাই কি জিজ্ঞেস করতে হয়, ছোড়দি?' বীথির ঠোঁটের আগায় করুণ একটু হাসি ফুটল, 'নাকি তুমিই পারতে! পেরেছ!'

বাসনার চোখের সামনে হঠাৎ যেন একরাশ পুরু কুয়াশা ভেসে এল। বীথির মুখ আর দেখতেই পাচ্ছিল না। জল-ছিটনো আয়নায় ছায়াপড়া মুখের মতন অবস্থা অদ্ভুত। বাসনার মনও সেই কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। ভাবতে পারছিল না বাসনা। ভাববার আর যেন কিছুই ছিল না। বিহ্বল বিমূঢ়। গা, পা, হাত কিছুই আর নড়ছিল না। অসাড় দেহে হৃদপিণ্ডের মৃদু দীর্ঘ-বিরতি স্পন্দনে নিশ্চল হয়ে পড়েছিল।

হাসপাতালের ঘণ্টার শব্দে চমকে উঠে যেন নিজেকে ফিরে পেল বাসনা!

বীথিও এই নিস্তব্ধতা আর গুমোট কাটিয়ে কথা বলল, আস্তে আস্তে, 'তুমি যেন ভেব না এর জন্যে আমার খাওয়া ঘুম বন্ধ হয়ে

গিয়েছে—' হাসবার চেষ্টা করছিল ও, 'একটু হয়তো মনটা খারাপ হয়েছিল প্রথম প্রথম। এখন কিছু না। আমি জানি, এ রকম অনেক হয়। তাই ও-সব আর ভাবি না, ছোড়দি। আজ হোক, কাল হোক বিয়ে আমার হবেই। সেই নতুন ভদ্রলোককে—' এবার সত্যিই হাসল বীথি, 'আমি বেশ ভালবাসতে পারব। কোনো কিছুতেই আমার আটকাবে না। পাঁচ সংসারের মতন আমারও সংসার তখন রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে থাকবে।' বীথি চুপ করল।

বাসনার বুকটা টনটন করে কান্না উপচে আসছিল। অনেক কষ্টে আবেগ চাপতে গলা ফুলে উঠল। নীল শিরাটা স্পষ্ট হল আরও।

বীথি তখন টুল থেকে বই খাতাপত্র তুলে ঘাঁটছিল। একটা পত্রিকা আর চটি-মতন একটা বই এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার জন্যে এনেছি, ছোড়দি। সারাদিন একলাটি থাক। এগুলো শেষ করো, আরও বই দিয়ে যাব।'

বীথি চলে গিয়েছিল। তারপর কমলা এল অমলেন্দুর সঙ্গেই। সুধাময় আজ আসতে পারবে না। কালও না। কমলাও কাল আসবে না। কোথায় যেন যেতে হবে। হয় বীথি আসবে। না হলে অমলেন্দু। তার কাছ থেকেই খোঁজ-খবর জেনে নেবে কমলা।

ওরা এল। বসল। গল্প করল। এটা-সেটার খোঁজ-খবর নিল। তারপর অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে হাসপাতালের ঘণ্টা বাজল। ওরাও উঠে পড়ল।

কমলারা যখন থাকে অমলেন্দুর সঙ্গে কথাই বলতে পারে না বাসনা। একটা দু'টো হ্যাঁ--না। তাও কত সন্তর্পণে। তাকাতেও পর্যন্ত ভয় ভয়, লজ্জা করে।

তবু যাবার সময় আড়চোখে অমলেন্দুকে অনেকবার দেখল বাসনা আজ। যেন বলছিল, এরা আসে-না-আসে কষ্ট হয় না। কিন্তু তুমি এস। নিশ্চয় এস। তুমি কাছে থাকলে এত ভাল লাগে, না থাকলে মনে হয় সব ফাঁকা, সমস্ত!

কমলারা চলে গেল। কেবিনের বাতি ততক্ষণে জ্বলে উঠেছে। বেশ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। হাসপাতালের করিডোরে পায়ের শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। সেই রোজকার মতন ছমছম নিঃশব্দ রাত্রি আসছে। কখনো দু' একটা চিকন গলার স্বর ককিয়ে ওঠে, আবার চুপ। সেই গন্ধ। অ্যালকালি, অ্যাসিড আর লাইজলের বিচিত্র কটু গন্ধ। মাঝে মাঝে বমি আসে।

অমলেন্দু আজ হাতে করে ফুল এনেছিল। মরসুমী ফুল। লাল-সাদা ছিট মেশানো। ছোট্ট ছোট্ট ফুল। চিকরি-কাটা পাতা। ঘন বেগুনী রঙেরও ক'টা ফুল ছিল। কাচের গ্লাসে রেখে মিটসেফটার ওপর বসিয়ে দিয়ে গেছে।

এই ফুল দেখতে দেখতে এবং অমলেন্দুর কথা ভাবতে বসে বীথিকেই বার বার এখন মনে পড়ছিল বাসনার।

বীথি যেন আজ অন্য কোনো মেয়ে হয়ে এসেছিল। অন্য আর-এক রূপে বাসনা যাকে কোনো দিন দেখে নি। চিনতেও পারে নি।

আশ্চর্য মেয়ে, এই বীথি। মাত্র কুড়ি বছর বয়স কিন্তু এই বয়স তাকে বৃথা মন-ভার করে থাকতে শেখায় নি। শেখাতে পারে নি বোধহয়। কত স্পষ্ট আর সহজ। বাসনা বাস্তবিকই অবাক হয়ে ভাবছিল, এই বীথির যে এত সাহস, কিংবা বল এমন অসংকোচ সাদা-মাটা সরল সহজ মন—বাসনা তা ভাবতেও পারে নি।

অমলেন্দুকে যে ও ভালবাসত—এই কথাটা কী সহজভাবেই ও বলল কী অক্লেশে। এতটুকু ঢোঁক গিলল না, কিন্তু কিন্তু করল না। সোজাসুজি বলল মনের কথা। কোনো লুকোচুরি, চুপিচাপা নয়। ভালবেসেছিলাম, তারপর ওর মন বুঝলাম। বেশ একটু কষ্ট হল কিন্তু সেই কষ্ট আমার সব নয়। এমন হয় আমি জানি। কাজেই মন মুষড়ে থাকবে কেন। আমি তেমনি হাসিখুশিই আছি। আবার কেউ আসবে যাকে বিয়ে করব। তাকে আমি ভালবাসব। কোথাও এতটুকু আটকাবে না, ছোড়দি। দিব্যি সুখে-দুঃখে ঘর-সংসার করব।

কথাগুলো সোজা, খুবই সোজা। কোথাও কাব্য নেই, কান্না নেই

ঢাকাঢুকি নেই। কানে শুনতে হয়তো ভাল লাগে না। কিন্তু বাসনা জানে, এই ক'টিমাত্র কথা এবং এমনই সহজ, সরল দু-পাঁচটি কথাতেই একটি জীবনের অনেক কিছু বলা হয়ে যায়। তাদের মতন মেয়ের প্রায় সবই। খুব সত্যি, সাদামাটা বলেই একথা এত কঠিন।

কত যে কঠিন এবং কী ভীষণ শক্ত তা বাসনা যত জানে, জানছে, বুঝতে পারছে, এত আর কে?

বাসনা যদি বলতে পারত—আমি বিধবা হয়েছিলাম, এটা নিছক আকস্মিকতা। দুর্বিপাক, দুর্ভাগ্য। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমি মরে গিয়েছিলাম। আমার শরীর রাতারাতি তার রক্ত মাংস স্নায়ু অনুভূতি সব, সমস্ত হারিয়ে বসেছিল। শরীরের এই সব যদি ইলেকট্রিকের তার হত তবে কোথাও একটা সুইচ নিবলেই সব অসাড় হয়ে যেত পলকেই। মরে যেত। কিন্তু আমার শরীর তা নয়। পরিমল নেই বলে আমার শরীর নিবতে পারে না—রক্ত চলাচল বন্ধ হতে পারে না। এই শরীর খেতে চায়, ঘুমতে চায়, কথা বলতে, ভালবাসতে, ভালবাসা পেতে এবং শরীরের ধর্ম মিলিয়ে আরও অনেক কিছু করতে। সে সব চাওয়াটাই বেঁচে থাকা। সোজা কথায় জীবন। যদি রক্ত-মাংস-মনকে আমি সকাল দুপুর সন্ধ্যে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায়, মাসে বছরে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতে পারি, তারা আমায় সে অনুভূতি অকৃপণের মতন দিয়েই যায়—তবে বলতে দোষ কি, আমি সাদামাটা ভাষায় বীথির মতই চাইব—আমার শরীর এবং মনের নানারকম ইচ্ছে, ছোট বড় কামনা-বাসনা মেটাতে পারার জন্যে, আমায় পূর্ণ করতে একজন পুরুষ দরকার প্রথমত। একজন কেউ স্বামী হোক, একটি সংসার, একটি-দু'টি এবং এসবের মধ্যে হেসে কেঁদে ভালবেসে, ঝগড়াঝাটি করে, মান-অভিমানের পালা সাঙ্গ করে বেশ সুন্দর কেটে যাবে আমার, খুব সুখে, শান্তিতেই। তার বেশি সুখ শান্তি আমাদের জন্যে নয়। আমি চাই না।

অমলেন্দুকে যদি সেই গোড়াগুড়িতেই বাসনা স্পষ্ট করে কথটা বলতে পারত…!

বলতে পারত ? বাসনা নিজের মধ্যে কাউকে যেন প্রশ্ন করতে শুনে চমকে উঠল।

ভয় হচ্ছিল, বিহ্বল হয়ে পড়ছিল, বিড়বিড় করে বলছিল তবু, আমি তাই চেয়েছিলাম ! বোধ হয় তাই।

চাইলাম যদি তবে বলতে পারি নি কেন ? খুব কি কঠিন ছিল ? কিসে আমায় বাধা দিল ?

আর হঠাৎ, বাসনার মনের এই বিস্তীর্ণ মাঠে এক ভীষণ দমকা হাওয়া খেলে গিয়ে কবেকার কোনো জমানো পাতার ডাঁই থেকে একটা পাতা উড়ে এল যেন।

অবাক হয়ে দেখদিল বাসনা। সেই পাতা নয়, একটি দিন। কবে কতকাল আগে ফেলে আসা। তবু আজও কী স্পষ্ট।

মফস্বল শহর। বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা। শ্রাবণের শেষ তখন। আকাশ-মেঘ-দুপুর কালো কালো, বিকেল আলোয় ম্লান। ঘরের বাইরে ভিজে হাওয়া। কদমের গন্ধ। করবী ঝোপের পাতা চিকচিক করছিল। অপরাজিতার লতার লতায় বৃষ্টির ফোঁটা। আর তখন ঝাঁক বেঁধে প্রজাপতি এসে নেমেছিল বাগানে। কত রঙ, কী সুন্দর পাখা. কী চঞ্চল!

বাসনা ঘরের মধ্যে বসে বসে গলা সাধছিল। ভাল লাগছিল না মন উড়ছিল প্রজাপতির ঝাঁকে। হঠাৎ চোখে পড়ল বিজন এসেছে। নীল হাফ প্যান্ট, গায়ে ভেজা গেঞ্জি। প্রজাপতি ধরছে ছুটে ছুটে। ডাকল বাসনাকে। যাবে কি যাবে না একটু ভাবল বাসনা। তারপর বিনুনি এলিয়ে. ফ্রক পর্যন্ত হাঁটু টেনে চুটল। বাইরে।

আর বিজনের সঙ্গে হুড়োহুড়ি লুটোপুটি খামচাখামচি করে প্রজাপতি ধরা। ধরা কি যায় ছাই। বাসনা হয়তো ছুঁই-ছুঁই করছে, বিজন হাততালি দিয়ে উঠল পাশ থেকে। উড়িয়ে দিল।

তবু অনেক কষ্টে-সৃষ্টে ঝিরঝির জলে গা-মাথা ভিজিয়ে কাদা ঘেঁটে একটা প্রজাপতি শেষ পর্যন্ত ধরেছিল বাসনা। আর ঠিক তখনই গেট দিয়ে বাড়ি ঢুকলেন বাবা। দেখলেন এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে।

তারপর হনহন করে ভেতরে।

সঙ্গে সঙ্গেই ডাক। চোর-পায় বাসনা ঢুকল। সেই ঘর। হারমনিয়াম খোলা। বাবা সামনে দাঁড়িয়ে।

'কি করছিলে বাইরে?'

বাসনা চুপ। আলগা মুঠো থেকে প্রজাপতিটা কখন উড়ে গেছে। নীচু মুখে ফ্রকের কাপড় খুঁটছিল। শেষে নখ।

'কি করছিলে বাইরে? বাবা আরও কর্কশ স্বরে ধমকে উঠলেন।

ভয়ে বাসনার বুক-গা কাঁপছিল। কথা ফুটছিল না। কোনো রকমে বলল, অস্পষ্ট গলায়, 'প্রজাপতি ধরছিলাম।'

'প্রজাপতি ধরছিলে। অসভ্য, বেয়াড়া, বদমাশ মেয়ে কোথাকার!' টেবিল ঝাড়া পালক-গোঁজা লিকলিকে কঞ্চিটা তুলে নিলেন বাবা। তারপর—? তারপর সেই বেত হাতে পায়ে গায়ে পড়ে নি, যেন বাসনার অমন সুন্দর বর্ষা-ভেজা ছোট্ট খুশী মনের নরম গায়ে দাগ কেটে কেটে পড়েছে।

সেদিন সারারাত ধরে বাসনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। আর ভেবেছিল, কী অসভ্যতা, কোনটা অসভ্যতা, কিসের বদমায়শী? প্রজাপতি ধরার খেলা, ওই ঝিরঝির বৃষ্টি-ভেজা বিকেলে ছুটোছুটি, অমন সুন্দর করে পা টিপি-টিপি হাঁটা না আর কিছু, অন্য কিছু। অন্য কি হতে পারে? বাসনা তার ছোট্ট মন নিয়ে আকাশ-পাতাল তন্নতন্ন করে খুঁজল। প্রজাপতি আর মেঘ বৃষ্টি ফুল পাতা ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেল না। কাউকে দেখল না খেলার সাথী টুষ্টু বিজন ছাড়া। অসভ্যতা কোথায় ছিল, কিসের মধ্যে, বাসনা জানল না। তবে সেই থেকে সহজ টানে, সহজ ডাকে, চোখের মনের খুশিতে সুন্দর সরল কিছু ধরতে হাত বাড়াতে গেলেই যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠত। হাত বাড়াতে গিয়েও পারত না। আস্তে আস্তে হাত টেনে নিত। মনে হত কে যেন দাঁড়িয়ে আছে পালক-গোঁজা লিকলিকে কঞ্চি হাতে।

ছেলেবেলার সেই দিন আজ হঠাৎ মনে পড়ল। স্পষ্ট ছবি।

কিন্তু কী আশ্চর্য, বাসনা ভীষণ অবাক হয়ে ভাবছিল, সেই

প্রজাপতি ধরার খেলা আর অমলেন্দুকে নির্ভয়ে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে যাওয়া এর মধ্যে সম্পর্ক কোথায় ?

নাকি আছে কিছু ?

।। চৌদ্দ ।।

এখানে সকাল অন্যরকম। হিমকুয়াশা ভেজা ভেজা ফরসাটুকু কাটল তো সেই সূর্য ওঠার মুখেই এক ইঁট-কাঠের পাখির বাসায় বিচিত্র কিচিরমিচির। টুকটাক আলো নিবেছে অনেকক্ষণ। পাশ ফেরাফিরি আড়মোড়া ভাঙা, হাই ওঠাউঠি। পায়ের খসখস তারপর। পাঁচ গলার পাঁচ রকম স্বর। করিডোর দিয়ে বাসি শাড়ি ফুলিয়ে-ঝুলিয়ে, ফোলা চোখ, রুক্ষ চুল মেয়েদের আসা-যাওয়া। টুথব্রাশ আর গামছা, নয়তো মাজন-সাদা দাঁতে আলতো আঙুল দিয়ে ঘোরাঘুরি। অ্যালুমিনিয়ামের গামলা মেঝেতে, বিছানায় বসে বসেই মুখ ধুচ্ছে কেউ কেউ। জল ছড়ছড় শব্দ। জমাদার দড়ি-বাঁধা জল-ফিনাইল ভেজানো পাটের ন্যাতা বুলিয়ে যাচ্ছে মেঝেতে। সকালের দুধ-রুটি বিলি হয়ে গেল।

আজ কোন ভোর থাকতেই উঠেছে বাসনা। ঘুম ভেঙেছে যখন, তখন ফরসাও ফোটে নি ভাল করে। ঠিক মনে পড়ছে না, তখন খুব সুন্দর কী যেন ছোট্ট এক টুকরো স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আর ঘুমোতে পারে নি। শরীরটাও বেশ ভাল লাগছিল। কিছুদিনের মধ্যে এমন ঝরঝরে লাগে নি নিজেকে।

করিডোরের বেসিনে গিয়ে মুখ ধুয়ে এল নিজেই আজ। কী খেয়াল হতে বাসি কাপড়টাও বদলে ফেলল। তারপর কেবিনের বাইরে এসে রেলিংয়ে পিঠ ঠেকিয়ে লেবার ওয়ার্ডটা দেখছিল। লাইন-বাঁধা বিছানা, লাল-কালো কম্বল, ফিনাইলের গন্ধ, মেয়েদের ওঠা-বসা, নার্স নেই কি নেই। ঝি চা বয়ে আনছে কাচের গ্লাসে সিঁড়ি ভেঙে।

বাসনার মনে হচ্ছিল ওরা সবাই যেন এক ওয়েটিং-রুমে রাত কাটিয়ে

জেগে উঠেছে। সবই কেমন এলোমেলো, ছন্নছাড়া। যাই-যাই ভাব সকলের।

ফরসা, একটু রোগা মতন, পানপাতা ঢঙের মুখ, একটি মেয়ে আসছিল করিডোর দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে, আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে। টিয়াপাখি-রঙ শাড়ি গায়ে। যেতে যেতে চোখ তুলতেই দেখল বাসনাকে। থমকে দাঁড়ালো একটু। তারপর আস্তে পায়ে কাছে এসে দাঁড়ালো।

'ও মা, আপনি! এখনও আছেন হাসপাতালে?' ডাগর চোখ আরও ডাগর দেখাচ্ছিল তার। আর কেমন যেন বোকা-বোকা অবাক-চোখে খুঁটিয়ে দেখছিল বাসনাকে।

বাসনা মথা নাড়ল, কথা বলল না—শুধু এক ফোঁটা বোকা-হাসি ঠোঁটে এনে তাকালো। তাকিয়ে থাকল। মেয়েটি কে? কোথায় দেখেছে বাসনা তাকে, মনে করতে পারছিল না এই বা কি করে চিনল বাসনাকে।

বাসনার চিনি-না চিনি-না চোখ-মুখের ভাবটা ধরতে পাবল মেয়েটা। ঠোঁট টিপে হেসে বলল, উলটো-উলটি ছিলাম আমরা—' আঙুল দিয়ে ওয়ার্ডের দূর-কোণের একটা বিছানা দেখালো। 'আপনাকে আমি দেখেছি।' আবার ফিক করে হাসল, 'আমারমাথা পুবে, আপনার মাথা পশ্চিমে। তাকালেই চোখে পড়ত'

বাসনা এতক্ষণে মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝে একটু সহজ হয়ে হাসল

যাক তাহলে আপনি আছেন। মেয়েটি কেমন এক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'প্রথম দিন যা টানা-হ্যাঁচড়া, এই নার্স, এই ডাক্তার, এলাহি কাণ্ডকারখানা—দেখে শুনে আমার তো ভয় লেগে গিয়েছিল। তারপর হুস করে নিয়ে চলে গেল। সেইদিনই। আর দেখা নেই। সত্যি দিদি, রোজই আপনার কথা ভাবতুম।' একটু থেমে বলল মেয়েটি আবার, 'কোথায় আছেন আপনি?'

পাশেই কেবিন! চোখের ইশারায় কেবিনটা দেখিয়ে দিয়ে বাসনা ম্লান হেসে বলল, 'ভেবেছিলেন আমি মরে গেছি, না—'

অপ্রস্তুত হাসি হেসে মাথা নীচু করল মেয়েটি। 'এখানে যা দেখি কাণ্ড কারখনা, ভাল-মন্দ ভাবা কিছু আশ্চর্যের নয়।

'তা ঠিক।' বাসনাও নিশ্বাস ফেলল।

কথার মোড় ফেরালো মেয়েটি।

'আপনার ওটা আলাদা ঘর, না?'

'হ্যাঁ, কেবিন'

'বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, না?'

'মন্দ না। আসুন না আমার ঘরে।'

'এখুনি? আচ্ছা আসছি—একটু পরে আসব। কী ভেবে এদিক-ওদিক চেয়ে বলল ও। বলে হাসল সামান্য। তারপর তরতর করে চলে গেল করিডোর বেয়ে।

মেয়েটিকে বড় ভাল লাগল বাসনার। চেনা-জানা দেখাশোনা নেই। এল আর গেল। ঝরঝর করে কথা বলল একরাশ। কিন্তু তাতেই এই মেয়েটির মিষ্টি স্বভাব প্রকাশ হয়ে পড়ল। বড্ড যেন মায়া ওর। দেখতেও বেশ। যদিও একটু রোগা। হয়তো বাচ্চা হতে এসে এত রোগা হয়ে পড়েছে। বয়স তো কমই। বছর বাইশের বেশি বলে মনে হয় না।

আরও একটু দাঁড়িয়ে থেকে বাসনা নিজের কেবিনে চলে গেল।

মেয়েটি এল প্রায় ঘণ্টাখানেক পারে। বাইরে প্রথম শীতে রোদ তখন কাচের মতন ঝকঝকে, আকাশ নীল। কোথাও কাক ডাকছে। ট্রামরাস্তা থেকে ভেসে আসছে মাঝে মাঝে ঘড়ঘড় শব্দ। মোটরের হর্ন।

বিছানায় বসে বসে বীথির দিয়ে যাওয়া মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল বাসনা। ওকে দেখে কাগজটা কোলে নামিয়ে হাসল গালভর্তি করে। মেয়েটিও।

প্রথমে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক ভাল করে চেয়ে চেয়ে, তারপর পা-পা করে জানলা পর্যন্ত এগিয়ে, ঘরের এপাশ-ওপাশ হেঁটে হেঁটে খুব যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। টুলটার কাছে এসে বলল 'বেশ ভাল ঘর। মনেই হয় না হাসপাতাল।' বসল ও। বাসনার মুখে চোখ

রেখে বিষন্ন একটু হাসি হাসল, টাকা থাকলে কত সুখ। না—?'

অপ্রস্তুত, লাগছিল বাসনার। লজ্জা করছিল। মুখ ফিরিয়ে অন্য কথা পড়ল।

'নামটি কি ভাই তোমার?' আপনি বলতে আটকাচ্ছিল বাসনার, 'তোমাকে আর আপনি বলতে পারছি না।'

'কে বলেছে বলতে। আমার নাম পূর্ণিমা। আমরা কায়স্থ। বসু।' পূর্ণিমা বলছিল, 'বাগবাজারের এক হদ্দ গলিতে থাকি, দিদি। কী নোংরা—কী নোংরা। চন্দ্র-সূয্যির মুখ দেখতে পাই না। বর্ষায় বাড়ির সদর দিয়ে জল ঢোকে। যত রাজ্যের নর্দমার জল। জল। শীত কালে তেমনি ঠাণ্ডা।'

এরপর, জবাবে বাসনাকে বলতে হল তার বাড়ির ঠিকানা। নাম, পদবীও। পদবীটা বলার সময় হঠাৎ কি মনে করে ভীষণ একটা সাহসের কাজ করে বসল বাসনা। বললে, মিত্র—। আর এমন ভাবে বলল যেন সমস্ত লুকোচুরি আজ সে টান মেরে ফেলে দিয়ে সাহসে ভর করে সত্য কথাটাই বলল। সত্য পরিচয় দিল।

বেশ একটা গর্ব হচ্ছিল বাসনার হ্যাঁ স পেরেছে। এই তো পারল। ভয় করল না তার।

পূর্ণিমা ততক্ষণে গুছিয়ে বসেছে। পাড়া বেড়াতে এসে আসন বিছিয়ে গল্প করতে বসার মতন অলস ভঙ্গি। বাসনার দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ ফিক করে হেসে বলল, 'একটা কথা বলব, দিদি? কিছু মনে করবেন না তো!

গল্প করতে বসার মতন অলস ভঙ্গি। বাসনার দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ ফিক করে হেসে বলল, 'একটা কথা বলব দিদি? কিছু মনে করবেন না তো!'

'বলো।' বাসনা এর হাবভাবের চাপল্য দেখে বলল।

'আপনি এদলে কেন?' বলে পূর্ণিমা তার চোখ নিয়ে নিজের অধঃ অঙ্গ দেখিয়ে আবার হাসল।

পলকে ব্যাপারটা বুঝে নিল বাসনা। সমস্ত মুখ লজ্জায় লাল হয়ে

উঠল। কানের ডগা গরম। নাক ঠোঁট জ্বালা-জ্বালা করছিল। ভীষণ অস্বস্তি উত্তেজনায় আর রাগে মাথায় শিরা দপদপ করে উঠল। বুকটাও ধক্-ধক করছে।

'আমার অসুখ!' মাথা হেঁট, চোখ নীচু; বাসনা কোনো রকমে বলল। সময় নিয়ে।

'ও!' অবাক সুরের সহজ একটা টান দিয়ে ডাগর চোখে চেয়ে থাকল পূর্ণিমা। বলল একটু পরে, 'আমিও অমনি কিছু ভাবছিলুম।' একটা হাত এগিয়ে তার এ-পিঠ ও-পিঠ দেখালো, 'বুঝলেন দিদি, আমাদের মেয়েদের এমনি সব—, এর এ-পিঠ ও-পিঠ দুই-ই সমান। কোথাও ছাড় নেই। এই ধরুন না আমার কথা। এই নিয়ে তিন হল। ছ-মাস পর্যন্ত ধরি—তারপরই ফল নষ্ট। আর ভাল লাগে না। এত কষ্ট। ডাক্তার-বদ্যি আগেরবারও করেছি। বাঁচাতে পারি না। এবারও করছি। আমার ভরসা হয় না। এও নাকি এক অসুখ।

পূর্ণিমার গলা ভিজে-ভিজে লাগছিল না। বরং খুব রুক্ষ, একটু বা ধার-ধার শোনাচ্ছিল। বাসনা চোখ না তুলে পারল না।

বাইশ বছরের ফরসা মেয়ে রোদপড়া কাচের মত ঝকঝকে চোখ নিয়ে তাকিয়েছিল ঠোঁটের একটা পাশ সামান্য একটু বাঁকা।

বাসনা এখনো সেই অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে পারে নি। আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। কোল থেকে মাসিক পত্রিকাটা তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতে শুরু করল।

পূর্ণিমা খানিক চুপ থেকে বলল আবার, 'আসলে এ-রোগ ছিল ওঁর, আমার নয়। খুব ভালবাসেন কিনা, ভাগ দিয়েছেন।' টুল সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো ও, শাড়ির আঁচলটা কাঁধে তুলে ঠোঁট কামড়ে তাকালো। অদ্ভুত এক চিকন গলায় বলল, 'পুরুষ মানুষের মতন ঠগ জোচ্চোর আছে নাকি! আগে জানলে—'কথাটা আর শেষ করল না পূর্ণিমা। সারা মুখ বিকৃত করে চলে গেল।

ভালই হল। স্বস্তি পেল বাসনা। যতটা ভাল ভাল লাগছিল প্রথমে, পূর্ণিমার ছাইভস্ম বোকার মতন সব প্রশ্ন শুনে, সেই ভাল লাগার

রেশটা ফিকে হয়ে গেছে। বাসনা ক্রমেই কেমন জড়সড় আড়ষ্ট গম্ভীর হয়ে আসছিল। আরও খানিক থাকলে আর না-জানি কি বলত মেয়েটা. অবাক অবাক প্রশ্ন করে বসত।

মাসিক পত্রিকাটা তুলে নিয়ে এবার শুয়ে পড়ল বাসনা। পাতা উলটে উলটে গল্পটা বের করল। সবেই শুরু করেছিল তখন। একটা পাতাও পুরো পড়া হয় নি।

মন বসছিল না। কয়েক লাইন পড়ার পরই সরে আসছিল, দৃষ্টি এবং মন। কালো কালো ক্ষুদে অক্ষরের জড়াজড়ি অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

এবং এখন হঠাৎ কানে আসছিল--কা'ছেই, খুব সম্ভব মেটারনিটি ব্লকের সামনে বটগাছের ডালে বসে একটা ঘুঘু ডাকছে।

পত্রিকাটা একপাশে সরিয়ে রেখে শুয়েই থাকল বাসনা। চোখ ওপরে তুলে। ঘুঘুর ডাক শুনতে লাগল।

তারপর আস্তে আস্তে সব থিতিয়ে নিজের ভাবনাই ভেসে উঠল।

বাসনা ভাবছিল, পূর্ণিমার কাছে আমি খুব সাহস দেখিয়েছি ভাবছিলাম। ওকে বলেছি, আমি মিত্র, আমার নাম বাসনা মিত্র। অর্থাৎ কি না অমলেন্দুর স্ত্রী আমি, এ-কথা যদিও সরাসরি নয় তবু এক রকম আমি তা স্বীকার করেছিলাম। আর নিজের ওপর আমার বিশ্বাস বাড়াছিল, ভাল লাগছিল। কিন্তু তারপর আমি, অন্য কথায় এত বেশি লজ্জা পাওয়া আমার উচিত ছিল না। তখন, সে-সময় আমার মধ্যে বাসনা মিত্র যদি এক ফোঁটাও তবে পূর্ণিমার বোকামিতে শুধু হাসতুম, হাসাই উচিত ছিল। অথথ কী অস্বস্তি আর বিশ্রী লেগেছে সে-কথা। যেন আমার নোংরামি, আমি নোংরা একটা কাজ করেছি লুকিয়ে-চুরিয়ে আর তাই নিয়ে কেউ ঠাট্টা করছে—আমার খারাপ ভাবছে—এই আমায় মনে হয়েছিল। কোনো সধবা মেয়ে যে-কথা গ্রাহ্যও করবে না, শুনলে বরং রঙ্গরসের হাসিই হাসবে সেই কথায় আমি অত্যন্ত নিষ্ঠাশীলা বিধবা মতন লজ্জায় সঙ্কোচে আরষ্টতায় রাগে কঠিন হয়ে গিয়েছিলাম। অসহ্য রাগও হয়েছিল তখন। আশ্চর্য।

আমি বিধবা নই এ-কথা অন্তত পূর্ণিমার সামনে বসে অনায়াসে ভাবতে পারতুম আমি। ভাবলে ক্ষতি ছিল না। অন্তত মনের দিক থেকে মিথ্যাচারণ করা হত না।

বাসনার খারাপ লাগছিল। বেশ বুঝতে পারছিল ও, এখনও বীথির মতন তার মন, তার কথা, ইচ্ছা, অভিলাষ স্পষ্ট এবং সহজ হতে পারে নি। তা সরল নয়। এখনও কোথায় যেন একটা চুপ-চুপ লুকোচুরি, আড়াল-আড়াল ভাব রয়ে গেছে।

হতাশ হয়ে পড়েছিল বাসনা, অশ্রদ্ধা হচ্ছিল নিজের ওপর। দু'হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে কোনো কিছু গ্রাহ্য না করে যখন আমি এগিয়ে যেতেই চাচ্ছি তখন এই লুকোচুরি কেন?

আর পূর্ণিমার শেষ কথাটাও মনে পড়ছিল এবার।

বাসনা যেন পূর্ণিমাকে বলছিল এবার, পুরুষরাই শুধু কথা লুকোয় না ভাই—আমরাও লুকোই। আমিই লুকিয়েছি। আমার কথা, আমার মন, মনোভাব সবই আমি লুকিয়েছি।

কথাটা মনে পড়লেই, বাসনা দেখেছে, বিশ্রী রকম এক গ্লানিতে তার সারা মনটাই কুঁকড়ে আসে। দিনে দিনে সেটা আরও বাড়ছে, আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে। এখন মনে হয়, এও একরকম শঠতা। তোমায় যখন ভালবাসিনি এবং অত্যন্ত ইতর, ধূর্ত বলে ভেবেছি—তখন আমার তরফ থেকে এই সজ্ঞান শঠতা আমায় বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে নি। সেই মন, মনোভাব, আর আমার স্নেহ, ধারণা পালটে গেছে। কী ভেবেছি তখন আর এখন কী দেখছি! ছি—ছি! নিজের কাছে নিজেই এখন লজ্জায় মরছি। অনুশোচনায় পুড়ছি।

অমলেন্দুকে আমার সব কথা বলে নেওয়া উচিত। কি ভাবতাম তাকে, কেন ভাবতাম, কেনই বা বিয়ে করেছিলাম। ওর সঙ্গে আমার এখন যা সম্পর্ক তা ভালবাসার। স্বামী-স্ত্রীর। এই সম্পর্কের মধ্যে লুকোচুরি, মন চাপাচুপি থাকা উচিত নয়।

তা ছাড়া, বাসনা ভাবছিল, বলা যায় না—হয়তো এই হাসপাতালই আমার শেষ বিছানা হল। নতুন করে ঘর বাঁধা গেল না, সুযোগই পে

না বাসনা। তখন সেই শেষ মুহূর্তেও এই অসহ্য চিন্তা আর অনুশোচনা আমায় তুষের আগুনে পুড়িয়ে মারবে যে,—ভালবাসার ভান করে তোমায় আমি ঠকিয়েছি। শঠতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না আমার। আর কিছু না। কিন্তু এ-কথা সত্যি নয়। একসময় ছিল, যখন এ-সব ভেবেছি। ভুল করেছি। অথচ এখন, বোঝানো মুশকিল, বলাও যে কি করে সম্ভব বুঝি না—তোমায় আমি কী গভীর ভালবেসে ফেলেছি অমলেন্দু। এমন করে কাউকে ভালবাসা যায়, আমি যেন এই জানলাম, অনুভব করলাম।

মনে মনে এবার আশ্চর্য এক আবেগ অনুভব করছিল বাসনা। মনের মধ্যে কিসের এক ভাব টলমল করছিল, উপচে উঠছিল বুকের মধ্যে। অজস্র কথা, এক নরম বিষন্নতা। ব্যাকুলতা।

বাসনার মনে হচ্ছিল কোনো পবিত্র এবং শুদ্ধ এক আবেগ তাকে মাটি থেকে উঁচুতে তুলে নিয়ে যেতে চাইছে। এর অনুভূতি এত শান্ত, বিশুদ্ধ এবং গভীর যা কথায় বলা যায় না।

এর আনন্দ অন্য ধরনের। যদিও তা কাউকে বোঝাবার নয় তবু বলতে ইচ্ছে করে কিছু কিছু। হ্যাঁ, বলতে ইচ্ছে করে, এই সাধারণ আকাঙ্ক্ষা কী অসামান্য, কত একান্ত। তোমার আমার ভালবাসায় আমরা কেউ কারুর থেকে বিচ্ছিন্ন নয় কোথাও। সকালের শিশির-ভেজা সবুজ ঘাসের মত আমি আছি, আর আমার মধ্যে অদৃশ্য জীবনের মতন তুমি আছ, প্রতি মুহূর্তে আমার আয়ু ও বর্ণকে প্রাণবন্ত করে চলেছ। কিংবা তুমি যদি ফুল হও—তোমার জীবন যখন দল খুলে খুলে ফুটছে, আমি তোমার মধ্যে মিশে থেকে পরাগ গন্ধ বিলিয়ে যাচ্ছি, পাপড়ির গায়ে গায়ে রঙ এঁকে চলেছি। এমনি ঘনিষ্ঠ ও একাত্ম হতে হবে, না হলে ভালবাসা কী।

রোদের মধ্যে বাতাস মিশে থাকার মতন যদি না তুমি আমি মিলে-মিশে একাকার হতে পারলাম তবে মেঘের রঙ ফুটবে না। আর যদি না ফোটে তবে বুঝব আমরা দু'জনে শুধু খাওয়া পরা শোয়ার জন্যে, কিছু কিছু সুখ-সুবিধে ফুর্তির জন্যে স্বামী-স্ত্রী।

ভগবান, স্বর্গ, আরও বড় শান্তি, অন্য বড় সুখে আর আমার রুচি নেই, বিশ্বাস নেই। আমি সাধারণ একটি মেয়ে, তুমিও সাধারণ এক পুরুষ। আমি সুন্দর করে তোমায় ভালবাসতে চাই, তুমিও তেমনি করে আমায় ভালবাস। এর জন্যে আমায় ভাল হতে হবে, পবিত্র এবং শুদ্ধ হতে হবে। সহজ, সরল এবং সুন্দর হতে হবে মনে, প্রাণে। কোথাও যেন না মালিন্য থাকে ; ভীরুতা বা সঙ্কোচ। আকাশ-গঙ্গার জলবিন্দুর মতন আমায় নির্মল, বিশুদ্ধ হতে দাও, জীবানুমুক্ত।

বাসনার মন আর হাসপাতালের কেবিনে ছিল না। গভীর এক আবেশে আর আবেগে এই মন শীতের রোদ ডিঙিয়ে ট্রাম লাইন ছাড়িয়ে, ভিড় কোলাহল কাটিয়ে কোথাও যেন অমলেন্দুর গা-মন ছুঁয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সারা দুপুর সেই আশ্চর্য সুন্দর আবেগ-আবেশ থরোথরো মন নিয়ে বাসনা চুপ করে শুয়ে থাকল।

অপেক্ষা করছিল কখন বিকেলের ঘণ্টা পড়বে—অমলেন্দু আসবে। একা অমলেন্দুই শুধু। আজ আব কেউ নয়, কেউ আসছে না। আর কখন, কতক্ষণে অমলেন্দুর নিশ্বাসের বাতাস গায়ে মেখে, মৃদু গলায় এক এক করে সব কথা বলবে বাসনা। সব—সমস্ত কথা।

।। পনেরো ।।

আসতে একটু দেরিই হল আজ অমলেন্দুর। ভিজিটিং আওয়ার্সের ঘণ্টা পড়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। বিছানায় আধশোয়া হয়ে বাসনা শুনছিল পায়ের শব্দ আর জুতোর খসখসানি বাড়ছে, কথা আর কলরব। মাঝে মাঝে হাঁক-ডাক।

অমলেন্দু এই এসে পড়ল বলে, এখুনি পরদা সরে ওর মুখ ভেসে উঠবে। বাসনা আর কোনোদিকে নয়, পরদার দিকে একদৃষ্টে চেয়েই ছিল। প্রায় যতক্ষণ পারে, আর ভাবছিল, প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল

রদার ওপাশে অমলেন্দু এসে দাঁড়িয়েছে, মুখ বাড়িয়ে দেবে এখুনি।

কিন্তু অমলেন্দু আসছিল না। বাসনা ধৈর্য হারাচ্ছিল। াজকের দিনেই যত দেরি ওর। অন্যদিন হলে কথা ছিল না। কিন্তু ধাময় কমলা এমনকি বোধ হয় বীথিও যখন আসছে না আজ, তখন ই সময়ের যে কী মূল্য তা অমলেন্দুরও বোঝা উচিত। এমন সুযোগ াসপাতালে নাও পেতে পারে ওরা এরপর।

ধৈর্য ফুরিয়ে গেলে বাসনা যখন দুশ্চিন্তা শুরু করেছে, অমলেন্দু এসে াজির!

এতক্ষণ যেন মুখটা অন্ধকার হয়েছিল বাসনার, এবার দপ করে জ্বলে ঠল। খুশির আলোয় ঝলমল করে উঠল। 'এত দেরি?' শুধলো াসনা। কথাটা বলার পর, ভিজিটিং আওয়ার্সের কতখানি সময় পবিয়ে গেছে তা যেন মনে পড়ে গেল এবং বাকি সময়টুকুর হিসেব বতে গিয়ে খুশির আলো ম্লান হয়ে এল খানিক।

আজও ফুল এনেছিল অমলেন্দু। ফুল এবং কিছু ফলও। ওভালটিন ক কৌটো।

মিটসেফের মধ্যে ফল, ওভালটিন রাখতে রাখতে জবাব দিল মমলেন্দু,

'বলো না আর। যত তাড়াতাড়ি বেরুতে চাই ততই একটা ন্যাকড়া জোটে।'

মিটসেফ বন্ধ করে—ওপর থেকে কাচের গ্লাসটা তুলে নিল। আগের ফুলগুলো শুকিয়ে এসেছে। সেগুলো সরিয়ে একটু জল ছিটে দিয়ে তুন ফুল রাখতে রাখতে বলছিল অমলেন্দু, 'কলেজ থেকে পালাই-পালাই করছি, ডাক পড়ল প্রিন্সিপ্যালের ঘরে। সেখানে ছোট-খাট এক মিটিংই প্রায়। উঠতে কি আর পারি!'

'কলেজ থেকেই সোজা আসছ?'

'হ্যাঁ আগের মোড়ে বাজারের কাছে নেমে এগুলো নিয়ে নিলাম। একটা ফুল, সাদার ওপর বেগুনি ছিট দেওয়া নরম ছোট্ট ফুল টুপ করে বাসনার কোলে ফেলে দিয়ে টুলে এসে বসল অমলেন্দু। 'কেমন

আছ আজ ?'

'ভাল, বেশ ভাল।' বাসনা কোল থেকে ফুলটা তুলে নিয়ে নাকের কাছে ধরল একটু, 'দেখতেই যা, একটু গন্ধ নেই।' ফুলটা গালে-গলায় আলতো করে বুলিয়ে নিচ্ছিল বাসনা, 'তুমি আসছ না, দেখে দেখে আমি শেষ পর্যন্ত ভাবনায় পড়েছিলাম।'

'দূর আজ আমাকে আসতেই হত, কমলাবউদিরা কেউ আসবে না।' অমলেন্দু বলল, 'কালই তো কথা হয়ে গেল।'

হাতের ফুলটা একটু সরিয়ে ভুরু-ছোঁয়া চোখ করে বাসনা ঠোঁট টিপে হাসল, 'শুধু সেই জন্যেই এসেছ ?' একটু থেমে আবার, 'কেউ আসবে না—তাই শুধু খোঁজ-খবর নিতে ?'

অমলেন্দু বাসনার এই মিষ্টি মধুর ভঙ্গিটা দেখছিল। এই কৌতুক, ঝকমকে ভাবটা।

'উপস্থিত'—অমলেন্দু একটু গম্ভীর হয়ে হতাশ গলায় ঠাট্টা করে। বলল, 'উপস্থিত তো শুধু খোঁজ-খবর নিতেই আসা। তার বেশি নিতে পারছি কই ?'

'তা তো ঠিকই।' বাসনা যেন অন্যপক্ষের হয়ে অমলেন্দুকেই পরিহাস করে সান্ত্বনা দিচ্ছে—তেমন সুরে বলল, 'গোটা লোকটাকেই যার নিয়ে যাবার কথা।

'ওই কথাই, কাজে আর হচ্ছে না।' এবার অমলেন্দু সত্যিই ক্ষোভের সুরে বলল।

সঙ্গে সঙ্গে না হলেও একটু পরে অমলেন্দুর দিকে চেয়ে নিবিড় আবেশে বলল বাসনা, 'এবার হবে। সত্যিই হবে। আর তো ক'টা দিন।' থামল একটু, 'তুমি ভেব না আমি এখানে খুব সুখে-শান্তিতে আছি। তোমার জন্যে এখন আমার রোজ ভাবনা।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে অমলেন্দুরও কেমন আবেশ লাগছিল। বাসনা চোখ নামিয়ে নিলেও তাকিয়েছিল। এবং দেখছিল বাসনাকে। ক্লান্ত অসুস্থ মুখেও কেমন এক মধু-মোহ ফুটে উঠেছে।

'ভাল হয়ে তোমার সঙ্গে নিজের জায়গাটিতে পৌঁছতে পারলেই

আমি বাঁচি। আর আমার অন্য সাধ নেই। সবুর করতেও ইচ্ছে করে না। বাসনা মুখ নীচু করে নোখ দিয়ে ফুল খুঁটছিল।

শীতের শেষবেলার অন্ধকার আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে আসছে। আবছা-আবাছা ঘর, দেওয়াল, বিছানা। মুখ দু'টোও খুব স্পষ্ট নয়। একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়াও যেন আসছে। বাইরে থেকে বিচিত্র গুঞ্জন। বাতি জ্বলেছে করিডোরে।

চুপ। ঘর চুপ। দু'টি মানুষ কাছাকাছি বসেও যেন দূরে দূরে।

বাসনা ভাবছিল। কথাটা এবার শুরু করা দরকার। এখনই। এই নিস্তব্ধতা এবং অস্পষ্টতার মধ্যে। এরপর সময় ফুরিয়ে যাবে। এই মন, এই আবেগও হয়তো কোনো ঠুনকো কারণে ছিঁড়ে যাবে, ছিঁড়ে যেতে পারে। বাধাও আসতে পারে।

তোমায় একদিন একটা কথা বলব বলেছিলাম মনে আছে?' বাসনা ছোট্ট করে একটু কেশে শুরু করল কথা। মৃদু গলায়।

'হ্যাঁ, কিন্তু বললে না তো?'

'সময় পেলাম কই। বাসনা পিঠের পাশ থেকে বালিশটা সরিয়ে মাথায় ভর করে বসল। পা টান, চাদরটা কোল পর্যন্ত টানা।

একটু চুপ। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে খুব সহজ গলায় শুধলো বাসনা, আচ্ছা, সেদিন—সেই যে যখন তুমি আমাদের বাড়িতে থাকতে, একদিন মাঝরাতে ঘুম আসছিল না আর মাথা-টাথা ধরে কষ্ট হচ্ছিল বলে আমায় একটা ওষুধ দিলে না খেতে—'

অমলেন্দু মনে করবার চেষ্টা করছিল। বেশ অবাক হয়েই। মনে পড়ছিল না।

'মনে পড়ছে না। বাসনা একটু অপেক্ষা করে শুধলো।

'না। ঘুম হচ্ছে না বলে কি ওষুধই বা খেতে দেব। মাথা ধরলে অ্যাসপ্রিন, ঘুম না হলে ব্রোমাইড্। কিন্তু কেন, হঠাৎ এমন আজগুবি কথা তোমার মনে এল কেন?

'আমাকে তুমি একটা জল-জল ওষুধ দিয়েছিলে। কি বিশ্রী খেতে।'

'ব্রোমাইড দিয়েছিলাম আরকি। আমার কাছে সব সময় থাকে।

খুব খাই। ঘুম না এলেই। অভ্যেসটা খারাপ!' অমলেন্দু লঘু স্বরে বলছিল।

'এখনও খাও?'

'হ্যাঁ। তোমার জন্যে তো ঘুম বন্ধই প্রায়। ব্রোমাইডেও কুলোচ্ছে না। অমলেন্দু হাসল। 'তা, এখনও কি তোমার সেই ওষুধ দরকার নাকি?'

'না।' বাসনা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল। একটু পরে, 'সেদিন আমি কিন্তু অসাড়ে ঘুমিয়েছিলাম, দরজা খোলা রেখেই। কোনো হুঁশ ছিল না।'

'ডাক্তারীটা ভালই হয়েছিল তাহলে।' অমলেন্দু হাত বাড়িয়ে বাসনার বালিশটা ঠিক করে দিল।

'কিন্তু আমি কি ভেবেছিলাম জান, বোকার মতন! ইস্—!' নীচের চিবুক নামিয়ে দাঁতে-জিবে একটা অনুশোচনার শব্দ করল বাসনা। তারপর অমলেন্দুর হাতটা ধরে রাখল মুঠো করে।

সময় যেন ভারি হয়ে আসছিল। অন্ধকার ঘন হচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে ঘরে। কলরব থেমে এসেছে বাইরে। জানলার বাইরে একটু বুঝি বা কুয়াশা। বটগাছে পাখি ফেরা সন্ধ্যের কিচির-মিচির থেমে এল। ঘণ্টা পড়ে গেছে - তবু আজ আর এখনই উঠে যেতে দিল না বাসনা।

সে বলছিল তার কথা, সে যা ভেবেছিল তখন নিজের সম্পর্কে অমলেন্দুর সম্পর্কে। কী সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিল বাসনা —কেন ভয় পেয়েছিল এবং অমলেন্দুকে তার সন্দেহ হচ্ছিল। সেই সন্দেহ আস্তে আস্তে বদ্ধমূলই হল প্রায়। তখন তার ব্যবহার বদলেছে। তার সন্দিগ্ধ কুটিল মনের বিশ্রী সব চিন্তা আর বিরাগ আর শঠতার কথা বলল ও। এবং এই বিয়ে, হঠাৎ ভালবাসার ভান আর রাতারাতি বিয়েই বা কেন করে বসল অমলেন্দুকে, কি উদ্দেশ্যে! তারপর কমলারা এল। হাসপাতাল! ডাক্তার। বাসনার মনের এক বিরাট অন্ধকার যবনিকা কেমন করে যে উঠে গেল। এবং যখন ও একা—অসহায়

তখন সেই অন্ধকার সরিয়ে কেমন করে চিনতে পারল ওর জন্যে একটি সুন্দর নক্ষত্র কত উজ্জ্বল হয়েই না জ্বলছে। যা এতদিন চোখে পড়ে নি। দেখেও দেখে নি। আর হ্যাঁ, বীথির কথাও বলল বাসনা। বীথির সেদিনের সেই কথাগুলোও। এমনকি আজ পূর্ণিমার কাছে সে যা বলেছে, পূর্ণিমার সামনে বসে, সে যাওয়ার পরও যা-যা ভেবেছে—সব সমস্ত কথা।

কিছুই লুকোচ্ছিল না বাসনা। লুকোতে চাইছিল না। তার আবেগ আজ অনুশোচনায় শুদ্ধ করতে চাইছিল। শুদ্ধ এবং পবিত্র। ভালবাসার আগুন তার খাদ গলিয়ে-পুড়িয়ে সোনাটুকুকে নিরেট, উজ্জ্বল, মূল্যবান করতে চাইছিল।

বাসনা আরও একবার কাঁদল, ফুঁপিয়ে নয়, শান্ত আবেগহীন অনুচ্ছ্বসিতভাবে। বলল থেমে থেমে, 'এটা আমার কথা। এত কথা আমি একলাই শুধু ভেবেছি একদিন। তোমায় বললাম সব।

চুপ। তারপর কেবিনের অন্ধকারে সমস্ত চুপ। সব যেন কাঠ। দু'টো মানুষ দু'টো ছায়ার মতন একটু তফাত হয়ে বসেছে, দু'জনের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ উঠছে। দীর্ঘনিশ্বাসেরও অমলেন্দু হাত সরিয়ে নিয়েছে অনেকক্ষণ। বাসনা বুকের ওপর নিজের দু'টি হাত পেতে রেখেছে।

এত গুমোট, এই অন্ধকার, নিস্তব্ধতা আর আড়ষ্টতা যেন আর সহ্য করতে পারছিল না অমলেন্দু।

উঠল টুল ছেড়ে। দীর্ঘনিশ্বাসটা নিজের কাছেই কেমন যেন অদ্ভুত শোনালো। বাতিটা জ্বালিয়ে দিল।

ধক্ করে একরাশ অসহ্য উদ্বেগ যেন এতক্ষণে বাসনার মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বাসনা ভাল করে দেখবার চেষ্টা করছিল অমলেন্দুকে। কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বিস্ময়ে সংশয়ে আশায় আশায়।

অমলেন্দুও তাকিয়েছিল। দেখছিল বাসনাকে।

আর এখন, বাসনার মনে হচ্ছিল, অমলেন্দুর কালো মুখের সমস্ত কোমলতা মুছে গিয়ে একটা বিরক্তি, হতাশা, ক্ষোভ আর বেদনা পুরু

হয়ে জমে গেছে।

অমলেন্দুর চোখে বাসনার সুশ্রী, ধবল, আয়ত চক্ষু, ম্লান, বিষণ্ণ ওই মুখের যেন আর অন্য একটি অর্থ ধরা পড়ছিল।

·অমলেন্দু মুখ নীচু করে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াচ্ছিল।

,যাচ্ছ?' বাসনা যেন অনেক দূর থেকে প্রশ্ন করল। এত ক্ষীণ শোনালো গলা।

হ্যাঁ, যাই।' অমলেন্দু জুতো দিয়ে মেঝে ঘষে একটা শব্দ করল।

একটু চুপ।

'কিছু বললে না? বাসনা ভিক্ষে চাওয়ার মত সুর করে বলল।

'কি বলব!'

'কিচ্ছু নেই বলার?'

'তেমন আর কি! তবে হ্যাঁ, তুমি ভেবে দেখ—এটা কেমন লাগে। এই অবস্থাটা।'

'আমি তা বুঝতেই পারছি। তোমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল!'

'মন?' অমলেন্দুর পুরু ঠোঁটের পাশে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বিদ্রূপ কুঁচকে উঠল, 'যাকে তুমি একটা পাকা লম্পট দুশ্চরিত্র পুরুষ ভাবতে, তার মন সম্পর্কে এখন একটু বাড়াবাড়ি রকমের সহানুভূতি দেখাচ্ছ।'

বাসনা ভীষণভাবে চমকে উঠল! সমস্ত মুখটা সাদা হয়ে গেছে। এ যেন অন্য এক অমলেন্দু কথা বলছে।

'ছি-ছি, এ তুমি কি বলছ?' বাসনা শিউরে উঠে ঝুঁকে বসতে বসতে কাঁপা অবশ গলায় বলল।

'নিজের কথা তো নয়, তোমার কথাই বলেছি।' অমলেন্দু পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে একটু যা সময় নিল। তারপর কেবিনের বাইরে।

বাসনার চোখের সামনে কেবিনের বাতিটা হঠাৎ যেন নিবে গেল! দেওয়াল, পরদা—সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে দৃষ্টিটাকে ঝাপসা করে তুলছিল।

॥ ষোলো ॥

হাসপাতাল থেকে সরাসরি বাড়ি। ট্রাম বাস ভিড় আলো শব্দ যেন একটা ঢেউ হয়ে মাথার ওপর ভেঙে পড়ছিল। দেখতে না দেখতে বুঝতে না বুঝতেই হুস্ করে বয়ে গেল এবং বেহুঁশ বিভ্রান্ত একটি মনকে সেই গ্রাস থেকে তুলে আনতে যে সময়টুকু লাগল তত সময়ে নতুন বাড়ির দরজার কাছে এসে পেঁীছে গেছে অমলেন্দু।

বাতিজ্বালা পিড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে একবার শুধু মনে হল, এত অন্যমনস্ক হওয়া তার উচিত হয় নি। কলকাতা শহরের গাড়ি ঘোড়া ট্রামবাসের গিজগিজ ভিড়ে আরও সুস্থির মনে পথ হাঁটা উচিত।

সুস্থির···! কথাটা মনে আসতে একটু হাসি পাচ্ছিল অমলেন্দুর। এখন এ-সময়ে যেন একটা টিটকরির দাঁত বসে গেল—এই শব্দটাই।

ঘরে ঢুকে বাতিটা জ্বালল অমলেন্দু। এটা তার, তাদের—তার এবং বাসনার শোবার ঘর হিসেবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা ছিল। দু'জন শোবার মতন একটা খাট। সেই মতন বিছানা। পাশাপাশি দু'জোড়া বালিশ, বেডকভার। আর জানলার দিকে বাসনার জন্যে ছোট মতন একটা ড্রেসিং টেবিল। এককোণে হাত-প্রমাণ লেখার টেবিলও একটা। আরও সামান্য কিছু টুকটাক। চেয়ার, গদি আঁটা বেতের মোড়া, এমনি সব।

প্রথম কয়েকটা দিন—এঘরে না শুয়ে পাশের ঘরে, পড়াশুনা এবং বসার ঘরে অমলেন্দু শুয়েছিল। ভেবেছিল বাসনা এ-বাড়িতে আসার পর ওরা দু'জনে এই ঘর এই বিছানা ব্যবহার করবে এক সঙ্গে। নেহাতই একটা খেয়াল হয়েছিল এবং সেই খেয়ালের পিছনে বেশ একটা ছেলেমানুষী মন গুনগুন, চমক দেওয়া, চমক সওয়া, উচ্ছ্বাসময় সুখ-সুখ ভাব ছিল। অবশ্য পরে—বাসনার জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারে নি অমলেন্দু। হাসপাতাল থেকে কবে ফিরবে বাসনা—কতদিন পরে—ততদিন ধরে এই ছেলেমানুষী রোমাঞ্চ কি শিহরণ কি সুখের গন্ধ রাখা যায় না। এই বয়সে। অনেকক্ষণ ধরে নাকের কাছে ফুল ধরে থাকলে যেমন গন্ধ ফিকে হয়ে মারা যায়।

ঘর এবং বিছানা ব্যবহার করতে শুরু করেছিল অমলেন্দু—বাসনার জন্যে বিছানায় জায়গা ছেড়ে জোড়া বালিশ আলাদা ভাবে পাশটিতে সাজিয়ে রেখে।

আজ ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালতেই সেই যুগলশয্যা যেন এক-চাদর নিশ্চ্‌প উপহাস নিয়ে হেসে উঠল।

অমলেন্দু ক'টি মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল। দেখল তাকিয়ে।

আর তারপর আশ্চর্য বিষণ্ণ চোখে এই ঘরের খুঁটিনাটি সব কিছু আবার দেখল।

সকালেও এই ঘর কি দিয়ে যেন ভরাট ছিল, ঠাসা ছিল কেমন এক মোহ এবং স্বাদ মাখানো ছিল—অথচ এখন অদ্ভুত ফাঁকা লাগছে। পাখি উড়ে গেলে খাঁচা যেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে তেমনি। অবিকল তেমনি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একটু নড়া-চড়া করল অমলেন্দু। সামান্য একটু হাঁটাহাঁটি। বিছানাটা একবার ছুঁল হাত দিয়ে, বালিশটা নাড়িয়ে দিল, ড্রেসিং টেবিল থেকে পাউডারের কৌটোটা তুলল এবং রাখল। ড্রয়ার বন্ধ করার শব্দ করল, জানলার পরদাটা গুটিয়ে দিল।

মনে হচ্ছিল হঠাৎ দমবন্ধ হয়ে যাবার পর আবার যেন একটু একটু নিশ্বাস প্রশ্বাস শুরু করছে ও। হ্যাঁ, এই নড়া-চড়া হাত-পাকে কাজে লাগানো এবং নিজের এটা-সেটা দেখতে দেখতে একটু একটু করে সেই নিঃস্বতা কাটিয়ে চেতনার মধ্যে যেন ফিরে আসছিল ও।

জামাটা খুলে ফেলল অমলেন্দু।

চাকরটা দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। চা দিতে বলল তাকে। তারপর যেন জোর করে একটু লঘু হবার চেষ্টা করল। শিস দেবার জন্যে ঠোঁট জিব কুঁচকে তুলল। অন্যরকম এক শব্দ হল। যেন কিছু হারিয়ে ফেলে ই-স্‌ করল।

মাথাটা ধরা-ধরা লাগছিল। ভার-ভার। চোখ দু'টো জ্বালা করছে। ঘাড়ের আর কপালের মধ্যে কেমন এক দপদপ।

চটিটা পায়ে গলিয়ে বাথরুমে চলে গেল অমলেন্দু। সমস্ত বিস্ময়টা

পরিষ্কার করে বুঝতে এবং ভাবতে হলে আগে মাথাটা ঠাণ্ডা করা দরকার। স্নানই করে ফেলা যাক। মনে মনে ভাবল অমলেন্দু। বাইরের শীত গায়ে কি মনে কোথাও লাগছিল না তার। বরং গরম লাগছিল। তেমনি এক অস্বস্তি এবং ঘর্মাক্ত অনুভূতি।

চা খেতে খেতে এইবার সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া সাজিয়ে বেশ পরিচ্ছন্ন ভাবে ভাবতে চাইছিল অমলেন্দ। আজ হাসপাতালে যাবার পর থেকে শেষ পর্যন্ত। কেবিন ছেড়ে উঠে আসা অবধি।

তারপর আরও পিছনে চোখ দিল অমলেন্দ্, মন ছড়িয়ে দিল।

সুধাদাদের সংসারে পা-দেওয়ার প্রথম দিনটি আজও মনে আছে। সেই দিনটি থেকে ও-বাড়িতে যাবার শেষ দিন—এই সেদিনের কথা পর্যন্ত মোটামুটি সবই মনে আছে অমলেন্দুর।

অমলেন্দু ভাবছিল, পুরনো দিনের স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে,—আমি এমন কি ব্যবহার করেছি এবং কোনদিন এমন কোন আচরণ প্রকাশ করেছি যা থেকে বাসনা সন্দেহ করল, করতে পারল যে, ওর শরীরের দিকে হ্যাংলার মতন নজর দেওয়া ছাড়া আমার আর কাজ ছিল না।

আঙুল মটকে, ঘাড় পিছনে হেলিয়ে, দাঁতে ঠোঁট কামড়ে খুব একটা অস্বস্তির মধ্যে নিজের হ্যাংলামিকে যেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খুঁজছিল।

তুমি বলছ, অমলেন্দু সিগারেট ধরিয়ে চোখ বন্ধ করল। আর বাসনাকে সামনে দাঁড় করিয়ে যেন বলছিল মনে মনে, তুমি বলছ প্রথম প্রথম আমার কথাবার্তা আচার-আচরণ দেখে তোমার ধারণা হয়েছিল, একটা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে মেলামেশা করার চেষ্টা করছিলাম।

মেলামেশার চেষ্টা করছিলাম বলাটা ঠিক নয়, তবে তোমার সঙ্গে বাড়ির আর সকলের মতন আমি সহজ সম্পর্কটা রাখবার চেষ্টা করছিলাম। কথা বলতাম, হাসির কথায় হাসতাম, হাসাতে চাইতাম। কিন্তু এ-থেকে আমার অসৎ কিছু উদ্দেশ্য আছে এ-তুমি কি করে স্থির করে নিলে!

আমি তোমায় প্রেমপত্র লিখি নি, কু-প্রস্তাবের চিঠিও না, ঘরে ঢুকি নি আচমকা কোনদিন, মাঝরাত্তিরে দরজা খুটখুট করি নি বা এমন কোনো বাঙলা উপন্যাসের নানা জায়গায় লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে দিয়ে পড়তে দিই নি—যা থেকে আমার সম্পর্কে তোমার ধারণাটা প্রথমেই অত জঘন্য রকম হতে পারে।

বাসনাকে মনে হচ্ছিল নোংরা খুঁটে খাওয়া কোনো পোকা-মাকড় পাখি-টাকি, আর অমলেন্দু বিশ্রী রকম এক ঘেন্নায় মুখ-চোখ-নাক কুঁচকে এই ইতর স্বভাবকে ধিক্কার দিচ্ছিল।

আর অসহ্য রাগ হচ্ছিল। সারা গায়ে মনে কেউ যেন ছেঁকা দিয়ে দিয়েছে। জ্বলছে অসহ্য জ্বলনে। এর চেয়ে অপমান, থুথু, কোনো ভদ্র লোককে আর কি হিসেবে করা যেতে পারে। যাকে ভালবাসি, সেই মেয়ে শেষে বলল, তোমায় লম্পট, অসৎ চরিত্র ভাবতুম।

কোনো বিধবা মেয়ের সঙ্গে—হ্যাঁ, প্রায় সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে বলা অসৎ চরিত্রের লক্ষণ বা লাম্পট্যের পরিচয়, এই অদ্ভুত নীতিবোধ আমার ছিল না। বা এও আমি দেখি নি, সুধাদার সংসারে পুরুষ-মহল এবং মেয়ে-মহলের মধ্যে একটা শক্ত দেওয়াল দেওয়া আছে। তা থাকলে বীথির সঙ্গে কিংবা কমলাবউদির সঙ্গে আমার বাক্যালাপও হবার কথা নয়।

আমার চেহারা এবং চোখ মুখ দেখে নাকি তোমার এ সন্দেহ দৃঢ় হয়েছিল।

চোখ খুলে চাইল অমলেন্দু। তারপর হঠাৎ উঠে গিয়ে তার দাড়ি কামানো আয়নাটা এনে মুখের সামনে ধরে নিজেকে দেখতে লাগল।

কিছুই খুঁজে পাচ্ছিল না অমলেন্দু। তার রঙ কালো, মুখ গোল-গাল, চোখ সাধারণ মানুষের মতন, চাউনিও সবার মতন, নাক একটু বসা, ঠোঁট পুরু, দাঁত সাদা সুশ্রী।

কি আছে এই মুখের মধ্যে—অমলেন্দু অবাক হয়ে ভাবছিল এবং খুব তীক্ষ্ণ চোখ করে করে দেখছিল তাকে দুশ্চরিত্র লম্পট-লম্পট দেখায় কিনা হাসলে, চোখ বেঁকালে বা—

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল। আর বাসনাকে উদ্দেশ করে বলল অমলেন্দু, তখনকার সেই মুখ এখনও তো আছে আমার। বদলায় নি নিশ্চয়। তখন যদি দুশ্চরিত্র লম্পট দেখিয়ে থাকে তবে এখন কেন নয়। তুমি যে-মুখের গড়নে সেদিন পর্যন্ত মেয়ে-ফুসলানো শয়তানীর মিটিমিটি চাউনি দেখেছ আজ ক'দিনেব মধ্যেই হঠাৎ সেই মুখে ভালবাসার থৈ-থৈ পবিত্রতা দেখতে পেয়ে গেলে! আশ্চর্য!

অনেকক্ষণ পরে অন্য একটা কথা মনে এল। অন্য ছবি সত্যিই সে দেখতে পেল অন্য-এক আয়নায়। আর তুলনাটা অমলেন্দুর নিজেরই মনে হচ্ছিল, এখন, এই অবস্থায়, একলা নিজের ঘরে বসে বসে আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে। মনে হচ্ছিল, হঠাৎ কোত্থেকে এক ঢিল এসে আয়নাটাকে যেন গুঁড়িয়ে দিয়েছে—সারাটা আয়না ফেটে চিড় খেয়ে চৌচির। আর অমলেন্দু সেই ফাটা চিড়-চৌচির আয়নায় নিজেব এক অদ্ভুত মুখ দেখছে, দেখতে পাচ্ছে যেন। একটা চোখ, দু'টো দাঁত, এক খামচা গাল কোথাও; কোথাও যেন আধখানা চোখ, কাটা নাক। কপাল, গাল গলা আঠায় আঁটা দাগদাগ টুকরো-জোড়া ছবির মতন। এই মুখের কোথাও বড়, কোথাও ছোট, নাকের ডগা নখ-সমান তো দুটো দাঁত মূলোর মতন। বিচিত্র, অদ্ভুত, কিম্ভূত এবং বীভৎস।

অত্যন্ত বিশ্রী লাগছিল অমলেন্দুর। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিল। দাড়িকামানো আয়নাটা বিছানার একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে মুঠো করে করে চুল টানছিল মাথার। এবং স্নায়ু-ক্লান্তির অবসাদে রুক্ষ ও রুগ্ন মুখ নিয়ে বসেছিল।

তুলনাটা মনে হচ্ছিল। খুব সহজেই মনে আসছিল। এই আয়না বাসনা। এতদিন বাসনার মধ্যে নিজের যে ছবি দেখেছে অমলেন্দু, এখন আর তা নয়। হঠাৎ কোনো এক কঠিন এবং নিষ্ঠুর আঘাতে চিড়-চৌচির আয়নার মতন বাসনার মন—মনের কাছে নিজের চেহারাটা অত্যন্ত বিশ্রী এবং বীভৎস হয়ে ফুটে উঠেছে। নিজেকে সেখানে চিনতে পারছে না অমলেন্দু এবং সেই ক্ষত-বিক্ষত, কুশ্রী

চেহারাটা দেখে ওর ভয় হচ্ছে। ভয় ঘৃণা, বিরাগ বিতৃষ্ণা সবই।

নিজেকে আজ আমি দেখলাম। তোমার ধারণা এবং ভাবনায়, মনের মধ্যে আমার চেহারাটা যেভাবে তুমি এঁকেছ—তা আজ আমি চিনতে পারলাম। অমলেন্দু মনে মনে বাসনাকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে ভাবছিল আর বলছিল।

খুব চমৎকার হয়েছে। একটা ভূত কিংবা ভূতের এমন নিঁখুত চেহারা ছবিতেও চোখে পড়ে না। কিম্ভূত-কিমাকার যে জন্তু তুমি খাড়া করেছ, তাকে চেনবার জন্যে কোথাও একচুল অদল-বদলের দরকার হয় না। অন্তত আমার হচ্ছে না। আমি তো স্পষ্টই বুঝতে পাচ্ছি পশুটা তার কালো-কালো কুৎসিত মুখ, লাল-লাল চোখ আর লালঝরা জিভ বের করে গন্ধ শুঁকছে তোমার গায়ের।

অন্য ভাবেও এটা বলা যায়। সিনেমায় দেখা কোনো কোনো বাঙলা ছবির নারীহরণ দৃশ্যের নায়কের মতন, কিংবা বাঈজী বাড়িতে ঢোকা নায়কের মতন লোভী, লোলুপ, লম্পট, শয়তান চেহারাটা তুমি আমায় নিয়ে বেশ গুছিয়ে এঁকে নিয়েছ। আমি নিজেও নিজের সেই চেহারাটা দেখতে পাচ্ছি। তুমি আমায় দেখাচ্ছ।

আর এটাও, এই শেষটাও চোখে জলটানা উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছদ লেখা হচ্ছে। সতী সাধ্বী নারী তুমি, পবিত্র প্রেমিকা, অনুশোচনায় গলে গলে কেঁদে কেঁদে গলা ফাটিয়ে তোমার ভুলভ্রান্তি, অপরাধ, অন্যায়-টন্যায়গুলো একদমে স্বীকার করে যাচ্ছ। গলার শিরা নীল করে।

অবশ্য বইয়ের পাতায় এমন ঘটনা এসে পড়লে, পাতা উলটে চলে যাওয়া যায়, কিংবা টান মেরে বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিতেও পারা যায়। কিন্তু এখানে, এক্ষেত্রে—আমাকে সবই দেখতে হল। শুনতে হল। সহ্য করতেও।

আর আমি বাস্তবিক কি ভাবছি জান? ভাবছি. তোমাকে এতদিন যা ভেবেছিলাম, তোমার চেহারা, কথাবার্তা, আচার-আচরণ, থেকে যা ভাবা স্বাভাবিক, আসলে তুমি ঠিক তার উলটো। তোমার ওই সংযত

সুশ্রীতা খুব পলকা একটা পোশাক। টানলে সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায়—না হয় ছিঁড়ে যায়। আর ওই পবিত্র-পবিত্র ভাবটা তোমার নিছক ভেজাল বস্তু। খাদমেশানো ধাতুর উপকার সোনার পালিশ দেওয়া চাকচিক্য।

রাত বাড়ছিল। আব ক্লান্তি, অসহ এক ক্লান্তি মেরুদণ্ডের টান-টান হাড়টাকে যেন ক্রমশই নুইয়ে দিচ্ছিল। সারা পিঠ, কাঁধ ব্যথা-ব্যথা। বোঝার ভারে আড়ষ্ট, অসাড় মতন। মাথার মধ্যেও ঝিমঝিম করছিল।

অমলেন্দু উঠল। দশটা বাজে। খিদে নেই, ইচ্ছেও করছে না। তবু। তবু কিছু খেতে হল। আর যদিও কোনো স্বাদ-বিস্বাদ বুঝছিল না, খেতে খেতে বাসনাব রান্নার কথা মনে পড়ছিল। এবং রান্নাঘবের কথা, সুধাদাদের সংসারে বাসনাকে। সেই ধোঁয়া কয়লা, এঁটো-কাঁটা ভরা দুহাত সংসাবের বাসনাকে।

এই হয়। জগতটা এমনি। বিষণ্ণ হয়ে ভাবছিল অমলেন্দু, রান্না ভাঁড়ার আর ভাতের ফেন ঢেলে ঢেলে জীবনটাকে নিঃশেষ করে ফেলেছিলে, আমি শুধু সেই দমবন্ধ ছোট ঘরে আর আঁশটে বাসি বাতাসের বাইরে তোমায় আনতে চেয়েছিলাম। আলো হাওয়ায়।

খাওয়া শেষ করে আবার ঘরে এসে ঢুকল অমলেন্দু। সিগারেট ধরালো। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

বাইরে অন্ধকাব, আর শীত, আর কুয়াশা।

কষ্টই হচ্ছিল তার। বিশ্রী লাগছিল, নিজের কাছে নিজেকেই খুব ছোট মনে হচ্ছিল কথাটা ভাবতে যে, বাসনাকে—যে-মেয়েকে সে ভালবেসেছিল, বিয়ে করেছে—তার সম্পর্কে এত সব রূঢ় কটু এবং তিক্ত ধারণা অমলেন্দুকে করতে হচ্ছে।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত তোমাব কথায়, তোমার নামে এবং তোমার চিন্তায় যে শ্রদ্ধা, নম্রতা ছিল—সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে। তোমায় নিয়ে এখন আমি যা খুশি ভাবতে পারছি। কোথায় না নামতে পারছি।

একটা সিগারেট শেষ হল। আরও একটা। বিছানায় এসে শুলো অমলেন্দু। পাশের শূন্য জায়গাটুকু, অদ্ভুত এক অনুভূতি আনছিল।

মনে হচ্ছিল, এ-শূন্যতা তার অন্তরঙ্গ নয়, অথচ কাল অবধি তাই মনে হত। যেন পাশের-জন আসছি বলে কোথায় চলে গেছে, এখনো আসছে না। আজ মনে হতে, এখন—এ-শূন্যতার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, ট্রেনের কামরায় খালি বেঞ্চির মতন পড়ে আছে জায়গাটা।

পাশ ফিরে শুয়ে বালিশে মুখ চেপে হাত আড়াল করে সমস্ত ভাবনা অন্তত কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকতে চাইছিল অমলেন্দু।

রাত এগিয়ে চলেছে। চাকরটা বাইরের সব আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল, কোথাও আর শব্দ নেই। জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা আসছে এবার। হয়তো বা কুয়াশাও। নীচে রাস্তা দিয়ে একটা রিক্‌শা চলে গেল। তার চাকার শব্দ খানিকক্ষণ কানে লেগে থাকল অমলেন্দুর।

বাতিটা নিবিয়ে দেবার জন্যে উঠলও। জল পিপাশা পাচ্ছিল। জল খেল পুরো এক গ্লাস। খানিকটা ব্রোমাইড। মাথার মধ্যে টনটন করছে, চোখের কোল ঘিরে ব্যথা আর ভার। এবার একটু ঘুমনো দরকার। এই অস্বস্তি, উত্তেজনা, চিন্তা আর ক্লান্তি থেকে অবসর চাই।

ঘুম আসছিল না। তবে একটা ঘোর আসছিল। আর সেই ঘোরের মধ্যে অমলেন্দু অসহ্য কষ্টে এ-পাশ ও-পাশ করছিল। আর বলছিল বাসনাকে, তুমি আমায় ভালবাস নি। ভালবাস নি। ভালবাসার উপযুক্ত মনে কর নি।

বরং আমি—হ্যাঁ, আমি একটা শেষ-বেশের জিইয়ে রাখা মানুষ ছিলাম, যার কাধে ভর দিয়ে তুমি ভেবেছিলে তোমার বাড়ির চৌকাঠ ডিঙিয়ে আসা সহজ হবে। এর বেশি কিছু না। কে বলতে পারে, যে-সন্দেহ তুমি আমায় করেছিলে, আসলে এ-সন্দেহ অন্য কারো ওপর এবং সেই পাখি উড়ে গেছে—তাই ভয়ে ভয়ে, হিসেব কষে কষে তুমি আমার কাছে ভেসে এসেছ। এবং এখন ডুব-জলে এসে পড়ে গলা জড়িয়ে ধরেছ আমার। বাধ্য হয়েই।

অমলেন্দু বুঝতে পারছিল, সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং কঠিন হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ, হয়েছে। হওয়া অন্যায় কি। বাসনার বৈধব্য কি শুচিতা, কিংবা তার ভালবাসা—কিছুর ওপরই আর আস্থা বিশ্বাস রা

যায় না।

আমি অন্তত পারছি না। অমলেন্দু অন্ধকার ঘরে চিৎকার করে বলে উঠল।

এই কাঠিন্য কখন আবার ফিকে হয়ে এল। চাপ-চাপ গভীর নিরেট এক বেদনা এবং হতাশা বুক ভরে আঁট হয়ে বসে আছে—এক সময় অমলেন্দু তাও বুঝতে পারল।

এরপর তোমাকেও আমার কোনো কোনো কথা খোলাখুলি বলা উচিত। অমলেন্দু বাসনাকে মনে করে বলছিল, তখন হাসপাতালে তুমি আমায় প্রশ্ন করেছিলে না, কোনো কথা আমার বলার আছে কিনা! তুমি চাইছিলে আমি কিছু বলি। খানিকটা দুঃখ, হাহুতাশ করার পর তোমার অনুশোচনায় গলে গিয়ে আমি সান্ত্বনা দেব—হয়তো এটাই তুমি চাইছিলে। তা করতে পারলে দৃশ্যটা মানাতো। মিলনান্ত নাটকের মতন।

কিন্তু! কিন্তু আমি কথা খুঁজে পাই নি। হাসপাতালের কেবিনে যা বলা যায়।

অমলেন্দুর খেয়াল হল, বাসনাকে কিছু কথা তার চিঠি লিখে জানিয়ে দেওয়াই সব চেয়ে ভাল। মুখে যা বলা যাবে না, সে সুযোগও হবে না, চিঠিতে তা মন খুলে বলা সোজা, অনেক সোজা।

আবার বাতি জ্বালিয়ে এই মাঝরাতেই চিঠি লিখতে বসল অমলেন্দু।

ক'টা কাগজ ছিঁড়ল, একটি কি দু'টি লাইন লিখে কাটাকুটি করল। সিগারেট খেল পর পর।

তারপর লিখল :

ঘর সাজিয়েছিলাম। বিছানা তৈরি করা ছিল। কাল পর্যন্ত মনে হয়েছে এ আমার-তোমার সাজানো ঘর, এখানে সুখ, শান্তি, আরাম, ভালবাসা ছড়ানো আছে, আমরা তুলে নেব। এখন মনে হচ্ছে—এটা ভাড়াটে খাট, আর আমরা, অন্তত আমি ভাড়া গুনলে খাটের খানিকটা অংশ পাব। তার বেশি নয়। তোমার মনে আমার সম্পর্কে

যে ধারণা—তাতে ভদ্র স্বামী হওয়াও যায় না। ভলবাসার পাত্র তো নয়ই—কেননা, ভাবতেও আমার কষ্ট হয়, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সম্মানের বাইরে এই কথার ভালবাসায় তুমি আমাকে ভালবাসছ।

চিঠিখানা মুড়ে কলমটা বন্ধ করল অমলেন্দু।

কাল হাসপাতালে এই চিঠি বাসনার হাতে দিয়ে আসবে, ভাবলে অমলেন্দু।

তারপর বাতি নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

বেলায় ঘুম ভেঙ্গে উঠে—বাইরে বেরুতে গিয়ে চিঠিটা প্রথমেই চোখে পড়ল। ভাঁজ খুলে চিঠি পড়ল অমলেন্দু। এই সকালে। ঘুম-ভাঙ্গা চোখ আর সতেজ মন নিয়ে।

আর মনে হল—মনের এই সব একান্ত ঘনিষ্ঠ, এত আপনার কথা চিঠিতে বা মুখে বলার মতন নয়। এ শুধু নিজের অনুভূতিতে আশ্চর্য-ভাবে মিশে থাকে। নিজে অনুভব করা যায়। বাসনাদের বলা যায় না। তাতে যেন এই অনুভব ও ইচ্ছা—সবই ছোট হয়ে যায়, জলো হয়ে আসে।

চিঠিটা টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে জানলা দিয়ে রোদে উড়িয়ে দিল অমলেন্দু। যেন আকাশে-ওড়া নরম একটি পাখির পালক হঠাৎ খসে-খসে রোদে হাওয়ায় ঝরে-ঝরে উড়ে-উড়ে মাটিতে পড়তে লাগল।

।। সতেরো ।।

'বলতে না বলতে অমলদা এসে গেছে।' কেবিনের পরদা নড়ে অমলেন্দুর মুখ উঁকি দিতেই বলে উঠল বীথি। জানলায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিল ও তাই চোখে পড়েছে প্রথমে।

বিচানায় বসেছিল বাসনা; পা গুটিয়ে। পাশে খাটের ধার ঘেঁষে কমলা। টুলের ওপর সুধাময়। তাকালো তিনজনেই।

'কি ব্যাপার হে, ক'দিন কোনো খবরই নেই?' সুধাময় শুধলো।

'শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল।' অমলেন্দু সুধাময়ের পাশে এসে দাঁড়ালে বাসনার দিকে আর একবার চেয়ে কমলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন তাকেই বলছিল, একটু হেসে, 'কী করে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর-জ্বর মতন হল। বাড়িতেই শুয়েছিলাম।'

'চেঞ্জ অব্ ক্লাইমেট্। এ-সময় ঠাণ্ডা একবার সকলেরই লাগবে।' সুধাময় বলল। এ-দিক-ও-দিক তাকাচ্ছিল একটা টুল-কুলের আশায়, 'তুমি বরং এই টুলটার বস, অমলেন্দু। আমি—'

'বস, বস ; তুমি বস তো সুধাদা—আমি বেশ আছি।' বাধা দিয়ে অমলেন্দু একটু সরে গেল। বাসনার দিকে তাকিয়ে শুধলো, 'শরীর কেমন ?'

'ভালই।' বাসনা ছোট্ট করে জবাব দিল। চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালো।

এই হয়। কমলারা কেউ এখানে থাকলে কেমন একটা বাধো-বাধো ভাব, ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বাক্যালাপ। সম্বোধন পদটা সব সময় এড়িয়ে গিয়ে,—'আপনি' 'আছেন' বাদ দিয়ে।

'অপারেশান পরশুই হচ্ছে বোধহয়।' সুধাময় বলল।

'পরশু!' অমলেন্দু সুধাময়ের দিকে চাইল, 'বোধ হয় কেন আবার ?'

'কী করে বলব। কালকেই অবশ্য সঠিক জানা যাবে।' সুধাময় উঠল, 'তোমরা বস, আমি ক'টা কাজ সেরে আসি।'

সুধাময়ের টুলে বসে অমলেন্দু বলল, বাসনাকে উৎসাহ দিচ্ছে এমন ভাবে, 'আজকাল সার্জিকাল ব্যাপারটা খুব ইজি হয়ে গেছে। দিন-রাত কত যে কাটা-ছেঁড়া হচ্ছে, ও প্রায় ডাল-ভাতের সমান। আর দেখছি তো সবাই বেশ ভাল হয়ে যাচ্ছে।'

'আমিও তো তাই বলছিলাম।' কমলা বলল, 'ভয় করবার কিছু নেই, ছোড়দি। এক দু'দিন একটু কষ্ট-টষ্ট সইতে হবে।'

'অজ্ঞান করে কাটাকুটি করলে আর কষ্ট কি!' বীথি বলল, 'যা হবার ঘুমের মধ্যেই হয়ে গেল এক রকম।'

'তাই নাকি,—' বীথির দিকে চেয়ে হাসল অমলেন্দু, 'তাহলে তুমি যখন ঘুমিয়ে থাক, তোমার গায়ে একটা ছুঁচ ফুটিয়ে দেখতে হয়, কষ্ট লাগে, না লাগে না।'

'দেখতে পারেন। আমি একবার উঃ—পর্যন্ত করব না।' বীথি হাসল।

'তা সত্যি, ওর একেবারে কুম্ভকর্ণের ঘুম।' কমলা হাসিমুখে বলল।

'ঘুম আমাদের ছোড়দির—!' বাসনার দিকে চেয়ে বীথি বলছিল, 'কোথাও একটু খুট্ করে শব্দ হোক, অমনি বিছানায় উঠে বসবে। এত পলকা ঘুম আর দেখি নি।'

'ও—,' বাসনার দিকে চেয়ে এবার অমলেন্দু বলল, 'শুনেছি যারা মাথার কাছে টাকাকড়ি মণিমুক্তোর সম্পত্তি সিন্দুকে পুরে ঘুমোয়— তারা ওই রকম হয়, ভীষণ সতর্ক, সাবধানী, টিকটিকি ইঁদুর কি বাতাসের শব্দে চমকে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে।'

অমলেন্দু হাসবার ভঙ্গি করে বলছিল, যদিও কথাগুলোর অন্য অর্থ ছিল এবং একা বাসনা তা বুঝতে পারছিল। বাসনাকে বোঝানোর জন্যেই হয়তো বলছিল অমলেন্দু।

'তোমার ছোড়দির বোধ হয় বেশ লুকোনো সম্পত্তি আছে বীথি।' অমলেন্দু হাসল।

কমলাও জোরে হেসে ফেলল। বীথিও।

'তাই নাকি, ছোড়দি!' বীথি হাসতে হাসতে বলছিল বাসনার দিকে চেয়ে-চেয়ে, 'আমায় কিছু দান কর না।'

'দেবার হলে কি আর আগলে রেখেছি।' বাসনা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল। হাসবার চেষ্টা করছিল যদিও, তবুও সে হাসি অন্য রঙের।

'এক নম্বরের কিপটে তুমি।' বীথি বেণী দুলিয়ে ঠোঁট ওলটালো। 'আমি বাপু দরাজ-হাত। আমার থাকলে বলতে হত না, দিয়ে দিতুম, বিলি করেই চুকিয়ে দিতুম।'

'তা বুঝছি।' কমলা হেসে বলল, 'যার ঘরের বউ হবে তুমি,—

তার ঘটি-বাটি পর্যন্ত আর থাকবে না, পরনের কাপড়টা পর্যন্ত বেচারার্রী থাকে কিনা কে জানে।'

অমলেন্দু জোরে হেসে উঠল। বীথি নিজেও। বাসনাও হাসি চাপল।

এমনি সব কথা। কি হবে পরশুদিন তার কথা আজ নয়, এখন নয়। সাহস যা দেবার, সে তো রোজই একবার করে দেওয়া হচ্ছে। অন্য কথা বল, হাসি-ঠাট্টার কথা, মন ভোলানোর কথা।

অমলেন্দু ইচ্ছে করে একটা বাঁকা পথে আলোচনা টেনে নিয়ে যায় নি। চলে গিয়েছিল, কেমন করে যেন। কথায় কথায় আবার সহজ হাসি-ঠাট্টার মধ্যে ফিরে এল ওরা। ভালই লাগল অমলেন্দুর।

আর একটা কি কথা নিয়ে বীথি যখন হেসে গড়িয়ে পড়ছে, কমলাও মুখে আঁচল তুলেছে, বাসনা কিছুতেই হাসি চাপতে পারছে না—আর অমলেন্দু ঘাড় পিঠ নুইয়ে শরীর কাঁপিয়ে হাসছে—সুধাময় ঢুকল।

'কী সর্বনাশ, এত হাসাহাসি করলে হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দেবে যে—!' সুধাময় বলল। বাতিটা জ্বালিয়ে দিল।

'বীথির কাণ্ড!' কমলার জল এসে গিয়েছিল চোখে হাসতে হাসতে। চোখ মুছছিল।

'আমাদের মৃগাঙ্কর সঙ্গে দেখা হল। ওর বউ রয়েছে এখানে—পেয়িং ওয়ার্ডে। ছেলে হয়েছে। ডাকছে তোমাদের চল, একবার দেখা করে আসবে।'

'তৃপ্তির বাচ্চা, হয়েছে, ওমা!' কমল, বলল 'তো সেই খবর হাসপাতালে শুনতে হল। তোমাব আত্মীয়স্বজনের যা ভদ্রতাজ্ঞান।'

'বা ছেলে হল আজ সকালে—কাল রাত্তিরে বাড়ি বয়ে তোমার অ্যাড্ভান্স খবর দিয়ে আসবে নাকি!'

আবার এক-পশলা হাসি।

ওরা চলে গেলে বাসনা অমলেন্দুর দিকে ভাল করে আর একবার চাইল। একটু চুপচাপ। তারপরে বাসনাই বলল, 'তোমার জ্বর

হয়েছিল ?'

'জ্বর ঠিক নয়, জ্বর-জ্বর মতন। ইনফ্লুয়েঞ্জা।'

'তা শুধু একটা সুতির পাঞ্জাবি চড়িয়ে বেরিয়েছ যে!

'এখনই কেউ গরম জামা পরে?

'কেন পরবে না। পৌষমাস পড়ে গেছে। শুধাময় শার্টের তলায় সোয়েটার পরছে।'

'সুধাদার কথা বাদ দাও!' অমলেন্দু উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বাসনা পা ঝুলিয়ে বসল। মুখ জানলার দিকে।

'সেই যে সেদিন গেলে অমন করে, তারপর তিনদিন আর কোনো খবর নেই—। আমি যে কিভাবে দিন কাটাচ্ছিলাম!' আরও যেন কথা থাকল, এমভাবে অসম্পূর্ণ এনটা টান দিয়ে থামল একটু থেকে. 'একটা খবরও তো দিতে হয়! ভাবছি কী জানি কী হল?

অমলেন্দু জবাব দিল না কথার।

বাসনা কী ভাবছিল। ডাকল অমলেন্দুকে।

'শোন।'

'কি?'

'এখানে এস।'

অমলেন্দু সামনে এসে দাঁড়ালো।

মুখ তুলে অমলেন্দুব চোখ চোখ রেখে মৃদু গলায় বলল বাসনা, 'তুমি কি আমায় বিশ্বাস করতে পারছ না?'

কথাটা যেন কেমন লাগল অমলেন্দুর। বাসনার সুন্দর করুণ নিষ্প্রভ মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় না, এই মেয়ের মধ্যে কোনো শঠতা আছে।

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি আছে।' অমলেন্দু ইতস্তত করে বলছিল, 'কি এল-গেল তাতে!'

'কী জানি, সেদিন তুমি এমনভাবে চলে গেলে—! আমার ভয় হচ্ছিল খুব। ভাবলাম, হয়তো তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না. এখন—এখন আমি যা চাইছি এই বা কতকটা খাঁটি।' বাসনা মুখ

নীচু করে নিল। ঘাড়ের পাশ দিয়ে ভাঙা খোঁপা পিঠের ওপর নেমে এসেছে। সাদা জামা। ফিতেপাড় শাড়ির একটা কালো দাগ পিঠ-বুক জড়িয়ে চকচক করছে।

অমলেন্দু দেখছিল। কথা বলছিল না।

'আমারখুব খারাপ লাগছিল তোমার পুরনো কথা ভাবলে, না— ?' বলল আবার মুখ তুলে।

'ওসব কথা থাক।' অমলেন্দু টুলটায় বসল।

'লজ্জা পাচ্ছ কেন! খারাপ লাগার কথাই তো, আমি কি তা বুঝি না।' বাসনা আস্তে করে অমলেন্দুর একটা হাত টেনে নিল, আমি সত্যিই খারাপ ছিলাম; অন্যায় করেছি, ভুল করেছি, তোমায় ঠকিয়েছি। এখন আমি নতুন মানুষ। বাস্তবিকই অন্য বাসনা।' আবার একটু থামল বাসনা, 'তোমার কাছে আর আমার মুখ লুকিয়ে. আড়াল দিয়ে থাকতে হবে না—ভাবতেই এত ভাল লাগে!'

করিডোরে পায়ের শব্দ হচ্ছিল।

অমলেন্দুর হাতে একটু চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল বাসনা! চাপা গলায় বলল, 'কাল এস। বলা যায় না, যদি মরে যাই পরশু।'

'কিচ্ছু হবে না; ভয়ের কিছু নেই। সেরে উঠলে তুমি। বললাম আমি।' অমলেন্দুও কেমন এক ম্লান হাসি হেসে সান্ত্বনা দিচ্ছিল।

সুধাময়রা এসে পড়ল।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হবার ঘণ্টা পড়ছিল তখন।

॥ আঠারো ॥

আর এক সকাল।

ঘুম ভাঙতেই ভোরের ফরসায় সামনের দেওয়ালটা চোখে পড়ল, একটা হুক। বালিশের উপর দিয়ে মাথা ঠেলে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো বাসনা, কুয়াশা ঝাপসা শার্সির বাইরে ঝিক্‌মিক্ আভা রোদ উঠেছে।

আর আচমকা সকালের এই রোদ যেন মুছে গেল, পলকে অঢেল মেঘে অন্ধকার। বুকটা ধক্‌ধক্‌ করে উঠল বাসনার। হৃদপিণ্ডটা তলিয়ে গেল কোথায় যেন। আজ অপারেশান। মনে পড়ল।

মনে পড়ল তো অদ্ভুত এক ভয়। হঠাৎ এক ঠাণ্ডা কনকনে ভাব। বুক, গা, পা, হাত অসাড়। নিশ্বাস নিতেও কী ক্লান্তি। দাঁতগুলো ব্যথা করে উঠল, গাল, গলাও। খুক্‌ করে একবার কাশল বাসনা। আবার কাশল।

আমি কি আর বাঁচব? বাঁচব না। এই তো আমার শরীর। আমায় ওরা অজ্ঞান করে ফেলবে। জ্ঞান থাকবে না। কাটাকুটি করবে। লাগবে না আমার? যদি একটু জ্ঞান থাকে—কী ভীষণ লাগবে, কষ্ট হবে। উঃ কী যন্ত্রণাই হবে তখন! আমি চিৎকার করব, কাঁদব। সহ্য করতে পারব না পারব না।

হঠাৎ যদি মরে যাই? জ্ঞান ফিরে না আসে?

হাতে একটু একটু ঘাম জমছিল। মুঠো করতে শুরু করল, আঙুলগুলোও যেন অসাড়। জোর লাগছিল, কষ্ট লাগছে মনে হচ্ছিল। আর বুকটা হঠাৎ এবার ধড়াস-ধড়াস করে উঠল। পেটের মধ্যে একটা ব্যথা পাক দিয়ে গেল। কানের কাছে ঝিঁঝিঁ ডেকে গেল। আর চোখের সামনে বিচিত্র কালো-কালো অস্পষ্ট ভাঙা-চোরা ছবি—যেন ছড়ানো পাতার মতন ছড়িয়ে গেল।

মনে জোর আনো। বিশ্বাস। বাসনা নিজেকে নিজেই কখন যেন বলছিল। বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস। জোর। সাহস। মরা-বাঁচা ভগবানের হাতে। তুমি যে মরবেই, একথা কে বলল। কপালে থাকলে রেলের চাকায় মাথা দিলেও মানুষ মরে না। মধুসূদন মাস্টার মরে নি। গাড়ি থেমে গিয়েছিল।

আমার যদি আয়ু থাকে, বাঁচব, ঠিক বেঁচে উঠব।

ভগবান ঠাকুর দেবতাকে ভাব তো সাহস আসবে। আর সংসারে এভাবে তো একদিন সকলকেই ছেড়ে যেতে হয়। কালও তুমি মরতে পার। যাদের জন্যে এই মায়া, এত ভালবাসা, এরাও তোমায় ফাঁকি

দিয়ে চলে যেতে পারে। পরিমল কি যায় নি?

অমলেন্দু!—অমলেন্দু!

অমলেন্দুকে আমি মনে করে মরে যাব—হ্যাঁ—শেষ পর্যন্ত, যতক্ষণ জ্ঞান থাকবে, ভাবতে পারব। ওর মুখ মনে করে, এত সুখ আর দুঃখ নিয়ে খুব সুন্দর করে মরে যাই যদি ক্ষতি কি! আমার জন্যে ও কাঁদবে, বার বার আমার কথা মনে পড়বে ওর। আমার চিতায় জল ছড়িয়ে আসবে।

সত্যি, আমার কত আশা ছিল—কত সাধ বাসনা—আবার করে স্বামী সংসার ছেলেপুলে···কিছুই হল না, কিছু পেলাম না এ-জন্ম।···

ক'টা বাজল—! ইন্‌জেকশন দিয়ে গেছে কখন—ব্যাথাটা এখনো রয়েছে। বড় দুর্বল লাগছে।

সুধাময় যদি এখন একবার আসত। কমলা, বীথি, মিণ্টু। বাচ্চা গুলোকে কতদিন দেখি নি। খোকাটা তবু দিন দুই এসেছে বড়-মাসিকে দেখতে।

অমলেন্দু কাল এসেছিল। বেচারীর কষ্ট সব চেয়ে বেশি। কিছু বলতে পারছে না, করতে পারছে না। অথচ ও-ই তো আমার স্বামী। তোমার আশীর্বা থাকলে আমি সব কষ্ট সহ্য করে বেঁচে উঠব।

ক'টা বাজল—গরম মোজা পরিয়ে দিল কেন পায়? কম্বলটা আবার কেন? ঢাকা দেবে। দাও, দাও। যা খুশি তোমাদের করো—যা খুশি।

এবার বুঝি নিয়ে যাবে? ভগবান! কালী, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ। ঠাকুর আমায় সাহস দাও, শক্তি দাও। ঈশ্বর! ঈশ্বর!

রোদ সকাল, পাখি, ফুল, গাছ—সুধাময়, কমলা, বীথি—সব সুন্দর, সবাই ভাল। আমার কারুর ওপর রাগ নেই। রাগ নিয়ে যাচ্ছি না। তোমরা জানছ না, কিন্তু সত্যি, আমি আজ আর কারুর ওপর রাগ-অভিমান নিয়ে যাচ্ছি না।

ক'টা বাজল। সেই ঠেলা গাড়ি। চল, নিয়ে চল। আলো, ছায়া, গন্ধ, শব্দ। গাড়িটা বেঁকে গেল। ঘর।

আবার —

বমি আসল বাসনার। তলপেটের তলায় জ্বালা-জ্বালা করছিল। আবার জ্বলছে। বমি করবার জন্য উঠে বাসনা। ওয়াক তুলছিল—। আর মাথাটা টলে পড়ছিল।

তারপর খেয়াল নেই।

ঘোর ভাঙল—বাসনা চোখ মেলতে গিয়ে চমকে উঠল। কোথায় নিয়ে এসেছে তাকে! আলো, আলো! এ কেমন সব মুখ!

এরা—? আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না, আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। তেষ্টা।

বাসনার মনে হল কথাটা সে বলেছে। কিন্তু তার জবাব নেই। জল নেই। কেউ দিল না।

বাসনা সটান শুয়ে, উঁচু। মুখের সামনে এ কি?

'ভয় কি, কোনো ভয় নেই। কতক্ষণের আর ব্যাপার চোখ বুজতে না বুজতে হবে। দিব্যি সেরে উঠবেন। চমৎকার শরীর হয়ে যাবে দু'দিনে। কি নাম আপনার?'

'বাসনা —।'

আ, আ···গলার মধ্যে ভক্ করে কী যেন ঢুকে গেল। কাশল। মিষ্টি-মিষ্টি কেমন যেন···

'এক দুই গুনে যান তো দেখি!'

'এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়···দশ এগারো···বারো···'। আ—আ—একী—একী—মুখের ওপরটা জ্বালা করছে, গলা, গলার কাছে কার হাত? নিশ্বাস চেপে রইল বাসনা। কিছুতেই আমি নেব না নিশ্বাস। দমবন্ধ বয়ে আসছে। চোখের সামনে একটা আলো ঝিলিক দিয়ে গেল। কেমন একটা শব্দ হচ্ছে মাথার মধ্যে টিপটিপ পট্···চিকির কর···। আবার যেন আলোর ঝিলিক···।

কে যেন কথা বলছে? আমি···কমলা তুই, তুই আমায়···আমার

নান বাসনা। হাসপাতাল।

'মরে যাব—ছেড়ে দি ··' উঠতে চাইছিল···মাথা উঠল না বাসনার উঠতে দিল না। মুখ ফেরাতেও না।

গলার টুঁটি চেপে ধরেছে কেউ। বাতাস বাতাস বাতাস। খক্ খক্ খক্···। ওমা, মা, মা···। ওমা, মা···

গলার মধ্যে দিয়ে কত মিষ্টি আর ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল না! শুনতে না বলছে আবার। অসভ্য, বদমাশ, নিষ্ঠুর।

আমি কোথায়?

ষো···লো···আঠা···

এরা আমায় মেবে ফেলবে। মা, লাগো, মা···

থুথু কাটছিল জিভে।

ক'টা বাজল?

নিশ্বাস নিচ্ছে বাসনা। বুক ধুকধুক করছে। চোখ দু'টো কোথায় যেন আটকে গেছে।

কাঁদছিল বাসনা। যেন হাত বাড়িয়ে কাকে খুঁজছিল।

অমলেন্দু কি নেই?

ও আমার উঠিয়ে নিত বুকের মধ্যে···ফিট হয়ে গেলে। উঠিয়ে নিত বুকের মধ্যে। বেশ লাগত।···ইচ্ছে করে করে ফিট হয়েছি।

ছবি আমি ভেঙে দিয়েছি। ও আমার কেউ না। আমি বিধবা। আমার·· ট্যাক্সি চলেছে—বীথি আয় চুল বেঁধে দি তো।

—আমার ছেলেপুলে নেই। একটা ছেলে নষ্ট হয়ে—। কুকুর ডাকছে। হুস-হুস হাওয়া, ঠুং-ঠুং রিক্‌শ॥ বারান্দা, ছাদ॥ বেড়াল লাফালো ধুপ্॥ পরিমল॥ বীথি গান গা। আমায় চেন কি—পথ ভোলা॥

আমি মাছ খাব। আর মাংস॥ সিঁদুর, গয়না। শাড়ি॥

হিস্—স—খোকন হিসি করে নাও॥ ঝন্—ন্—ন্ থালা বাটি ভাঙল। ঘণ্টা বাজছে—মন্দির—॥

টিক্,—টিক্,—টিক্—। কতক রাত? অমলেন্দু, ও কমলা,

ও যে আমার বর ॥ তোমার ঠোঁটে গন্ধ ॥

সাবান দিতে গিয়ে দেখলাম ॥ খুব সুন্দর। নরম ॥

কে? আস্তে এস। বাতি জালাও ॥

আমি থুথু দি তোমার সংসারে ॥ কোলে বসার কেউ নেই। আমার কে থাকল? ॥

হাওয়া, জল। টিপটিপ জল পড়ছে—বৃষ্টি চাঁদ—আকাশ নীল,—লজ্জা কি, আমায় নাও, চুমু দাও। আ, শব্দ থাক।

ব্যাঙ ॥ বীথি ॥ অসভ্য ॥

কোথায় যাচ্ছি? আমি নেই। হালকা—মেঘের ফেনায়—সুতো বাঁধা ঘুড়ি মতন হাওয়ায়—আরো হাওয়ায়—আরো—আরো—উঁচু—উঁচু…।

দুলছে ॥ ভাসছে ॥ ফুল মেঘ তুলো ॥—

বসেছিল। ভাসা ঘুড়ি আর একটু উঠতেই ঢেকে নিল।

ঘুম। ঘুম। সব চুপ। অন্য জগৎ। অন্ধকার। কেউ নেই। বেদনা, ব্যথা, সুখ, ভালবাসা, কান্না—কিচ্ছু না।

॥ উনিশ ॥

ভাবলে মনে হয় সমস্তটাই এক দুঃস্বপ্ন; দীর্ঘ, দুঃসহ। অথবা ভয়ঙ্কর এক দুর্যোগ।

মনে হয় নি, মৃত্যুর মত ওই কালো কঠিন আকাশ আবার কখনো ফরসা হতে পারে।

আর বাসনার আয়ু দুর্বল ক্ষীণ প্রদীপ-শিখার মতন বা কাঁপছিল, নিবে যেতে পারত। যাওয়া অসম্ভব ছিল না।

কিন্তু নেবে নি। দুর্যোগ কাটল। দুঃস্বপ্নও সরে গেল। চোখ মেলে বাসনা নতুন সকাল দেখল, নতুন দিন। পৌষের হিমে-ভেজা শার্সিতে উজ্জ্বল রোদ ঝরছিল; আকাশ নীল, পাখি উড়ছে, কেবিনের

দু'হাত ঘরেও যেন কেমন এক মধুর অলস আলো এসে পড়েছে, কিসের এক গুঞ্জন এই হাওয়ায়, কেমন এক অন্য গন্ধ।

তেমন করে বাঁচতে চাইলে কে মরে? বাসনা একদিন ভেবেছিল। বাঁচতে চাওয়াটাই সব।

আমি চেয়েছি। বাঁচতেই চেয়েছি। এই চাওয়া যে কী তীব্র ছিল তা কেউ জানে না। মনে হত, এই ইচ্ছা আমার প্রতিটি রক্ত-কণাকে প্রতি মুহূর্তে নতুন করেছে, মৃত্যুর পদক্ষেপকে কণ্টকিত করেছে। আমার মধ্যে এক দুরন্ত স্পন্দন ছিল। প্রাণ যেন তার অদ্ভুত অনায়ত্ত উষ্ণতা নিয়ে মৃত্যুশূন্যতার সেই কঠিন কুয়াশাকে বার বার শুষে নিচ্ছিল।

এই আয়ু, কেন এত উষ্ণতা, বিশ্বাস আশা এবং অভিলাষ কেন? নিজের জন্যে, আমার জন্যে—আবার আমি একটি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হয়ে বাঁচব, ভালবাসা আর ভালবাসা পাব, সংসার করব আর সুখ পাব —শুধু তাই।

আবার নতুন করে তার আয়ু ফিরে পেয়ে বাসনা এইসব কথা নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভেবেছে। বিশ-বাইশটা দিন এই একই চিন্তা। যেন একটা লতা পল্লবে পল্লবে তার সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেলে ক্রমশই গা ছড়িয়ে মাথা তুলে উর্ধ্বে উঠে যাচ্ছিল। হ্যাঁ—অমলেন্দুকে কেন্দ্র করে, তাকে ঘিরে ঘিরে জড়িয়ে।

অথচ আশ্চর্য অমলেন্দু আর আসছিল না। অপারেশনের পর এই বাইশ দিনের মধ্যে ক'বারই বা সে এসেছে। দিন পাঁচেক। হিসেব আছে বাসনার। বার পর্যন্ত সব মনে আছে, গত শনিবার তার আগে সোমবার, তার আগে গত হপ্তায় বুধবার। তার আগে···। আর এসেছেও এমন সময় যখন কমলা, বীথি, সুধাময়রা সবাই আছে—সময়ও বেশি নেই হাতে তখন।

বাসনার কত কথা থাকত, কত ইচ্ছে। কিন্তু সে-সব কথা কি ইচ্ছে প্রকাশ করার অবসর পাওয়া যেত না। এর জন্যে মনে মনে লুব্ধ হত বাসনা, নিরাশ হত! অভিমানে মনটা ভার হয়ে যেত। দুশ্চিন্তাও হত। কেন ও আসে না?

একটা অন্য আশঙ্কাও কখনও কখনও ছায়া ফেলে যেত। চমকে উঠত বাসনা। চমকে উঠেই আবার সতর্ক হয়ে পড়ত।

আর এ-সব কথা ভাবতে গেলে যেন নিজের মন থেকে একটা ছোবল খেয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিত বাসনা। ছি, ছি, আবার অবিশ্বাস! সেই অবিশ্বাস। না, অবিশ্বাস সে করবে না। অমলেন্দুকে অবিশ্বাস করা, বাসনা নিজেকে বলত, আর তোমার ভালবাসাকে অবিশ্বাস করা একই কথা।

আমি নিশ্চয় সেই গ্লানি, মনের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়েছি। আমার ভালবাসা ততটা দৃঢ় এবং পবিত্র যা এইসব তুচ্ছতাকে অবজ্ঞা উপেক্ষা করতে পারে। আমি স্ত্রী, অমলেন্দুর স্ত্রী। প্রত্যহ হাসপাতালে আসতে পারে না, এই নিয়ে অভিমান করা চলে কিন্তু অবিশ্বাস করা যায় না। করা উচিত নয়।

আর ওকে অবিশ্বাসই বা তুমি করবে কেন? লোকটা তোমার জন্যে শুধু উদ্বেগ আর অশান্তি ভোগ করে চলেছে।

বাসনার মায়াই হয়। অপারেশানের পর একদিন অমলেন্দুর শুকনো, ক্লান্ত মুখ দেখে বাসনা বলেছিল এক সুযোগে, 'তুমি এত মুষড়ে পড়েছ কেন?'

জবাবে অমলেন্দু বলেছিল, করুণ চোখে চেয়ে, 'আমার হয়ত পাগল হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।'

কথাটা বুকের শিরায় যেন টান দিয়ে টনটনিয়ে তুলেছিল। পাগল, সত্যিই বেচারীর পাগল হওয়ার মতই অবস্থা হয়েছে।

ওর কাজের ছাপ পড়েছে আজকাল। সরাসরি নয়—কমলাদের বলেছে অমলেন্দু এমনভাবে, বাসনার যাতে কানে যায়, তার কাজের চাপ পড়ে বড়। কলেজে একটা টিউটোরিয়াল ক্লাস নিতে হচ্ছে প্রায় বিকেলেই। তারপর কিছু বাড়তি কাজ চাপিয়ে দিয়েছে প্রিন্সিপ্যাল অফিসের; সে-সবও করতে হয়।

'একদম সময় পাচ্ছি না আজকাল!' অমলেন্দুর দুঃখ করে আর বিরক্ত হয়ে বলছিল সেদিন। 'খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলবে। ভাবছি

এ চাকরি ছেড়ে দেব।’

‘ছেড়ে দেবে? তারপর—?’ সুধাময় প্রশ্ন করেছিল।

‘নাগপুরের এক কলেজে চিঠি লিখেছিলাম? আমার এক বন্ধু আছে সেখানে। হয়ে যেতে পারে। মাইনে-টাইনেও ভাল। আমাকে একবার যেতে বলছে। ভাবছি যাব।’

বাসনা শুনেছে সমস্ত কথা, মনে গেঁথে নিয়েছে। তারপর সকলে চলে গেলে মনে মনে হেসে বলেছে—অমলেন্দুকে ভাবতে ভাবতে—, দেখ আমি অত বোকা নয়, তুমি যে কেন নাগপুর যেতে চাইছ কলকাতা ছেড়ে তা আমি বুঝতে পেরেছি। এই কলকাতায়, কমলারা যেখানে আছে—সেখানে আমি তোমার বউ হয়ে ঘর করতে অস্বস্তি বোধ করব, শুধু তাই —তাই তুমি বাইরে চলে যেতে চাও। কমলা আমার একমাত্র বোন। এক জায়গায় থেকেও আমাদের মুখ দেখাদেখি যদি না থাকে যদি কমলারা আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলে অথর আমি সেই দুঃখে, লজ্জায় মুষড়ে থাকি- মনমরা হয়ে —তাই এই দূরে যাওয়া। দূরে থাকলে ওদের সঙ্গে সম্পর্ক থাক না থাক আসে যায় না। বরং দূরই ভাল।

—তুমি কাছে থাকলে কলকাতা বা নাগপুর আমার কাছে সব সমান। আমার আর কিছু, আর কারুর কথা ভাববার দরকার নেই।

কি-ই বা আর ভাবব বলো? নিজের এই আঠাশ উনত্রিশ বছরের জীবনটা এতদিন তো শুধু অন্যের সুখ, আরাম, সন্তুষ্টির জন্যে তিল তিল করে বিলিয়ে এলাম। তার বদলে ভাত কাপড়, ভাল-মুখ পেয়েছি। কিন্তু ও-সবে কি যায় আসে। ভাল কাজ করলে ঝি বামুনেও তাই পায়।

আমি যে একটা আলাদা মানুষ, আর-এক-মেয়ে, কমলার বোন শুধু নয়—তার রান্নাঘর, ভাঁড়ার, তার ছেলেমেয়েই যে আমার সংসার নয়—এ-কথা আমিই শুধু বুঝব! ওরা বুঝবে না।

ওরা শুধু ছোড়দিকেই চিনেছে। এই বিশ্রী থান পরা, সিঁথি-সাদা বাসনাকে। এক নিরাশ্রয়, অসহায়কে। ওরা আমায় করুণা করে,

সহানুভূতি দেখায়, মমতায় আগলে রাখে। অস্বীকার করছি না কিছু। ওরা শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, ভক্তি করে—সবাই। তবু ওদের সংসারে, ওদের মধ্যে আমি কে? কিছু না। ওদের সুখ আনন্দ হাসি-খুশিতে আমার ভাগ নেই।

সাত-সকালে উঠে উনুনের আঁচ তুলে চায়ের জল গরম করা, কুটনো কোটা, লুচি ভাজা, মিণ্টুকে দুধ খাওয়ানো, বীথির চুল বাঁধা—এ-সব ওদের জন্যে, আমার জন্যে নয়। আমার কি সুখ তাতে? আমার সুখ আমি যখন নিজের চুল খোঁপা করে বাঁধব, চিরুনির আগা দিয়ে সুন্দর করে সিঁদুর ছোঁয়াবো সিঁথিতে, মাড়-খসখসে হালকা রঙ শাড়ি পরব বিকেলশেষে তারা-উঠি-উঠি সন্ধ্যেয়, আর তারপর তোমার জন্যে রান্নাঘরের সেই আঁচে খুশির হলকায় গান গুনগুন গলায় চায়ের জল তৈরি করব, চামচ নাড়ব, ডিমের খোলা ভাঙব, হয়তো-বা বলা যায় না একটা কাপ ফেলব ঠুন-ন করে—আচমকা তুমি পিছনে এসে দাঁড়িয়েছ ভেবে চমকে উঠে।

এ-সব আমার। বুঝলে মশাই—এই কাজ, এই বিরাম, এই অপেক্ষা এবং এই সুখ—সব। মনে মনে সব ঠিক করে রেখেছি। আগের মতন অত সাত-সকালে আর উঠব না বাপু। সূর্য ওঠার সময় উঠব। বাসি কাপড় কেচে এসে তারপর তোমার চা করব, আমারও। তোমায় ডাকব তারপর।

সকালটা তো হুস্ করে কেটে যাবে। কলেজের ভাত দিতে দিতে। তুমি চলে যাবে—আমি তখন একা। বেলা বাড়বে, বাড়ুক। ঘর গোছানো সারব। তারপর স্নান দুপুর ভরে, আমি ঠিক করে রেখেছি—চুপিচুপি কিছু পড়ব। যাই বলো আমার লেখাপড়া সামান্য। ম্যাট্রিকটাও পাশ করি নি। ওতে মানায় না। তুমি প্রফেসার—আমি তোমার বউ, দু'টো ভাল কথা বললে বুঝতেই পারব না। একটু বইপত্র নাড়াচাড়া করতে হবে বইকি, বই পড়তে পড়তে ঘুম পেলে ঘুমবো, কত কি বোনারও আছে। তারপর দুপুর শেষ হলে ঘরদোর পরিষ্কার করা, বিছানা সাজানো, এটা-সেটা। বিকেল হবে। তুমি ফিরবে।

তুমি ফিরলে আমার কি আর অবসর থাকবে! কিন্তু না, অবসর ঠিক করে নেবই, করতেই হবে। বেড়ানো, গল্প, মাঝে মাঝে সিনেমা থিয়েটার।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল বাসনার। মাঝে মাঝে মনে পড়ে। ভীষণ উন্মনা হয়ে পড়ে তখন। মনটা ভার হয়ে আসে। বুকটা টনটন করে।

কিন্তু কি করব বলো, এ আমার কপালে ছিল। সব সুখ ভগবান আমার কপালে লেখেন নি। আমি জানি, শুনেছি, একদিন কি কথায় যেন আমার নার্স গল্পে-গল্পে বলছিল যে, এই রোগ হলে অপারেশানের পর মেয়েদের সব চেয়ে বড় ক্ষতি এই যে, ছেলেপুলে আর হয় না।

হবে না, আমারও হবে না! কী ভীষণ যে কষ্ট হয়েছিল এ-কথা শুনে সে শুধু মনেই চাপা থাকল। সারা রাত সেদিন ছটফট করেছি। সমস্ত যেন ফাঁকা লাগছিল। ভাবছিলাম এর চেয়ে মরে গেলেই বা ক্ষতি কি ছিল! শুধু গাছে কি সুখ। কি শোভা। কিসের তৃপ্তি যদি ফুল ফল না হল।

পরে আমি মন বেঁধেছি। হাহুতাশ করে তো লাভ নেই। কত মেয়েরই যে ছেলেপুলে হয় না। তা-বলে সেই দুঃখ নিয়ে পা ছড়িয়ে কাঁদব বসে বসে অত দুর্বলতা আর আমার নেই। হ্যাঁ, একটা আকর্ষণ থাকল না, আর এক সম্বল, সান্ত্বনা, সুখ, তৃপ্তি। কিন্তু তুমি তো আমার রয়েছ। যার বাগানে একটিই শুধু গাছ—তাকে শুধু সেই গাছের তলাতে জল দিতে, ফুল তুলতে, ছায়া পেতে ফিরে ফিরে আসতে হয়, এসে বসতে হয়। তুমি আমার মেনি—শুধু মাত্র এক। একটি।

হাসপাতাল ছাড়ার দিন খুব সকালেই ঘুম ভেঙে গেল বাসনার। চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকতে আর ইচ্ছে করছিল না। ছুটির ঘণ্টা পড়ার ঠিক আগে আগে যেমন হয়—ছোট মেয়ের মতন ছটফট করছিল। কখন, এই সকাল আর দুপুর শেষ হয়ে বিকেল আসবে কখন!

বাসনা উঠছিল আর বার বার বিছানায় এসে বসছিল। মাঝে মাঝে জানলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। রোদের তাত দেখছিল, বেলা বাড়ল কত। দশটা কি বেজে গেছে?

মনটা আজ কত মিষ্টি আর নরম হয়ে গেছে। হাসপাতাল থেকে তো নয়, যেন জেলখানা থেকে বেরুচ্ছে—বেরুতে পারছে।

আর বাসনা ভেবে ভেবে ঠিক করে রেখেছিল, এই যে হাসপাতাল থেকে বেরুচ্ছি—এবার আমি আর বাসনা সেন নয়। আমার কোনো চিন্তা করার নেই, ভয় ভাবনা করার। যা সত্যি, যা আমি করেছি আর আমার এখন আসল যা পরিচয় আমি তাই স্বীকার করে তবে ঘরে চলে যাব। হ্যাঁ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে---সুধাময়দের অন্য গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে আমি আর অমলেন্দু আর-এক গাড়িতে করে সোজা নিজেদের বাড়ি।

আমিই বলব। কমলারা চমকে উঠবে—বিশ্বাস করতে পারবে না, কাঁদবে, হয়তো গালাগাল দেবে, ছি ছি করবে। বলবে, এর চেয়ে মরলে না কেন ছোড়দি—সে যে ভাল ছিল।

এ-সবের জবাব দেবার কোন দরকার নেই বাসনার। জবাব সে দেবেও না। দিয়ে লাভ। তবে হ্যঁা, মনে মনে বলবে, তোদের ছোড়দি হাসপাতালে মরে গেছে—নতুন যে বাসনা সে এখন অসঙ্কোচে তার স্বামীর ঘর করতে চলেছে।

সকাল বয়ে দুপুর এল। বাসনা স্নান করেছে। খেয়েছে অনেকক্ষণ হল। একটু শুয়েছে। নার্সের সঙ্গে হালকা হাসি ঠাট্টা করলে। তারপর নিজে নিজেই জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল। তার সুটকেসে থান আর সাদা ব্লাউজ আর এটা-ওটা পুরে রাখল। বেতের টুকরিটায় তোয়ালে, তেল চিরুনি আলাদা করল, অমলেন্দুর এনে দেওয়া ফুল রাখার সেই কাচের গ্লাস, আয়না, ক'টা বই, আরও এটা-সেটা। সুটকেসটা কমলারা নিয়ে যাবে---ওই সাদা রুক্ষতায় আর কোনো প্রয়োজন নেই বাসনার। আর এই বেতের টুকরিতে চিরুনি, ফুলরাখা গ্লাস, আয়না, বই—এ-সব

অমলেন্দুর, তারই—এগুলো নিয়ে যাবে বাসনা।

গুছোতে গুছোতে নিজের এই ছেলেমানুষীতে বাসনা হাসছিল। এই নিজের সংসারের ওপর টান দেখে, এই গোছানো ব্যবস্থা দেখে।

যায়-না যায়-না করেও দুপুর শেষ হয়ে বিকেল হল। ঘণ্টা পড়ে গেল। খানিক পরেই সুধাময়রা হুড়মুড় করে এসে ঢুকল।

'ওমা, ছোড়দি যে একেবারে তৈরী হয়ে বসে আছ।' বীথি বলল—গালে আঙুল তুলে হাসতে হাসতে।

'ভালই করেছ। এখন বিদেয় হতে পারলে বাঁচি।' বলল কমলা।

'তা হলে আমি এবার নিয়ে যাবার ব্যবস্থাটা সেরে আসি।' সুধাময় বলল। বলে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

অমলেন্দু আসছে না কেন এখনো। বাসনা মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিল। ও তো জানে আজ যাবার দিন, আজও সেই দেরি—এখনো দেখা নেই।

'তোমার শরীরটা এমনিতে কিন্তু বেশ দেখাচ্ছে, ছোড়দি।' বীথি স্প্রিংয়ের খাটে ক'টা দোল খেয়ে বলল।

কে জানে কেন এই কথায় কেমন এক লজ্জা পেল বাসনা।

ঝি, জমাদারনি, চাকর, ঠাকুর, দারোয়ান—একে একে সব এল। টাকা, হ্যাঁ—টাকাই গুঁজে দিল হাতে বাসনা। এটা-সেটা বিলিয়ে দিল, সাবানের টুকরো আর গায়ের জামাও একটা। আর ভাবছিল এ যেন ঠিক বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় বাড়ির যত রাজ্যের নাছোড় পাওনাদারদের সুখের কড়ি বিলিয়ে দেওয়া।

কিন্তু অমলেন্দু আসছে না কেন? বাসনা মনে মনে রাগ করছিল। ব তাতেই বেশি বাড়াবাড়ি। কাজ দেখাতে গেছে, কি আমার কাজের ানুষ! নিজের বউকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাবে, সময় মত আসতে ারে না।

কিন্তু সত্যি সময় মত আসতে পারছিল না অমলেন্দু। সুধাময়

তার কাজ চুকিয়ে ফিরে এল। ছাড় টিকিটের হাঙ্গামা মিটিয়ে। শীতের বিকেল ঘন হয়ে আসছিল। আবছা অন্ধকার।

বাসনা ভাবছিল অমলেন্দু এইবার এসে পড়ল বলে।

তবুও না। আশ্চর্য!

'চল চল। গাড়ি নিচে রেখে এসেছি।' সুধাময় তাগাদা দিচ্ছিল।

কেবিন থেকে পা বাড়ালো বাসনা। বীথি বেতের টুকরি হাতে আগে আগে, কমলা পাশে পাশে।

অমলেন্দু কই?

করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাসনা ভাবল এইখানেই দেখা হয়ে যাবে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবছিল, সিঁড়িতেই দেখা হয়ে যাবে।

না, অমলেন্দু নেই। ট্যাক্সির মধ্যে উঠে বসে রাস্তা আর চারপাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল বাসনা, ঝাপসা বিকেল—কত লোক যাচ্ছে আসছে—অমলেন্দু আসে নি।

ট্যাক্সিতে স্টার্ট উঠল।

নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে বাসনা। সমস্ত শরীরটাতে যেন কিসের এক শূন্যতা ঢেউ দিয়ে গেল।

তুমি এলে না! নিয়ে যেতে এলে না!

ট্যাক্সি ছাড়ল।

হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই……

বাসনার মনে হচ্ছিল আশ্চর্য অদ্ভুত এক শক্তি আর সঙ্কল্প যেন হঠাৎ তার বুকের কোন্ তলা থেকে মাথা ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে।

তবে, তবে—?

অনমনীয় আর দৃঢ়, অদ্ভুত আর অবিচল এক সঙ্কল্পে যেন স্থির আর সুন্দর হয়ে বাসনা সোজা হয়ে বসল। নিষ্ঠায় দীপ্তি, বিশ্বাস আর ভালবাসায় পবিত্র হয়ে এক পলাতক মৃগের ভীরুতা আর ঘৃণার যেন হঠাৎ মুখোমুখি হল ও।

'সুধাময়, তুমি তোমার বন্ধুর বাড়ি চেন?' বাসনা কারুর দিকে

নয়—সোজা, সামনে তাকিয়েছিল।

'কার, অমলেন্দুর ?'

'হ্যাঁ।'

'চিনি না, তবে রাস্তা জানি, নম্বরটাও মনে আছে।'

'আমায় সেখানে নামিয়ে দিয়ে যাও।'

কমলা, বীথি, সুধাময়—চমকে তাকালো। বাসনা কারুর দিকে চাইছিল না। তার মুখের ওপর অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অনাবৃত অর্থ লেখা ছিল।

॥ কুড়ি ॥

দরজায় পাল্লার একটু যা মৃদু শব্দ উঠেছিল।

মুখ তুলে তাকালো অমলেন্দু। তাকিয়ে চমকে উঠল। বিমূঢ় হল। চোখের পাতা ফেলতে পারল না। চোখ সরাতে পারল না। নিশ্বাস নিতে ভুলে গেল।

বাসনা এসেছে। সামনেই দাঁড়িয়ে। দরজার পাল্লা ঘেঁসে—একটা হাতে কপাট ধরে। অমলেন্দুর দিকেই অপলকে চেয়ে আছে। ঠোঁট জোড়া। চিবুক নিভাঁজ' কপালেব কোথাও একটু কুঞ্চন নেই। মাথার কাপড়টুকু ঘাড়ের ওপর অগুছোলভাবে পড়ে আছে।

ঘরের আলোয় এই মূর্তিটা কেমন যেন দেখাচ্ছিল। ছবিব মত নরম নয়। পাথরের মতন। শক্ত আর মাটির সঙ্গে—এ-ঘরের মেঝের সঙ্গে আট করে বসানো। যা নড়ানো যায় না, সবিয়ে ফেলা দুঃসাধ্য।

এত স্পষ্ট আর স্থির এই মূর্তি যে অমলেন্দু নিজের মধ্যে কেবল এক অসহায়তা বোধ করতে শুরু করছিল।

ইজিচেয়ার থেকে কেউ যেন ধাক্কা দিয়ে অমলেন্দুকে উঠিয়ে দিল। আর কেউ আসছিল না; সুধাদা, কমলাবউদি, বীথি—কেউ না। অমলেন্দু সব যেন ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিল। বুঝতে পারছিল,

পিছনে আর কারুর পায়ের শব্দ সঙ্গে নিয়ে বাসনা এসে দাঁড়ায় নি। ও একাই এসেছে। একা।

অস্ফুট একটা শব্দ করতে গিয়েও পারল না অমলেন্দু, গলার মধ্যেই আটকে গেল।

অমলেন্দু যদিও এখন আর ভালভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে ভাবতে পারছিল না, তবু দমকা হাওয়ার মতন একরাশ ক্ষোভ আর বিরক্তি মনের কোথাও যেন একটা অগুছোল ভাব সৃষ্টি করল।

কেন এলে তুমি, কেন, কেন—? অমলেন্দু বাসনার দিকে চেয়ে চেয়ে যেন আক্রোশে রাগে ফেটে পড়তে চাইছিল। কিন্তু কথা বলতে পারছিল না। একটি শব্দও তার ঠোঁটের গোড়ায় ফুটছিল না।

বাসনাও চুপ। কথা বলছে না। যেন তার বলার কিছু নেই। তার উপস্থিতিই সব। তার সমস্ত কথা।

খানিকক্ষণ একইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটল—অমলেন্দুর দিকে কেমন এক শান্তভাবে চেয়ে চেয়ে, সোজাসুজি চোখের দিকে তাকিয়ে।

তারপর বাসনা দরজা ছেড়ে ঘরের মধ্যে সোজা এগিয়ে গিয়ে একটু দাঁড়ালো। তাকালো চারপাশ।

টেবিল, বিছানা, আলনা, এক কোণে রাখা ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস্

টেবিলের কোণায় গা ঠেকিয়ে আবার দাঁড়ালো একটু। অমলেন্দুর দিকে আর ও চাইছিল না। বরং এই ঘরে যেন ও একা—একেবারেই একা এমনই এক অন্যমনস্কতার মধ্যে সব দেখছিল আর ভাবছিল।

বাসনা ভাবছিল, এও একরকম হারজিতের খেলা। জীবনপণ করেই। আমি জিততে এসেছি, হেরে যেতে নয়। আমার সঙ্কল্প থেকে আমি নড়ব না। কেউ আমায় টলাতে পারবে না। এই সংসারে আমার জায়গা আমি করে নেব। আমার দাবি আমি ভিক্ষে চেয়ে হাত পেতে নেব না, অমলেন্দু—; আমি ঝগড়াঝাঁটি ইতরামি করেও তোমার শোবার ঘর আর রান্নাঘরের খানিকটা অংশ জুড়ে নেব না। সে নোংরামি, কাঙালপনা আমার নেই। আমি যা নেব, তাতে আমার সহজ অধিকার আছে, সহজভাবে আমি তা নেব। তোমার

হাত তুলে দিতে হবে না, আমিই হাত বাড়িয়ে নেব। এতে আজ আমি লজ্জা পাব না। আমার সঙ্কোচের কারণ নেই। আমি তোমার বউ, আমরা বিয়ে করছি—এ-সবের চেয়েও বড় কথা আমি তোমায় ভালো-বেসেছি। সে ভালোবাসার জুয়োচুরি যে নেই—আমার মনে এ-কথা কত সত্যি করে আমি জেনেছি তা তুমি জান না। আমার সাহস—সোজাসুজি আসা আর হাত বাড়াবার সাহস শুধু এখানেই। যদি তেমোর সাধ্যে কুলোয তুমি আমায় সরিয়ে দাও, ঠেলে চলে যাও।

কিন্তু—, বাসনা মনে মনে হয়তো একটু হাসল, ভাবল : সে তুমি পারবে না। এতক্ষণ তোমার মধ্যে তার কোনো লক্ষণ আমি দেখতে পেলুম না। তুমি পারছ না। আমি জিতেছি। জিতব—।

অমলেন্দু যেন এ-ঘরেই নেই, বাসনা তাকে দেখতে পাচ্ছে না—এমনি এক অজ্ঞতার ভান করে ঘরের চারপাশ দেখছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে—আর ভাবছিল এরপর, এরপর কি করা যায়।

হঠাৎ নজরে পড়ল টেবিলের ওপর চাবির গোছ পড়ে আছে। কী একটা কাগজের টুকরো চাপা দিয়ে রেখেছিল অমলেন্দু। বাসনা একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সেই চাবির গোছের দিকে। সামান্য ভাবল। তারপর হাত বাড়িয়ে মুঠোর মধ্যে চাবিটা তুলে নিল।

অসহ্য লাগছিল অমলেন্দুর, বিশ্রী রকম এক অস্বস্তি। আর রাগ ; ঘৃণাও। ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। পায়চারি করলে ক'বার, তাপরর এক পাশে গিয়ে রেলিং ধরে বাইরে তাকিয়ে থাকল।

অন্ধকার আর শীত। কুয়াশা। সামনে কালো স্থূল কতকগুলো বিকট জানোয়ারের মতন বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। এদিক-ওদিক বাতি। মিটমিট করে জ্বলছে। একটু আকাশ দেখা যায়, সামান্য ক'টি তারাও।

কী দুঃসাহস, অমলেন্দু বাসনার এই হঠাৎ বাড়ি বয়ে আসার কথা ভাবছিল আর ছটফট করছিল। তুমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সটান আমার কাছে চলে এলে! কেন, কিসের জন্যে? এই নাটক করার কি দরকার ছিল? এখন যদি আমি তোমায় মুখ ফুটে বলি,

তুমি চলে যাও—এখুনি, এই বাড়ি ছেড়ে; হ্যাঁ, যদি আমি তোমায় তাড়িয়ে দি—কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ? এখানে যখন এসেছ, বুঝতেই পারছি—পায়ের মাটি সরিয়ে দিয়ে এসেছ !

কেন এলে ? কেন, কেন ? আমি তো তোমায় আসতে বলি নি।...

এত লোভী মেয়ে আর আমি দেখি নি। আশ্চর্য, তুমি কি চোখ বন্ধ করে ছিলে ? আমার এই ভাব-সাব, হাসপাতালে যাওয়া না-যাওয়া থেকে তুমি বোঝ নি, আমি তোমার ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলেছি, অন্তত সেটাই চাইছি। মুখ ফুটে বলনে পারি নি—এই যা।

অমলেন্দু আবার পায়চারি শুরু করল। আর ভাবল, ভাবছিল যে—বাসনা হয়তো অন্য এক দায়ে পড়ে এসেছে।

কিন্তু, কে যেত, আমি অন্তত কখনোই, কখনোই আর তোমার ওপর আমার স্বামীত্বের অধিকার আরোপ করতে যেতুম না। তুমি যদি সেই ভয়ে এসে থাক ভুল করেছ।

হঠাৎ থমকে গিয়ে দাঁড়ালো অমলেন্দু। বাসনা ঘর থেকে বাইরে এসে আলো-জ্বলা বারান্দা দিয়ে এ-পাশ ও-পাশ তাকাতে তাকাতে—এগিয়ে যাচ্ছে। বাথরুমের খোঁজেই। বেশ বুঝতে পারল অমলেন্দু। বাসনার হাতে নতুন শাড়ি-টাড়ি ছিল আর নতুন তোয়ালে।

বাসনা বাথরুমে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিল। চাকরটা রান্না-ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু বা অবাক—একটু বা উৎফুল্ল। বাবু আগে বলতেন—মা আসবেন' ক'দিন পারে। এই কি তবে সেই মা নাকি ! কিন্তু—?

অমলেন্দু বারান্দা থেকে সরে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল আবার। যা ভেবেছিল অমলেন্দু তাই। ট্রাঙ্ক খুলে শাড়ি-টাড়ি বের করে নিয়েছে বাসনা। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে বাসনার হাত থেকে সব ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে আসে। একদিন অবশ্য এ-সবই তার জন্যে এনেছিল—; বাসনাকে বলেছেও সে-কথা, কিন্তু এখন এই ঘর-দোর, জিনিসপত্র, শাড়ি-জামা কিছুর ওপরই আর তার অধিকার নেই। হ্যাঁ, নেই।

অদ্ভুত বেহায়া তো এই মেয়ে! অমলেন্দু বিছানার ওপর একটু বসল আর ভাবল—ভীষণ লোভী। যেন এটা ওর সংসার। বাড়ি ঘর। পরম নিশ্চিন্তে ওর যা খুশি করে যাচ্ছে। গ্রাহ্য নেই, ভয় নেই, ভাবনা নেই। বেহায়া, বেহায়া কোথাকার।

এ অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? অমলেন্দু বিড়বিড় করে বলল এখন, কেউ নেই, শুধু বাতিটা জ্বলছে আর খোলা জানলা দিয়ে শীত ঢুকছে।

কি করবে অমলেন্দু বুঝতে পারছিল না। শরীরের সব ক'টা স্নায়ু যেন শেষ পরদায় গিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে। চোখ জ্বলছে, ঘাড় ব্যথা করছে, মাথার মধ্যে গুমোট ধোঁয়ার মতন ঠাসা অনুভূতি। কপালের কাছে দপদপ।

একটা কিছু করতেই হবে। করা উচিত এখুনি—। আজই। নয়তো এ-মেয়ে আরও শক্ত করে জায়গা জুড়ে নেবে এ-সংসারে। ওর লক্ষণ-টক্ষণ তেমনি।

অমলেন্দু উঠল। সিগারেট ধরালো। ঘরের মধ্যে একটু হাঁটাহাঁটি করল, চাবির গোছাটা টেবিল থেকে তুলে নিল। এ-চাবি আর তোমার মুঠোয় পেতে হচ্ছে না। চাবিটা অমলেন্দু নিজের জামার পকেটে রেখে দিল।

রেখে দিচ্ছে—এমন সময় বাসনা আবার ঘরে ঢুকল। হাত মুখ ধুয়েছে, হাসপাতালের জামাকাপড়—সেই শাদা থান, শাদা ব্লাউজ সব ছেড়ে এসেছে। এখন গায়ে খুব হালকা রঙের একটা শাড়ি। মুখটা ভিজে-ভিজে, কপালের ওপর জল চিকচিক্ করছে। গালে লেপটে গেছে ভিজে ক'টি চুল।

একটা ভিজে-ভিজে হাওয়া যেন বাসনার কাছ থেকে ছুটে এসে অমলেন্দুর মনে ঝাপটা দিয়ে গেল। একটু শীতল স্পর্শ ছুঁইয়ে দিল। ক'টি মুহূর্তের জন্যে অন্য এক চোখ এবং মন প্রথমে বিহ্বল পরে মুগ্ধ দৃষ্টি ভরে নিশ্চল হয়ে থাক। বাসনা যেন এই ঘরের মধ্যে মেঘের ঈষৎ নীলাভ রঙ এনে এক টুকরো ফিকে স্বপ্ন রচনা করে বসে থাকল।

হঠাৎই, যা অত্যন্ত সুন্দর আর জীবন্ত।

বাসনা এবার মুখ মুছে, আয়নার কাছে মোড়ায় বসে বসে চুলটা ঠিক করে নিচ্ছিল।

তাকিয়ে তাকিয়ে ক্রমে আবার সেই অস্বস্তি জাগছিল অমলেন্দুর। এ-সবই অসহ্য ঠেকছিল। এই ঘর, এই আলো, ওই সুশ্রী মেয়ে। সবই। কেমন ভয়-ভয় করছিল। অমলেন্দুর ভয় হচ্ছিল সত্যিই না এবার ও একটা কিছু করে বসে। বাসনার এই নীরব এবং দুঃসাহসী যাদুর খেলা সহ্যাতীত।

চুল আঁচড়ানো শেষ করে—বাসনা ড্রেসিং টেবিলের এটা-ওটা হাতড়ালো। কী যেন খুঁজছিল। স্নো, পাউডার তো টেবিলের ওপরই আছে তবে? যা খুঁজছিল পেল না। মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাকালো অমলেন্দুর দিকে। যেন বলবার জন্যে ঠোঁট খুলেও—হঠাৎ থেমে গেল।

অমলেন্দু অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

অল্প একটু দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে এল বাসনা। বারান্দায় একটু দাঁড়ালো। তারপর আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে চৌকাঠে হাত রেখে ভেতরে তাকালো।

অমলেন্দু ততক্ষণে জামাটা গায়ে গলিয়ে নিয়েছে। এই বাড়ি, বাসনার উপস্থিতি সে আর বরদাস্ত করতে পারছে না। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে অমলেন্দু দেখল, বাসনা রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে চাকরটাকে যেন কি বলছে। হাতে তেল-মশলা না কিসের পাত্র যেন।

করুক যা খুশি! গ্রাহ্যই করল না অমলেন্দু। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে গেল।

রান্নঘরেই একটা মোড়া আনিয়ে বসল বাসনা। উনুনের আঁচ গায়ে, মুখে।

ভেতরে ভেতরে খুবই ক্লান্ত লাগছিল। বাসনার মনে হচ্ছিল এ

যেন এক নিষ্ঠুর এবং অদ্ভুত পরীক্ষা। ওর সমস্ত শক্তি শেষ প্রান্তে এসে ঠেকেছে। এ-ভাবে চললে আর কতক্ষণই বা পারবে?

কিন্তু আমায় পারতেই হবে। বাসনা নিজের কাছে নিজেই শক্তি চাইছিল। আর মনে মনে বলছিল, আমার ভালবাসার, নিষ্ঠার আর বিশ্বাসের এই একমাত্র পরীক্ষা। এই প্রথম। এবং শেষ।

রাত বাড়ছিল। হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে তবু চুপ করে বসেছিল বাসনা।

কোথায় গেল ও—ফিরবে কখন?

আর বসে থেকে থেকে বাসনার মনে হচ্ছিল—তার এই দুর্বল স্বাস্থ্যে শেষ শক্তিটুকু দিয়েও যেন একটা দড়ি সে ধরে রয়েছে। ঝুলন্ত অবস্থায়। ওপর থেকে সেই দড়ির আর এক প্রান্ত যেন কেউ ধারালো ছুরি বসিয়ে কেটে দেবার চেষ্টা করছে। যদি কেটে দেয়—বাসনা ছিটকে পড়বে কোন অতলে কে জানে।

বাড়ির বাইরে এসে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরল খানিকটা অমলেন্দু। ভাল লাগল না, পার্কে গিয়ে বসল। অন্ধকার আর কুয়াশা, মিটমিট আলো। ঘাস, লতাপাতার গন্ধ। ভাল লাগল একটু। কিছুক্ষণ ভালই লাগল, তারপর এই পার্কও অসহ্য হয়ে উঠল।

কিছুতেই শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। বাসনা যেন তার সঙ্গে ভীষণ এক শত্রুতা শুরু করেছে। একটি মুহূর্তের জন্যেও সুস্থির থাকতে দেবে না।

অমলেন্দুর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয়। এ-কথা কখনোই তার কল্পনায় আসে নি, বাসনা—সেই অতি সাবধানী, মন এক, মুখ এক ভীরু সতর্ক, নোংরা -স্বভাব মেয়ের পক্ষে এ-কাজ সম্ভব। এ-বাড়িতে তাব নিঃশঙ্ক আশ্রয় সে-বাড়ি ছেড়ে—বাড়ির লোকদের কাছে তার এতদিনকার পোশাকী বৈধব্য-শুচিতা আর নিষ্ঠাকে নিজের হাতে গুঁড়িয়ে দিয়ে—সত্যিই সে কি করে আসতে পারে! এমন চমৎকার পবিত্রতার মুখোশ কি করে খুলল বাসনা?

তার লজ্জা করল না। মনে হল এক নিরাপদ অবলম্বন স্বেচ্ছায় ছেড়ে কোথায় সে যাচ্ছে?

অমলেন্দু যত ভাবছিল তত অবাক হচ্ছিল। আর অমলেন্দু ভাবছিল, বাসনা যা করবে সে আশা করছিল, সেটাই তার মতন চরিত্রের মেয়ের পক্ষে করা স্বাভাবিক ছিল। হ্যাঁ, হাসপাতাল থেকে সোজা বোনের বাড়ি ফিরে যাবে। যে-বিপদের ভয়ে এত ছলাকলা সেই বিপদই যখন কাটল তখন আর ভয় কি? সাদা থানের আড়ালে একটা কাতর ক্ষুধার্ত দেহকে চমৎকার করে ঢেকে, সাজিয়ে, সাদা সিঁথি আরও করুণ এবং পবিত্র করে কমলাবউদিদের শ্রদ্ধা কুড়িয়ে তার তো সুন্দর দিন চলে যেত। স্বামীর ছবিতে ফুল দিয়ে, একাদশী করে নিজেকে কত সম্মানীয় করেই না রাখা যেত। কেন বাসনা এই স্বাভাবিক সহজ পথটা নিল না। অমলেন্দুর ভয়ে। যদি রেজিস্ট্রী বিয়ের কথাটা ফাঁস হয়ে যায় তাই!

হতে পারে তাই। হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু একটু বাসনার নিজের বুঝতে পারা উচিত ছিল অমলেন্দুর ভাব-সাব দেখে যে, সেই সইয়ের চিরকুট হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দেবার আগ্রহ উৎসাহ অমলেন্দুর আর নেই। যে-মেয়ে তাকে বঞ্চনা করেছে, তার চরিত্রকে কদর্য আর কলুষ করে একে নিয়েছে—সেই মেয়ের ভালবাসা পাবার জন্যে কোনো ভদ্র পুরুষই আদালতের দলিল নিয়ে ছুটে যায় না। অন্তত অমলেন্দু যেত না। কোনদিন। কখনো। ইহজীবনে। বাসনা একটু বিশ্বাস রাখতে পারত।

অমলেন্দু ভেবে পাচ্ছিল না—বাসনা হঠাৎ এ কী অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। যদি অবিশ্বাসই করে থাকে অমলেন্দুকে, ধরে নেওয়া যাক, তবু কমলাদের কাছে ফিরে গিয়ে কিছুদিন সবুর করে দেখলেও তো পারত; হ্যাঁ, কি করে অমলেন্দু। না কি সেই কেলেঙ্কারীই আগে-ভাগে বাঁচাতে চাইল বাসনা।

সমস্ত মাথা গরম হয়ে উঠেছিল অমলেন্দুর ঝিমঝিম করছিল আর ভাবতে পারছিল না। ভাবতে ভাল লাগছিল না। বার বার

শুধু মনে হচ্ছিল, ও কেন এল ? কেন এল ? কেমন করে নিজের সব লজ্জা নিজের হাতে সকলের কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চোখের ওপর খুলে মেলে দিয়ে চলে এল !

পার্কে ঘুরে ঘুরে—ক্লান্ত হয়ে ঘাসের ওপর অবসন্ন শরীরটা এলিয়ে বসে পড়ল অমলেন্দু এক সময়। রাত বাড়ছে। কুয়াশা ঘন হয়ে গেছে। শীতটা দাঁত বসাচ্ছে গায়। আকাশের তারাগুলো যেন চোখের জলের মত চিকচিক করছে।

অমলেন্দুর বুক আর গলার কাছে কিসের একটা অবরুদ্ধ আবেগ যেন ঠেলে ঠেলে উঠছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল—এই নির্জনে, অন্ধকারে—খানিকটা সে কাঁদে। কাঁদতে পারলে স্বস্তি পেত, শান্তি পেত।

ক'টা সিগারেট ধরালো আর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল অমলেন্দু। মাথা মুখ ঢেকে বসল। নিজেকে একটু সংযত সুস্থির করতে আপ্রাণ চেষ্টা করল।

যা হবার হয়েছে—যা ঘটেছে তা ঘটনা। সত্য এবং বাস্তব। এই সত্য আর বাস্তব ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এখন আমার কি করার আছে, আমি কি করব—আমায় ঠিক করতে হবে। অমলেন্দু তার মনকে একটু সুস্থির করে তার কর্তব্যর কথা ভাবতে চেষ্টা করল।

আমি কি বাড়ি গিয়ে ওকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেব ? বলব, তুমি যাও, তুমি চলে যাও। তোমার আমার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।

কিন্তু কোথায় যাবে বাসনা, কার কাছে—কোন আশ্রয়ে ?

বললেই তো আর বাসনা যাবে না। যাবার জন্যে সে আসে নি। যদি ও বলে, আমি তোমার স্ত্রী। আমার জায়গায় আমি এসেছি। আমি যাব না।

অমলেন্দু এবার হতাশ হয়ে, ভেঙে পড়ে অন্য এক রকম মনে ভাবছিল, সত্যি ওকে আর আমি অস্বীকার করব কি করে, কেমন করে ঠেলে সরিয়ে দেব তার জায়গা থেকে ! অদ্ভুত,—মনেই হয় না এ যেন সেই দুর্বল, ভীরু, সতর্ক সাবধানী, শঠ এক মেয়ে। এখন এই

মেয়ে যেন কিসের জোরে মাথা উঁচু, পা সোজা করে দাঁড়াতে শিখেছে। চোখে চোখে তাকাতেও ওর আর ভয় করে না। এ বাড়িতে এসে উঠতেও। যেন সংসার তার, সবই তার। কী নিঃসঙ্কোচ, নিঃশঙ্ক। পরিপূর্ণ নির্ভরতা। লজ্জা নেই, কুণ্ঠা নেই, কোনো অস্বস্তিই তার নেই।

অমলেন্দু ভেবে দেখছিল, এর কোনো সমাধান নেই। এত কাছে, একই ঘরের মধ্যে সে যখন এসে দাঁড়িয়েছে তখন তার আসাটাই যে অন্যরকম, তার রূপটা যে আলাদা।

আগে যাই হোক তবু বাসনা দূরে ছিল—আমার ঘরের বাইরে, গণ্ডি থেকে অন্য জায়গায়। আর এখন শুধু পা বাড়িয়ে ঘরেই ঢোকে নি, তার নিজের জায়গা বুঝে নিয়ে, অধিকারে সজাগ হয়ে অবিচল সঙ্কল্পে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অমলেন্দুর সাধ্য কি তোমাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

আর এটাও অমলেন্দু বুঝতে পারছিল—বাসনার এই ধৈর্যের কাছে সে মাথা তুলতে পারছে না,—মুখ খুলতে পারছে না। এবং পাথরের মত নির্বাক অথচ এক কঠিন আশ্চর্য আকর্ষণ থেকে ছুটে পালিয়ে যাবার সাধ্যও তার নেই।

বাসনা তাকে কিসের এক প্রচণ্ড শক্তিতে যেন টানছে। যতই ছটফট করুক, সে-টান থেকে নিজেকে মুক্ত করা অমলেন্দুর পক্ষে অসম্ভব ; অসম্ভব।

মনে পড়ল, আসার সময় বাসনাকে রান্নাঘরে উঁকি দিতে দেখেছে ও। কথাটা মনে পড়তেই কেমন এক ভয় ধক্ করে বুকের ওপর ফেটে পড়ল।

এই মেয়ের ভীষণ গোঁ। হাসপাতাল থেকে এসেই অত হাঁটাহাঁটি, জল ঘাঁটাঘাঁটি করল। তারপর এক কেলেঙ্কারী ; উনুনের পাশে কি মধ্যেই হয়তো মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে, মরে থাকবে। বলা যায় না—যা দুর্বল এখন ওর শরীর।

মরা কথাটা মনে হতেই হঠাৎ একেবারেই আচমকা অন্য একটা

কথা মাথার মধ্যে যেন চমকে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। বাসনা যদি এই প্রত্যাখ্যানের শোধ নেয় অন্যভাবে। আগুনের পাশে বসেই।

অমলেন্দুর গায়ে যেন একটা সাপ ছিটকে পড়েছে। শিউরে উঠে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। যেন বাসনাকে সত্যিই রান্নাঘরের উনুনের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখছে ও। আর শরীরটা দাউ-দাউ আগুতে জ্বলছে।

পার্ক, রাস্তা, অমলেন্দু উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল এবার।

বাড়ির মোড়েব মাথায় এসে দাঁড়াতেই—বঙ্কুদের মনিহারী দোকানটা হঠাৎ চোখে পড়ল। আলো জ্বলছে। ক্রীম স্নোর সেই নীল টিউব-জ্বলা বিজ্ঞাপনটা চোখের ওপর দপ্ কবে জ্বলেই নিবে গেল। আবার জ্বলল।

সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ওপের উঠে এল অবলেন্দু। উঁকি দিয়ে দেখল। রান্নাঘরে মোড়ার ওপর বসে হাতে মাথা এলিয়ে যেন অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়েই পড়েছে বাসনা।

ডাকবে কি ডাকবে না ভাবতে গিয়ে কেমন এমন একটা শব্দই করে ফেলল অমলেন্দু।

বাসনা চোখ তুলে তাকালো।

অমলেন্দু একটুক্ষণ সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। যেতে যেত অস্ফুট স্বরে জল চাইল। এমন দুর্বল আর নিস্তেজ স্বর, যেন মনে হয় অনেক ঘুরে ঘুরে ভীষণ ক্লান্ত আর নির্জীব হয়ে শেষ পর্যন্ত ফিরে এসেছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে।

বাসনা নিজেই এল জল নিয়ে। অমলেন্দু গায়ের জামাটা ছাড়ছিল।

জলের গ্লাসটা বাসনা টেবিলে নামিয়ে রাখল না। অমলেন্দুর দিকে হাত বাড়িয়ে ধরে থাকল। বাসনার মুখে চোখ রেখে তাকাচ্ছিল না অমলেন্দু। হাতের দিকেই চেয়ে একবার ভাবল, মুখ ফুটে কথাটা সে বলে ফেলে, তুমি যাও। তোমার কাছে, আমি কিছু চাই নি। কথাটা ভাবল; বলতে পারল না। বরং অনুভব করল, তার এত বেশি তৃষ্ণা

যে তালুর কাছটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।

জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে এক নিশ্বাসেই শেষ করে ফেলল সবটুকু। তৃষ্ণা শান্তির শ্বাস ফেলল। একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। কী যেন ভাবল। গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল। সোজা বাথরুমে।

এই শীতেও এবং এতটা রাতেও ঘাড় মুখ কপালে অনেকক্ষণ ধরে জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে দিয়ে অমলেন্দু তার উত্তেজিত, ক্লান্ত স্নায়ুকে শীতল, শান্ত করতে চাইল। আর জোর করে সবকিছু খানিকক্ষণের জন্যে ভুলে যাবার চেষ্টা করল। বাসনার কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাববার চেষ্টা করল। পারল না। বরং এবার বাসনার হয়ে নিজেকেই যেন সে কতকগুলো মোটামুটি কথা বুঝিয়ে বলছিল। এবং তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে হাত নাড়া বন্ধ হয়ে গেলেও তন্ময় হয়েই ভাবছিল কথাগুলো।

এতক্ষণ স্পষ্টই একটা দ্বিধা এসেছে অমলেন্দুর মনে। অমলেন্দু ভাবতে পারছে পুরনো এবং নতুন এই দুই বাসনাকেই। শঠ, মেকি, চতুর, বিধবা বাসনার সঙ্গে অকপট, সহজ, সরল এবং নিঃসঙ্কোচ এই বাসনাকে সে তুলনা করতে পারছে।

সত্যি, যা নিয়ে আমার এই রাগ, এত জ্বালা, কষ্ট সেটা তো আমার জানবার কথা নয়! অমলেন্দু ভাবছিল, বাসনা যদি না বলত, যদি লুকিয়েই রাখত তার মনের ভয়, সন্দেহ, সাবধানতা, ইতরতার কথা অমলেন্দু জানতেই পারত না; অসঙ্কোচেই বাসনাকে, বাসনার ভাল-বাসাকে খুব একটা ন্যায্য পাওনা, মস্ত বড় লাভ বলেই হাত পেতে নিত। কিন্তু যেহেতু—বাসনা তা করে নি, পারে নি, সত্যিই, ও পারে নি—নিজের বিবেক জেগেছিল—(কেন জেগেছিল—? তোমায় ভাল-বাসে বলেই না, অললেন্দু) আর এই বিবেক পাথর হয়ে বসেছিল, বাসনাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল (কেন? তোমায় ভালবেসেছে বলেই না, অমলেন্দু) এবং এই গ্লানি ইতরতা প্রবঞ্চনা মলিনতা থেকে সে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হতে চাইছিল (কেন চাইছিল? তোমার আর তার

সম্পর্ককে সে নিখাদ করতে চাইছিল বলেই না) তাই বাসনা অকপটে যা তোমাব জানার কথা নয় তাও জানিয়েছে। সে নিজেকে মেলে ধরেছে. গোপন করে নি।

অমলেন্দু যেন শুনছিল বাসনা তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলছে : যদি দেখতে চাও, আমার সবটা দেখ। দুর্বল ভীরু সংস্কার আর সংশয়-সন্দিগ্ধ বিধবা বাসনার পোশাকী পবিত্রতার সঙ্গে এই নতুন, প্রত্যয়ী, সহজ, সাহসী বাসনা আব তার আন্তরিক শুচিতার স্পৃহাকেও তুমি মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে নিয়ে দেখ। তোমায় ভালবেসে আমি যে নতুন করে মনে মনে জন্মালাম এটা কি তুমি দেখবে না।

অমলেন্দুর বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা উচ্ছ্বাস ফেনিয়ে পাক দিয়ে ক্রমশই ওপবে উঠছিল গলাব কাছে। এবার যেন আছড়ে পড়ল। ছেলেমানুষের মতন অমলেন্দু এই নির্জনে, বাথরুমে, একা-একা, হলুদ মতন একটু আলোয় এতক্ষণে মুখে তোয়ালে গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল। চোখ সজল হল। আর এই অশ্রু তার ক্ষোভ, বিরাগ, জ্বালা অভিমান আস্তে আস্তে যেন ধুয়ে দিতে লাগল। অনেকটা হালকা লাগছিল নিজেকে। ভাল লাগছিল।

বাথরুম থেকে মুখটা ধুয়ে মুছে আবার যখন বাইবে এল অমলেন্দু—পাশের বাড়ি থেকে দশটা বাজার ঘণ্টা বাজছে। শব্দটা শুনতে শুনতে সোজা ঘরে চলে এল ও।

বাসনা বিছানার একপাশে বসে বালিশে মুখ গুঁজে পিঠ উপুড় করে বসে আছে।

কাছে এল অমলেন্দু, একেবারে পাশেই। গায়ে গা লাগল। আস্তে করে বাসনার পিঠে হাত রাখল। বাসনা মুখ তুলল না। তেমনি-ভাবেই উপুড় হয়ে থাকল।

অমলেন্দু হাতের চাপ আস্তে আস্তে গভীর হয়ে উঠল যখন, তখন অনুভব করতে পারল, ফোঁপানো চাপা কান্নার একটা ঢেউ বাসনার দুর্বল পলকা পিঠের মধ্যে দুমড়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

কিছু বলল না অমলেন্দু। কোনো কথা নয়। কোনো শব্দ নয়।

বাসনার এই কান্না তার ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল এই কান্না বাসনার একার নয়, তারও।

কিন্তু কান্নাও থামল। রাত বাড়ল। বাইরে আরও শীত। আরও অন্ধকার। কুয়াশা গভীর। হিম ঝরছে। নিস্তব্ধ। সব শান্ত।

আর ঘরেও এতক্ষণে যেন শান্তি নেমেছে। দু'টি মানুষ এখন দূরে

মনে হচ্ছিল, বাইরের অসীম অন্ধকার আর নিঠুর শীত থেকে যেন এই দু'টি পাখি ঘরের আলোয় এবং উষ্ণতায় আশ্রয় পেয়ে বেঁচে গেছে।